মাসের সূচিপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৩	১৭	বৎসরে	বৎসের
৩৮৮	১৯	!	?
৩০৮	১১	অপরিবর্ত্তনীয়	অপরিবর্ত্তনীয়ে
৩৫৯	১৩	লেখা	খেলা
৪৩৯	১৮	বলিতেছি	ভারতবর্ষ বলিতেছি

যে ভুলগুলি থাকায় অর্থবোধের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা সেইগুলি সংশোধিত হইল। অন্যান্য ত্রুটি পাঠক মহাশয়েরা সংশোধন করিয়া লইবেন।

সূচিপত্র।

সাধনা।

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

তৃতীয় বর্ষ।

দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড।

১৩০১ সাল।

আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

সাধনা।

কাবুলিওয়ালা।

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোট মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে সে আমার বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। এই জন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকাল বেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বল্‌ছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না ?" আমি, পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। "দেখ বাবা, ভোলা বল্‌ছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়া জল ফেলে তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছিমিছি বকিতে পারে! কেবলি বকে, দিনরাত বকে!" এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ

জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল "বাবা, মা তোমার কে হয়?" মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা; মুখে কহিলাম "মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা কর্‌গে যা। আমার এখন কাজ আছে।" সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতি দ্রুত উচ্চারণে আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপ সিংহ তখন কাঞ্চনমালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্ত্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা!" ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুই চার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে উর্দ্ধস্বরে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনি ঝুলি ঘাড়ে একটা আপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না। কিন্তু মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে উর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মত ছিল যে ঐ ঝুলিটার ভিতরে সন্ধান করিলে তাহার মত দুটো চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এদিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপ সিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন, তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভাল হয় না। কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুষ, ইংরাজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল। অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, তোমার লড়্‌কী কোথা গেল।

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙ্গাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম—সে আমার গা ঘেঁষিয়া কাবুলীর মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধনেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিস্‌মিস্‌ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এম্‌নি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকাল বেলায় আবশ্যকবশতঃ বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্যমুখে শুনি-তেছে এবং মধ্যেমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁ-স্‌লা বাঙ্গলায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্য্যবান্‌ শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম কিস্‌মিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, উহাকে এ সব

কেন দিয়াছ? অমন আর দিয়োনা। বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসঙ্কোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোল আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে। মিনির মা একটা শ্বেত চক্‌চকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভৎ্সনার স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুই এ আধুলি কোথায় পেলি?" মিনি বলিতেছে "কাবুলিওয়ালা দিয়েচে।" তাহার মা বলিতেছেন "কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি!" মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাইনি, সে আপনি দিলে!" আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তা বাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র লুব্ধ হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে—যথা, রহমৎকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কি?" রহমৎ একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত "হাঁতি।" অর্থাৎ তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম্ম—খুব যে বেশি সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিত—এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং

একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমৎ মিনিকে বলিত "খোঁখী, তোমি সসুর-বারি কখুনু যাবে না!" বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে আজন্মকাল "শ্বশুর-বাড়ি" শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু এ-কেলে ধরণের লোক হওয়াতে শিশু মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এই জন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত "তুমি শ্বশুর-বাড়ি যাবে?" রহমৎ কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত "হামি সসুরকে মারবে।" শুনিয়া মিনি শ্বশুর নামক কোন এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখন কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেই জন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্ব্বদা মন-কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমন বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্ব্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটীরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে। এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জপ্রকৃতি যে আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এই জন্য

সকালবেলায় আমার ছোট ঘরে টেবিলের সাম্‌নে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুইধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সঙ্কীর্ণ মরুপথ, বোঝাই-করা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে; পাগ্‌ড়ি-পরা বণিক ও পথিকেরা কেহ বা উটের পরে কেহ বা পদব্রজে, কাহারো হাতে বর্শা, কাহারো হাতে সেকেলে চক্‌মকি-ঠোকা বন্দুক; কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙ্গা বাঙ্গলায় স্বদেশের গল্প করিত, আর এই ছবি আমার চখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই তাঁহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্ব্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়া পোকা আর্‌সোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এত দিন (খুব বেশি দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই। রহমৎ কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্য্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন—কখনো কি কাহারো ছেলে চুরি যায় না? কাবুলদেশে কি দাস-ব্যবসায় প্রচলিত নাই? এক জন প্রকাণ্ড কাবুলীর পক্ষে একটি ছো ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া একেবারেই কি অসম্ভব আমাকে মানিতে হইল ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে কি অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এ জন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলি

বিনা দোষে রহমৎকে ঘনঘন আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের আরম্ভেই রহমৎ দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড় ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয় কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয় উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যেদিন আসিতে পারে না, সে দিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা জামা-পায়জামা-পরা সেই ঝোলা-ঝুলি-ওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়। কিন্তু যখন দেখি মিনি "কাবুলি-ওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোট ঘরে বসিয়া প্রুফ্‌শিট্ সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্ব্বে আজ দিন দুই তিন হইতে শীতটা খুব কনকনে হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে—মাথায় গলাবন্দ জড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল। চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমৎকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে—তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন,

এবং একজন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কি? কিয়দংশ তাহার কাছে কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত —মিথ্যাপূর্ব্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে, এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে। রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অশ্রাব্য গালি দিতেছে এমন সময়ে "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। রহমতের মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে কৌতুক হাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না—মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুর-বাড়ি যাবে?" রহমৎ হাসিয়া কহিল "সিখানেই যাচ্চে!" দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল—সম্বুরাকে মারিতাম কিন্তু কি করিব হাত বাঁধা।

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম। আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমত নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্ব্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না। আর, চঞ্চল-হৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে

স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সখার পরিবর্ত্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল। এমন কি এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ত তাহার সহিত এক প্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গেসঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতনধৌত রৌদ্র যেন সোহাগায়-গলানো নির্ম্মল সোনার মত রং ধরিয়াছে। এমন কি, কলিকাতার গলির ভিতর-কার ইষ্টক-জর্জ্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলার উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রিশেষ হইতে না হইতে সানাই বাজি-তেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্যে হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে, বাড়ির ঘরে-ঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙ্গাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে; হাঁক-ডাকের সীমা নাই। আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া

হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমৎ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্ব্বের মত সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম। কহিলাম, কিরে রহমৎ, কবে আসিলি? সে কহিল, কাল সন্ধ্যা-বেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি। কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট্ করিয়া উঠিল। কোন খুনীকে কখন প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভাল হয়। আমি তাহাকে কহিলাম, আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।—কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্ব্বের মত "কাবুলি-ওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহাদের সেই অত্যন্ত কৌতুকাবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনরূপ ব্যত্যয় হইবেক না। এমন কি, পূর্ব্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে এক বাক্স আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্ বাদাম বোধ করি কোন স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়াচিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—তাহার সে নিজের ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম—আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারো সহিত দেখা হইতে পারিবে না।

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির-দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে কহিল—"বাবু সেলাম্" বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল, এই আঙ্গুর এবং কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্ বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন। আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল,—কহিল—আপনার বহুৎ দয়া, আমার চির-কাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে পয়সা দিবেন না।—বাবু, তোমার যেমন একটি লড়্‌কী আছে, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছুকিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি ত সওদা করিতে আসি না।—এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক-টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল। দেখিলাম কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফোটগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুষা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহারই চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণ-চিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমৎ প্রতি বৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে—যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশু-হস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী-বক্ষের মধ্যে সুধাসঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। তখন, সে

যে একজন কাবুলী মেওয়াওয়ালা, আর আমি যে একজন বাঙ্গালী সম্ভ্রান্তবংশীয় তাহা ভুলিয়া গেলাম—তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে; সেও পিতা, আমিও পিতা। তাহার পর্ব্বত-গৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্ব্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙা চেলিপরা, কপালে চন্দন আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল—"খোঁখী, তোমি সসুর-বারি যাবিস্?" মিনি এখন শ্বশুর-বাড়ির অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্ব্বের মত উত্তর দিতে পারিল না—রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেইদিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রহমৎ মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড় হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে—তাহাকে ঠিক পূর্ব্বের মতনটি আর পাইবে না। এ আটবৎসরে তাহার কি হইয়াছে তাই বা কে জানে! সকাল বেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্রকিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমৎ কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্ব্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, রহমৎ তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনসুখে আমার মিনির কল্যাণ হৌক্।

এই টাকাটা দান করিয়া, হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেক্ট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল-আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

জাহাঙ্গীরের মদিরাসক্তি।

পারসীতে লিখিত "ওয়াকিয়াত্-ই জাহাঙ্গীরি" বলিয়া একখানি গ্রন্থ আছে। জনপ্রবাদ এইরূপ যে স্বয়ং জাহাঙ্গীর সাহ এই পুস্তকের অনেক অংশ লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তক জাহাঙ্গীরের নিজের "রোজনামচার" মত। তাঁহার দৈনিক জীবনের অনেক গোপনীয় রহস্য ইহার মধ্যে গুপ্তভাবে সন্নিহিত আছে। আমরা ইহার অনুবাদের সাহায্যে এতন্মধ্য হইতে কতকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় সংকলিত করিয়া রাখিয়াছি—"সাধনার" পাঠকবর্গের জন্য সেই সংগৃহীত অংশ হইতে বর্ত্তমান প্রস্তাবটী লিখিত হইল।

ইতিহাসের প্রশস্ত ভিত্তির উপর পশ্চাল্লিখিত ঘটনার অবস্থান রহিয়াছে। ইহা কৌতুকপ্রদ অথচ ইহা হইতে ইতিহাসের প্রধান প্রধান নায়কদের গোপনীয় চরিত্রের প্রকৃত আভাস

পাওয়া যায়। এক সময়ে যাঁহারা হিমাচল হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষের উপর বিশাল ক্ষমতা চালন করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজের গোপনীয় জীবনে কিরূপ অদ্ভুত রহস্যজড়িত কার্য্য সম্পাদন করিতেন তাহা জানিতে পাঠকদের বিশেষ কৌতূহল জন্মিতে পারে।

আকবর সাহের সময়ে সুরাপান নিবারণ জন্য বহুবিধ কঠোর বিধির প্রচলনসত্ত্বেও তাঁহার নিজ প্রাসাদে তাঁহার নিজ ঔরসজাত ভবিষ্যৎ রাজ্যাধিকারী সন্তানগণ কিরূপে ষোড়শোপচারে এই হলাহলের পূজা করিতেন তাহা ভাবিয়া বিশেষ আশ্চর্য্য হইতে হয়। জাহাঙ্গীর নিজে কতকগুলি আইন করিয়া সুরাপান নিবারণসম্বন্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন অথচ নিজে সর্ব্বপ্রধান আইন-লঙ্ঘনকারী ছিলেন। তিনি তাঁহার নিজের প্রচলিত "বিধি"গুলির একস্থানে লিখিয়াছেন—"মহম্মদীয় শাস্ত্রমতে সুরা মুসলমানের অব্যবহার্য্য, বিশেষতঃ যে কোন দ্রব্য হউক না কেন যাহাতে মত্ততা উৎপাদন করে তাহা মুসলমানের ব্যবহার করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আমি রাজ্য মধ্যে যদিও এ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলাম তত্রাপি আমি ইহার ব্যবহার ভুলি নাই। আমার বয়স যখন অষ্টাদশ বৎসর সেই সময়ে আমি প্রথম মদিরাপান আরম্ভ করি। তাহার পর কুড়ি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—এখনও তদ্রূপ চলিতেছে। প্রথম প্রথম যখন আমি সুরাপান আরম্ভ করি তখন পনর হইতে আরম্ভ করিয়া কুড়ি পেয়ালা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন রাতের মধ্যে নিঃশেষ করিয়াছি। যখন আমার শরীর মাটী হইতে আরম্ভ হইল, আমি যখন ইহার প্রভাব বিশেষরূপে অনুভব করিলাম, তখন কাজেই পেয়ালার সংখ্যা কমাইতে হইল। এই অবস্থায় আমি ছয় সাত

পেয়ালা পান করিতাম। এই সময়ে আমার মদিরাপানের কোন বিশেষ নির্দ্ধারিত সময় ছিল না। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে যখন ইচ্ছা হইত খাইতাম। কিন্তু ত্রিশ বৎসরের পর আমাকে সময়ের বাঁধাবাঁধি করিতে হইল। তখন আমি কেবলমাত্র রাত্রিতে মদিরাপান করিতাম। পরিপাক-শক্তির উত্তেজনাই এই সময়ে আমার সুরাপানের প্রধান লক্ষ্য ছিল।”

জাহাঙ্গীর নিজে মদিরাপান করিয়াই যে নিশ্চিন্ত থাকিতেন তাহা নহে—রাজপুত্রগণেরও পরকাল খাইবার চেষ্টা দেখিতেন। পিতা হইয়া পুত্রকে মদিরোৎসবে মত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। পুত্রও উপযুক্ত পিতার সম্মান রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। জাহাঙ্গীর বাদসাহ “ওয়াকিয়াত”-এর একস্থলে লিখিয়াছেন—"আজ মাসের পঁচিশে। এই দিন বড় আনন্দের। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ খরমের (পরে সাহজাহান) বাৎসরিক “তুলার” দিন। আমার পুত্রের বয়স এখন চব্বিশ বৎসর। তাহার বিবাহ দিয়াছি ও কুমারের সন্তানাদিও হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যুবরাজ মদিরাপানে অভ্যস্ত হন নাই। আজ আমি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলাম—বৎস! তুমি ছেলেপুলের বাপ হইয়াছ—সম্রাট্ ও তাঁহার পুত্রগণ মদিরাপান করিয়া থাকেন। আজ আমোদের দিন; তোমার সহিত আমি আজ একত্রে মদ্যপান করিব। আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি—নওরোজের দিন, উৎসবের দিন তুমি পরিমিতভাবে মদ্যপান করিও। কিন্তু এ কথাটী মনে রাখিও, জ্ঞানীরা অতিরিক্ত পানে বুদ্ধি কলুষিত করেন না। প্রকৃতপক্ষে মদ্যপানের উপকারের ভাগই আমাদের গ্রহণ করা উচিত।”

মদিরায় তাঁহার নিজের কিরূপে প্রথম দীক্ষা হইয়াছিল

তাহার বিবরণ এই—"আমার বয়ঃক্রম যখন চতুর্দ্দশ বৎসর তখন আমি মদিরার আস্বাদ কিছুমাত্র জানিতে পারি নাই। অতি শৈশবে রোগের চিকিৎসাস্বরূপে আমার মাতা ঠাকুরাণী বা ধাত্রী কখনও কখনও আমাকে একটু মদিরা পান করাইয়া দিতেন। এক সময়ে আমার ভয়ানক সর্দ্দিকাশী হইয়াছিল। তখন আমি বালকমাত্র। সেই সময়ে বাবা একদিন আমাকে এক তোলা আরক এক কাঁচ্চা আন্দাজ গোলাপজলে মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর যখন আমার পিতা ইউসফ্জিদিগের বিদ্রোহদমনে গিয়াছিলেন তখন আমি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম। একদিন এই যুদ্ধের অবকাশে আমরা পিতাপুত্রে দলবল লইয়া শিকার করিতে গিয়াছিলাম। শিকারে শ্রান্ত হইয়া সন্ধ্যার সময় নীলাব (সিন্ধু) নদীতীরে আমাদের ছাউনীতে ফিরিয়া আসিলাম। শরীর এত অবসন্ন যে কিছুই ভাল লাগিতে ছিল না। এই সময়ে আমার এক ভৃঙ্গার বাহক আমার অবসন্ন অবস্থা দেখিয়া বলিল 'জাঁহাপনা! বলিতে সাহস হয় না—যদি অল্পমাত্র মদিরা সেবন করেন তবে এখনই ক্লান্তি দূর হইয়া যায়।' চিকিৎসক হাকিম আলির শিবিরে তৎক্ষণাৎ কোন প্রকার উত্তেজক পানীয়ের জন্য আমি লোক পাঠাইলাম। সে আমাকে আন্দাজ দেড় পেয়ালা পীতবর্ণের একপ্রকার সুস্বাদু মদ্য একটী বোতলে করিয়া আনিয়া দিল। আমি মদিরাপাত্র শেষ করিয়া বিশেষ আনন্দ বোধ করিলাম।

"সেইদিন হইতে আমার রীতিমত দীক্ষা আরম্ভ হইল। ইহার পর আমি দিন দিন মাত্রা বাড়াইতে লাগিলাম। আমি কেবলমাত্র আঙ্গুরের মদিরা খাইতাম। কিন্তু তাহার কুফল শীঘ্র

প্রকাশ হওয়ায় ‘আরক’পানে মনোনিবেশ করিলাম। এই সময়ে আমি একজন পাকা মদ্যপায়ী হইয়া উঠিলাম। নয় বৎসর মধ্যে আমার পেয়ালা-সংখ্যা কুড়িতে উঠিয়াছে—ইহার মধ্যে চোদ্দটী আমি দিনের বেলা ব্যবহার করিতাম, আর রাত্রের জন্য ছয়টী থাকিত। হিন্দুস্থানের মাপ অনুসারে এই কয় পেয়ালা মদিরার ওজন ছয় সের। এই সময়ে মদের সঙ্গে একটী মোরগের কাবাব এবং রুটী খাইতাম। কিন্তু ইহার পরিণাম—শোচনীয় পরিণাম শীঘ্রই আমার শরীরে আবির্ভূত হইল। কেহ সাহস করিয়া আমাকে কিছু বলিতে পারিত না; কিন্তু এই সময়ে আমার দুর্দ্দশা এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে আমি নিজ হাতে অনেক সময় পেয়ালা ধরিতে পারিতাম না—আমার হাত কাঁপিত, আর অপরে পেয়ালা ধরিয়া আমাকে পান করাইয়া দিত।

"এই সময়ে যখন আমার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল তখন আমি পিতার পারিষদ হাকিম হামাম খাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। হাকিম সাহেব বিশেষ স্নেহ ও দয়ার সহিত আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, ‘যদি আপনি আর ছয় মাস ধরিয়া এই-রূপে চলেন তাহা হইলে আপনাকে রক্ষা করা ভার হইয়া দাঁড়াইবে।’ তাঁহার উপদেশ আমার পক্ষে বহুমূল্য বোধ হইল। কে কোথায় স্বেচ্ছায় জীবন নষ্ট করিয়াছে! সেই দিন হইতে আমি ‘আরক’সেবন পরিত্যাগ করিলাম। কোন একটা নেশা করিয়া তাহা একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া অভ্যাসকারীর পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া পড়ে। সুতরাং আমি ফালুহা * খাইতে আরম্ভ করিলাম। মদ্যপান কমিল—ফালুহার পরিমাণ

* ভাঙ্গের মত কোন উত্তেজক দ্রব্য হইবে।

বাড়াইয়া দিলাম। কিন্তু যে প্রলোভন, যে মধুর আস্বাদ, যে তৃষ্ণা হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে একেবারে তাড়ান নিতান্ত অসম্ভব। আমি মাঝেমাঝে আরকের সঙ্গে দ্রাক্ষা-মদিরা মিশাইয়া পান করিতে লাগিলাম। সাত বৎসর ব্যাপী এইরূপ কঠোর চেষ্টার পর আমার পেয়ালার সংখ্যা সাতটীতে পরিণত হইল।

"এখন দিন-বিচার করিয়া আমাকে চলিতে হইত। রাত্রে ভিন্ন পান করিতাম না। বৃহস্পতিবার রাত্রে (এই দিন আমি সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলাম) এ কার্য্য করিতাম না। শুক্র-বার আমাদের বিশ্রাম দিন। রবিবার আমার পিতার জন্ম-দিনের স্মরণার্থে পান-ব্যাপারে বিরত থাকিতাম। এমন কি এ সকল দিনে মাংস পর্য্যন্ত খাইতাম না।

"কালুহাতে আর তৃপ্তি হইত না, সুতরাং এবার হইতে অহি-ফেন ধরিলাম। এখন আমার বয়স ৪৬ বৎসর চারি মাস (সৌরমতে)—চান্দ্রমতে ৪৭ বৎসর নয় মাস। আমি দ্বিপ্রহের সময় পাঁচ এবং রাত্রে ছয় সুর্খ (১·৯০ গ্রেণ) করিয়া অহিফেন সেবন আরম্ভ করিলাম।"

জাহাঙ্গীরের নিজের লিখিত বিবরণ ত এইরূপ। তাঁহার পরবর্ত্তী ও সমসাময়িক অন্যান্য বিদেশীয় লেখকদিগের লিখিত বিবরণ হইতে এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংলণ্ডাধিপ জেম্‌সের রাজসভা হইতে স্যর টমাস রো দূতরূপে আগরায় আসেন। তিনি তাঁহার লিখিত বিবরণের একস্থানে লিখিয়াছেন—"চারি কিম্বা পাঁচ বাক্স রক্তবর্ণ মদিরা সম্রাট্‌কে উপহার দিলে 'চিপসাইডের' মণি-

মুক্তাদির অপেক্ষাও তাঁহার ও কুমারদের নিকট তাহা আদরণীয় হইবে।"

আর একজন ভ্রমণকারী একস্থলে লিখিয়াছেন—"জাহাঙ্গীর খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি যে অনুরাগ দেখাইতেন—তাহা তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারতাজনিত নহে। খ্রীষ্টানধর্ম্মে মদ্যপানসম্বন্ধে যেরূপ সুবিধাকর ব্যবস্থা আছে কেবল তাহারই জন্য তিনি তাহাদের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিতেন।

রাত্রিকালেই পূর্ণতেজে মদিরোৎসব চলিত। আগরায় যত ইউরোপীয় ছিল (ইহাদের মধ্যে পর্টুগীজের দলই বেশী) তাহাদের সকলেরই বাদসাহের গুপ্তগৃহে সন্ধ্যার পর মদিরাপানের নিমন্ত্রণ হইত। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পান ও নৃত্যগীতাদি চলিত। কখন কখনও প্রভাতকালেও ইহার বিরাম হইত না। মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া বাদসাহ যখন ঢলিয়া পড়িতেন তখন আলোকমালা নির্ব্বাপিত করিয়া তাঁহার সঙ্গীগণ ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতেন।

"যে দিন গোঁড়া মুসলমানেরা উপবাস করিতেন, সে দিন জাহাঙ্গীর বাছিয়া বাছিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহার পান-গৃহের কাছে দুইটা ভয়ানক চিতাবাঘ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকিত। তিনি ইহাদিগকে সেই বাঘের মুখে ফেলিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া উপবাস-ব্রত ভঙ্গ করাইতেন। অবশেষে প্রাণের ভয়ে তাহারাও সুরায় উন্মত্ত হইয়া উঠিত।"

যুদ্ধক্ষেত্রেও এ মদিরা-স্রোতের বিরাম ছিল না। ঘোরতর রণকোলাহলের মধ্যে জয় পরাজয়ের মধ্যে যে সময় তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা চিত্তবল সঞ্চয় করিতেন জাহাঙ্গীর সেই সময়ে মদিরায় দৈহিক উত্তেজনা বাড়াইতেন।

Gladwin সাহেব তাঁহার লিখিত জাহাঙ্গীরের রাজত্ববিবরণের একস্থলে লিখিয়াছেন—"যুদ্ধ খুব চলিয়াছে—শত্রুপক্ষ যেন একটু প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে। হয় ত তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে মোগলের রক্তবর্ণ পতাকা ভূলুণ্ঠিত করিতেও পারে, এমনি সঙ্কটময় সময়ে সৈন্যাধ্যক্ষ মোকারেব খাঁ বাদসাহের সঙ্গে যোগ দিলেন। রাজপুতের তীক্ষ্ণ বর্ষা আসিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বিদ্ধ করিল। মোকারেবকে আর হাতীর উপর উঠিতে হইল না। এই সময়ে কিদ্‌মিত্ পিরিষ্ট জাহাঙ্গীরের পেয়ালা-বাহক পান-পাত্র ও মদিরা লইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল। বাদসাহ হাওদার উপর বসিয়া মদিরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন। মোকারেবকেও উত্তেজিত করা হইল।"

নূরজাহানের পুনঃপুনঃ নিষেধসত্ত্বেও জাহাঙ্গীর মদিরা সেবন করিতেন। পরিশেষে যদিও রাজ্ঞী সম্রাটের এই দোষ অনেক পরিমাণে সংশোধিত করিয়াছিলেন এবং জাহাঙ্গীর নিজমুখেও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—তত্রাচ বিপদের অবস্থাতে তাঁহার মদিরাসক্তি প্রবল ভাব ধারণ করিত। যখন মহাব্বত খাঁ তাঁহাকে বন্দী করিয়া নিজ শিবিরে লইয়া যান তখন একদিন মহাব্বত তাঁহার বন্দী-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, স্বর্ণমণ্ডিত খট্টা ছাড়িয়া জাহাঙ্গীর বিমর্ষভাবে নীচে মখমলের উপর শুইয়া পড়িয়াছেন। বাদসাহের এই বিরস ও শোচনীয় ভাব দেখিয়া মহাব্বতের হৃদয় আর্দ্র হইল—তিনি সসম্মানে কহিলেন "জাঁহাপনা! আপনার সন্তোষের জন্য আমি কি কার্য্য করিতে পারি আদেশ করুন।" জাহাঙ্গীর মহাব্বতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"যদি আমাকে প্রফুল্ল দেখিতে চাও, তবে কয়েক পাত্র মদিরা দাও ও

সুলতানাকে আনিয়া দাও।” মহাব্বৎ বিনম্রভাবে উত্তর করিলেন “জাঁহাপনা! এ দুইটীর একটীও আমার দ্বারা হইবে না। প্রথমটী দিব না—কেন না তাহা আমাদের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। সুলতানাকেও আনিতে পারিব না—কারণ এ পর্য্যন্ত আমি চেষ্টা করিয়া আপনাকে যেরূপ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়াছি, সেই বুদ্ধিমতী রাজ্ঞী এখানে আসিলেই তাহা বিফল হইয়া যাইবে।”

লোক-চেনা।

শিরোলক্ষণ।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে সাধারণভাবে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ বৃত্তিসমূহের উল্লেখ করা গিয়াছিল। এক্ষণে সেই সমস্ত বৃত্তির একটু বিস্তৃত বর্ণনা করা যাইতেছে।

(১) স্ত্রৈপুরুষিক আসক্তি বা প্রেম। উপমস্তিষ্ক, যাহাকে ইংরাজিতে সেরিবেলম বলে—সেই উপমস্তিষ্কে এই বৃত্তিটি অবস্থিত। ডাক্তার গল্ কোন ব্যক্তির প্রেম-বিকার রোগ পরীক্ষা করিবার সময় এই বৃত্তিটি আবিষ্কার করেন। তিনি দেখিলেন, ঐ প্রেম-বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মস্তকের ঐ অংশটি অত্যন্ত স্থূল ও পরিপুষ্ট এবং যখনই ঐ বিকারের আবেশ উপস্থিত হইত তখনই ঐ স্থান অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিত। তাহার পর অন্যান্য অনেক ব্যক্তির মস্তক পরীক্ষা করিয়া তাঁহার এই অনুমানটি আরও দৃঢ়ীভূত হয়। কানের ঠিক পিছনে একখণ্ড অস্থি আছে, অনেকে ভুলক্রমে তাহাকেই এই স্থান বলিয়া অনুমান করেন—কিন্তু তাহা ঠিক নহে; ঐ অস্থিখণ্ডের অব্যবহিত পরেই ঢিবির মত

একটু উঁচু যাহা হাত দিয়া অনুভব করা যায়, উহাই এই বৃত্তির স্থান। কানের পশ্চাদ্ভাগের মধ্যস্থল হইতে দুই ইঞ্চি পরিমাণ রেখা টানিলেই এই স্থানটি পাওয়া যায়। যাহাদের এই বৃত্তি প্রবল, তাহাদের এক কান হইতে আর এক কান পর্য্যন্ত ঘাড় প্রশস্ত, স্থূল ও ভরপুর দেখায়। এবং যাহাদের এই বৃত্তি ক্ষীণতর তাহাদের এই স্থান সংকীর্ণ ও সরু দেখায়। এই বৃত্তি যে পুরুষের প্রবল, স্ত্রীজাতির উপর তাহার বিশেষ একটা টান জন্মে। স্ত্রীলোকের সংসর্গে সে থাকিতে খুব ভালবাসে। সে সহজে স্ত্রীলোকদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে—তাহার অন্যান্য ভাল গুণ বিশেষ না থাকিলেও স্ত্রীলোকেরা সহজেই তাহার প্রতি একটু অনুরক্ত হয়। সহজেই সে স্ত্রীলোকের মনে প্রেম উদ্দীপন করিতে পারে—সে নিজেও সহজে প্রেমের বশবর্ত্তী হয়। এই স্ত্রৈপুরুষিক আসক্তির সহিত তাহার যদি সখ্য-ভাব প্রবল থাকে তাহা হইলে তাহার প্রেম আরও জ্বলন্ত হইয়া উঠে—সে তাহার প্রেম-পাত্রের নিতান্ত অনুরক্ত ভক্ত হয়। তাহার সহিত যদি আবার ভাবুকতার যোগ হয়, তাহা হইলে তো আর রক্ষা নাই—সে আগুন আরও দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে—সে প্রেম লৌকিক সীমা অতিক্রম করিয়া একটু ঔপন্যাসিক ভাব ধারণ করে। তাহার উপর যদি তাহার দৃঢ়তা থাকে তাহা হইলে সে প্রেম স্থায়ী হয়। কিন্তু এই দৃঢ়তার অভাব হইলে, চিরকাল একজনেরই উপর সে অনুরাগ যে থাকিবে এরূপ নিশ্চয় বলা যায় না। যদি ভাবুকতা ও প্রশংসা-লালসা অত্যন্ত প্রবল হয়, জুগোপিষা ও জিঘাংসা যদি কিয়ৎপরিমাণে প্রবল হয়, দয়া,সখ্যভাব ও অনুমিতি-বৃত্তি যদি মাঝামাঝি থাকে এবং ধর্ম্মবুদ্ধি বা সত্যনিষ্ঠা যদি কম হয়, তাহা হইলে সে ভ্রমর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অনেকের মন হরণ করিবার চেষ্টা করে—এক জনেতে সন্তুষ্ট

থাকে না। প্রেমের সহিত যদি সখ্য, বাৎসল্য, দয়া ও ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবল হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়; সে গার্হস্থ্য সুখভোগের উপযোগী পাত্র; সে বন্ধুবান্ধব পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করে। ইহার সহিত প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা-বৃত্তি প্রবল হইলে নিজ পরিবারবর্গকে সে সাহস পূর্ব্বক শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করে, তাহাদের স্বত্বসমূহ বজায় রাখিবার চেষ্টা করে এবং যদি তাহাদের প্রতি কেহ অন্যায় অত্যাচার করে তাহাকে বিধিমতে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হয়। স্ত্রৈ-পুরুষিক আসক্তির সহিত যাহার প্রশংসা-লালসা ও ভাবুকতা প্রবল, সে স্ত্রীজাতি কিসে সন্তুষ্ট হয় কেবল তাহারই চেষ্টা করে; তাহাদের নিন্দা প্রশংসা তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করে; বেশ-ভূষার যে রকম ধাঁচা তাহারা ভাল বলে তাহারই সে অনুবর্ত্তী হইয়া চলে। যদি অর্জ্জন-স্পৃহা কম হয় এবং প্রশংসা-লালসা ও দয়া বেশি হয় তাহা হইলে স্ত্রীলোকদিগের জন্য সে অকাতরে অর্থব্যয় করিতে পারে। যদি জুগোপিষা ও সখ্য প্রবল হয়, তাহা হইলে সে ভালবাসা বাহিরে বেশি প্রকাশ করে না। হৃদয়ের ভাব অনেক সময়ে তাহার হৃদয়েই বদ্ধ রাখে। কখন কখন সে ঔদাস্যেরও ভান করিয়া থাকে। কিন্তু জুগোপিষা কম হইলে, সে তাহার হৃদয়ের প্রেম মুক্তভাবে ব্যক্ত করে—হৃদয়-দ্বার একেবারে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। এবং সেই সঙ্গে যদি আত্মমর্য্যাদা কম হয়, তাহা হইলে সে প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাইতে থাকে। কিন্তু আত্মমর্য্যাদা ও দৃঢ়তা ও বুদ্ধিবৃত্তি-সমূহ বেশি হইলে, প্রেমে সে মগ্ন হইতে পারে কিন্তু এতটা অহ-ঙ্কার থাকে যে সে সম্পূর্ণরূপে প্রেমের দাস হইয়া পড়ে না।

যাহার সখ্য, ভাবুকতা, প্রশংসা-লালসা, হাস্যপ্রিয়তা অত্যন্ত

বেশি ও অনুমিতি মাঝামাঝি,সে সুন্দরী, আমুদে ও কলাবতী স্ত্রী-লোকের সংসর্গে থাকিতে ইচ্ছা করে এবং তাহাদিগকেই ভাল-বাসে। যাহার সখ্য, দয়া, ভক্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধি বেশি, সে সুশীলা, ধর্ম্মানুরাগী ভগবৎ-ভক্ত স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরাগী হয়; ইহার সহিত তাহার যদি আবার বুদ্ধিবৃত্তি বেশি থাকে তবে সে ধর্ম্মানু-রাগী, সুরুচিসম্পন্না বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের নিতান্ত ভক্ত হয় এবং আমুদে স্ত্রীলোকদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। যদি ধর্ম্মবুদ্ধি কম ও অনুমিতি মাঝামাঝি ও ভাবুকতা অত্যন্ত বেশি থাকে তবে স্ত্রীলোকের নৈতিক গুণের জন্য সে বড় লালায়িত হয় না; সেই সঙ্গে যদি ভাবুকতা, প্রশংসা-লালসা, হাস্যকৌতুক-প্রিয়তা, আশা ও ভাষা বেশি থাকে এবং ধর্ম্মবুদ্ধি যদি কম হয় তবে সে স্ত্রীলোকদের সহিত ও তাহাদের সম্বন্ধে ঠাট্টাঠুট্টি করিয়া থাকে এবং অবৈধ আমোদ-প্রমোদে রত হয়। যাহার ধর্ম্মবুদ্ধি ভাবুকতা, কৌতুকপ্রিয়তা, দয়া ও বুদ্ধিবৃত্তি বেশি, সে অতি সুরুচিপূর্ণ অথচ সরস ও মধুর ভাষায় আপন প্রেম ব্যক্ত করে, কিন্তু যাহার ভাবুকতা ও কৌতুকপ্রিয়তা কম সে কুরুচিপূর্ণ ইতর ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহার ধর্ম্মবুদ্ধি বেশি, সে প্রবল প্রলোভনেও আত্মসম্বরণ করিতে পারে। ইহার সহিত তাহার যদি দৃঢ়তা, সাবধানতা ও অনুমিতি-বৃত্তি প্রবল হয় তবে সে কিছুতেই প্রলোভনে আত্মসমর্পণ করে না। কিন্তু দৃঢ়তা, সাবধনতা ও অনুমিতি যদি মাঝামাঝি হয়, তবে সে কখন কখন প্রলোভনে পতিত হয়, কিন্তু তাহার পরেই অনুতাপ করে। এবং তাহার সহিত প্রশংসা-প্রিয়তা প্রবল হইলে অত্যন্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। যাহার ধর্ম্মবুদ্ধি ও অনুমিতি কম, সে এই প্রেম-বৃত্তির অপব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

যেতে নাহি দিব।

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর;
জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায়
মধ্যাহ্ন বাতাসে; স্নিগ্ধ অশথের ছায়
ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি'
ঘুমায়ে পড়েছে; যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঃঝুম;—
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।

গিয়েছে আশ্বিন,—পূজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহু দূর দেশে
সেই কর্ম্মস্থানে। ভৃত্যগণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিষপত্র দড়াদড়ি লয়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এঘরে ওঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার
একদণ্ড তরে; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে; যথেষ্ট না হয় মনে
যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, "এ কি কাণ্ড!
এত ঘট এত পট হাঁড়ি সরা ভাণ্ড
বোতল বিছানা বাক্স রাজ্যের বোঝাই
কি করিব লয়ে! কিছু এর রেখে যাই
কিছু লই সাথে!"

সে কথায় কর্ণপাত
নাহি করে কোন জন। "কি জানি দৈবাৎ
এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে
তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে!—
সোনা-মুগ সরুচাল সুপারি ও পান;
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই চারি খান
গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনা নারিকেল;
দুই ভাণ্ড ভাল রাই-শরিষার তেল;
আমসত্ব আমচুর; সের দুই দুধ;
এই সব শিশি কৌটা ওষুধ বিষুধ।
মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে,
মাথা খাও, ভুলিয়োনা, খেয়ো মনে করে!"
বুঝিনু যুক্তির কথা বৃথা বাক্যব্যয়।
বোঝাই হইল উঁচু পর্ব্বতের ন্যায়।

তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে; কহিলাম ধীরে
"তবে আসি"। অমনি ফিরায়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষুপরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।

বাহিরে দ্বারের কাছে বসি অন্যমন
কন্যা মোর চারি বছরের; এতক্ষণ
অন্য দিনে হয়ে যেত স্নান সমাপন,
দুটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা

মুদিয়া আসিত ঘুমে ; আজি তার মাতা
দেখে নাই তারে ; এত বেলা হয়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মোর কাছে কাছে ঘেঁসে,
চাহিয়া দেখিতেছিল মৌন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রান্ত দেহে এবে
বাহিরের দ্বারপ্রান্তে কি জানি কি ভেবে
চুপিচাপি বসেছিল। কহিনু যখন
"মাগো, আসি," সে কহিল বিষণ্ণ-নয়ন
ম্লান মুখে "যেতে আমি দিব না তোমায়!"
যেখানে আছিল বসে' রহিল সেথায়,
ধরিল না বাহু মোর, রুধিল না দ্বার,
শুধু নিজ হৃদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল "যেতে আমি দিব না তোমায়!"
তবুও সময় হল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল!

ওরে মোর মূঢ় মেয়ে!
কে রে তুই, কোথা হতে কি শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা, এত স্পর্দ্ধাভরে—
"যেতে আমি দিব না তোমায়!" চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে' দুটি ছোট হাতে,
গরবিনি, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বসি গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্ত ক্ষুদ্র দেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ!

ব্যথিত হৃদয় হতে বহুভয়ে লাজে
মর্ম্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে,—শুধু বলে রাখা "যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি!" হেন কথা কে পারে বলিতে
"যেতে নাহি দিব!" শুনি তোর শিশুমুখে
স্নেহের প্রবল গর্ব্ববাণী, সকৌতুকে
হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে,
তুই শুধু পরাভূত চোখে জল ভোরে
দুয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন,
আমি দেখে চলে' এনু মুছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুইধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে খরবেগ
শরতের ভরা গঙ্গা। শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধ-পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মত
নীলাম্বরে শুয়ে।—দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগযুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিস্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিনু নিঃশ্বাস।

কি গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী! চলিতেছি যতদূর
শুনিতেছি একমাত্র মর্ম্মান্তিক সুর

"যেতে আমি দিব না তোমায়!" ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্ব্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে
"যেতে নাহি দিব" "যেতে নাহি দিব!" সবে
কহে "যেতে নাহি দিব!" তৃণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বসুমতী
কহিছে প্রাণপণে "যেতে নাহি দিব!"
আয়ুঃক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব'-নিব'
আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে,
কহিতেছে শতবার "যেতে দিব না রে!"
এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্ত্য ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব!" হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়!

চলিতেছে এমনি অনাদিকাল হতে।
প্রলয়-সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত ব্যগ্রবাহু জলন্ত আঁখিতে
"দিবনা দিবনা যেতে" ডাকিতে ডাকিতে
হু হু করে তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত্ত কলরবে।
সম্মুখ ঊর্ম্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
"দিবনা দিবনা যেতে"—নাহি শুনে কেউ,
নাহি কোন সাড়া!

চারিদিক হতে আজি

অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্ব-মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্যাকণ্ঠস্বরে। শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে'
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু ত রে
শিথিল হল না মুষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্যাটির মত
অক্ষুণ্ণ প্রেমের গর্ব্বে কহিছে সে ডাকি
"যেতে নাহি দিব" ; ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,—
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়
"যেতে নাহি দিব।" যতবার পরাজয়
ততবার কহে—"আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে !
আমার আকাঙ্ক্ষাসম এমন আকুল,
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল,
এমন প্রবল, বিশ্বে কিছু আছে আর !"
এত বলি দর্পভরে করে সে প্রচার
"যেতে নাহি দিব !"—তখনি দেখিতে পায়
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে' চলে' যায়
একটি নিশ্বাসে তার আদরের ধন,—
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব্ব নতশির।—তবু প্রেম বলে

"সত্য ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর-দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার লিপি!" তাই স্ফীতবুকে
সর্ব্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে
দাঁড়াইয়া সুকুমার ক্ষীণ তনুলতা
বলে "মৃত্যু তুমি নাই।"—হেন গর্ব্বকথা!
মৃত্যু হাসে বসি! মরণ-পীড়িত সেই
চিরঞ্জীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই
অনন্ত সংসার, বিষণ্ণ নয়ন পরে
অশ্রুবাষ্পসম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে
চির-কম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা
টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ-কুয়াশা
বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে,
দু'খানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে
জড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে,
স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে' আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া,—
অশ্রুবৃষ্টিভরা কোন্ মেঘের সে মায়া!

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্ম্মরে
এত ব্যাকুলতা; অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্তবায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে; বেলা ধীরে যায় চলে'
ছায়া [illegible] করি' অশথের তলে।

মেঠো সুরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর মাঝে; শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন, স্তব্ধ মর্ম্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মত।

টা টো টে।

একটা, দুটো, তিনটে। টা, টো, টে। একই বিভক্তির এরূপ তিন প্রকার ভেদ কেন হয় এই প্রশ্ন সহজেই মনে উদয় হইয়া থাকে।

আমাদের বাঙ্গলা শব্দে যে সকল উচ্চারণ-বৈষম্য আছে মনোনিবেশ করিলে তাহার একটা-না-একটা নিয়ম পাওয়া যায় এ কথা আমি সাধনায় পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি বাঙ্গলায় আদ্যক্ষরবর্ত্তী অ স্বরবর্ণ কখন কখন বিকৃত হইয়া ও হইয়া যায়—যেমন কলু (কোলু), কলি (কোলি), ইত্যাদি—স্বরবর্ণ এ বিকৃত হইয়া অ্যা হইয়া যায়—যেমন খেলা (খ্যালা), দেখা (দ্যাখা), ইত্যাদি—কিন্তু এইরূপ পরিবর্ত্তন গুটি-কতক নিয়মের অনুবর্ত্তী।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি ই এবং উ স্বরবর্ণ বাঙ্গলার বহু-

সংখ্যক উচ্চারণ-বিকারের মূলীভূত কারণ। উপস্থিত প্রসঙ্গেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উদাহরণ। সে অথবা এ শব্দের পরে টা বিভক্তি অবিকৃত থাকে। যেমন সেটা, এটা। কিন্তু সেই অথবা এই শব্দের পরে টা বিভক্তির বিকার জন্মে। যেমন এইটে, সেইটে।

অতএব দেখা গেল ইকারের পর টা হইয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র টা বিভক্তির মধ্যে এই নিয়মকে সীমাবদ্ধ করিলে সঙ্গত হয় না। ইকারের পরবর্ত্তী আকারমাত্রের প্রতিই এই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

হইয়া—হয়ে	হিসাব—হিসেব
লইয়া—লয়ে	মাহিনা—মাইনে
পিঠা—পিঠে	ভিক্ষা—ভিক্ষে
চিঁড়া—চিঁড়ে	শিক্ষা—শিক্ষে
শিকা—শিকে	নিন্দা—নিন্দে
বিলাত—বিলেত	বিনা—বিনে

এমন কি, যেখানে অপভ্রংশে মূল শব্দের ইকার লুপ্ত হইয়া যায় সেখানেও এ নিয়ম খাটে। যেমন—

করিয়া—কর্ষে'

মরিচা—মর্চ্চে

সরিষা—সর্ষে

আ এবং ই মিলিত হইয়া যুক্তস্বর ঐ হয়। এজন্য ঐ স্বরের পরেও আ স্বরবর্ণ এ হইয়া যায়। যেমন—

কৈলাস—কৈলেস

তৈয়ার—তয়ের

কেবল ইহাই নহে। য-ফলার সহিত সংযুক্ত আকারও একারে পরিণত হয়। কারণ, য-ফলা ই এবং অ-য়ের যুক্তস্বর। যথা—

অভ্যাস—অভ্যেস

কন্যা—কন্যে

বন্যা—বন্যে

হত্যা—হত্যে

আমরা অ স্বরবর্ণের সমালোচনাস্থলে লিখিয়াছিলাম ক্ষ র পূর্ব্ববর্ত্তী অকার ও হইয়া যায়। যেমন, লক্ষ (লোক্ষ), পক্ষ (পোক্ষ), ইত্যাদি। যে কারণবশতঃ ক্ষ-র পূর্ব্ববর্ত্তী অ ওকারে পরিণত হয় সেই কারণেই ক্ষ-সংযুক্ত আকার এ হইয়া যায়। যথা রক্ষা—রক্ষে। বাঙ্গলায় ক্ষা-অন্ত শব্দের উদাহরণ অধিক না থাকাতে এই একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই নিরস্ত হইলাম।

য-ফলা এবং ক্ষ সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখি। য-ফলা ও ক্ষ-সংযুক্ত আকার একারে পরিণত হয় বটে কিন্তু আদ্যক্ষরে এ নিয়ম খাটে না; যেমন ত্যাগ, ন্যায়, ক্ষার, ক্ষালন ইত্যাদি।

বাঙ্গলার অনেকগুলি আকারান্ত ক্রিয়াপদ কালক্রমে একারান্ত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে ছিল করিলা, খাইলা, করিতা, খাইতা, করিবা, খাইবা। এখন হইয়াছে করিলে, খাইলে, করিতে, খাইতে, করিবে, খাইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী ইকারের প্রভাবেই যে আ স্বরবর্ণের ক্রমশঃ এইরূপ দুর্গতি হইয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বে ই থাকিলে যেমন পরবর্ত্তী আ এ হইয়া যায় তেমনি পূর্ব্বে উ থাকিলে পরবর্ত্তী আ ও হইয়া যায় এরূপ উদাহরণ বিস্তর আছে। যথা—

ফুটা—ফুটো
মুঠা—মুঠো
কুলা—কুলো
চুলা—চুলো
কুয়া—কুয়ো
চুমা—চুমো

ঔকারের পরেও এ নিয়ম খাটে। কারণ, ঔ, অ এবং উ-মিশ্রিত যুক্তস্বর। যথা—

নৌকা—নৌকো
কৌটা—কৌটো।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গলার দুই একটা উচ্চারণ-বিকার এমনি দৃঢ়মূল হইয়া গেছে যে, যেখানেই হোক তাহার অন্যথা দেখা যায় না। যেমন ইকার এবং উকারের পূর্ব্ববর্ত্তী অ-কে আমরা প্রায় সর্ব্বত্রই ও উচ্চারণ করি। সাধুভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থ পাঠকালেও আমরা কটি এবং কটু শব্দকে কোটি এবং কোটু উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু অদ্যকার প্রবন্ধে যে নকল দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তৎসম্বন্ধে এ কথা খাটে না। আমরা প্রচলিত ভাষায় যদিও মুঠাকে মুঠো বলি তথাপি গ্রন্থে পড়িবার সময় মুঠা পড়িয়া থাকি—চলিত ভাষায় বলি নিন্দে, সাধু ভাষায় বলি নিন্দা। অতএব এই দুই প্রকারের উচ্চারণের মধ্যে একটা শ্রেণীভেদ আছে। পাঠকদিগকে তাহার কারণ আলোচনা করিতে সবিনয় অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

অভিব্যক্তির ধারাত্রয়।

আশ্চর্য্য! এককালে দেখিয়াছি—

অ্যাঙ্ (A) বলিলেন "অভিব্যক্তি"।

ব্যাঙ্ (B) বলিলেন "অভিব্যক্তি"।

খোল্‌সে (C) বলিলেন "অভিব্যক্তি"।

এখন দেখিতেছি বিপরীত,—

এখন A বলিতেছেন "অভিব্যক্তি"।

B বলিতেছেন "অভিব্যক্তি"।

C বলিতেছেন "অভিব্যক্তি"।

ইহার অর্থ সকলেই বুঝিতেছেন—টীকা করা অধিকন্তু।

প্রথমে ডারুইন যখন নরের সংজ্ঞা করিলেন লাঙ্গুল-ভ্রষ্ট বানর তখন বড় বড় পাদ্‌রি সাহেবেরা তাঁহাকেই তাঁহার সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন; কাজেই তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিতে লোকে ভয় পাইল। এই জন্য, তখন ডারুইনের অন্তরঙ্গ-শ্রেণীর A-মহোদয়েরা যদি বলিতেন "অভিব্যক্তি", তাঁহার বহিরঙ্গ-শ্রেণীর B-মহোদয়েরা বলিতেন "অভিব্যক্তি" এবং তাঁহার দূর-সম্পর্কীয় C-মহাত্মারা বলিতেন "অভিব্যক্তি"। কিন্তু সে দিন গিয়াছে;—এক্ষণে লোকে ডারুইন সাহেবকে তাঁহার সিদ্ধান্তের ব্যভিচার-স্থল বলিয়া কীর্ত্তন করে এবং তাঁহার প্রতিপক্ষদিগকে তাঁহার সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া প্রতিপন্ন করে;—এক্ষণে A-শ্রেণীর লোকেরা ডারুইনের সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার অনেক স্থানের গ্রন্থি-বন্ধন কাঁচা দেখিতে পাইয়াছেন, তাই এক্ষণে তাঁহারা "অভিব্যক্তি" না বলিয়া বলিতেছেন

"অভিব্যক্তি"; কিন্তু B-শ্রেণীর মহাত্মারা একবার যে-কোনো গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করেন, তাহার বাহিরে তাঁহাদিগকে নড়ানো দায়;—তাঁহারা গুরুপরম্পরায় যাহা পান তাহাতেই পরম সন্তোষ অবলম্বন করেন—গুরুর চক্ষুই তাঁহাদের চক্ষু, গুরুর কর্ণই তাঁহাদের কর্ণ;—সুতরাং প্রমাণের তাঁহারা বড়-একটা ধার ধারেন না;—এই জন্য ইহাঁরা নির্ভয়ে বলেন "অভিব্যক্তি"; C-মহাত্মারা অভিব্যক্তি শব্দের অর্থ যে কি তাহাও জানেন না—কিন্তু সে বৃত্তান্তটি লোকের নিকটে গোপন করিতে ইচ্ছুক, তাই তাঁহারা বলেন "অভিব্যক্তি", অর্থাৎ তাঁহারা যেন এক এক জন এক এক ডারুয়িন।

এই কারণগতিকে অভিব্যক্তিবাদ প্রথমে ছিল অবরোহী শ্রেণী

(A) অভিব্যক্তি (B) অভিব্যক্তি (C) অভিব্যক্তি

এখন হইয়াছে আরোহী শ্রেণী——

(A) অভিব্যক্তি (B) অভিব্যক্তি (C) অভিব্যক্তি

ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, পৃথিবী যেমন গোলাকৃতি, পৃথিবীর গতিও সেইরূপ চক্রাকৃতি;—(১) দিন হইতে রাত্রি—রাত্রি হইতে দিন; (২) শীত হইতে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্ম হইতে শীত; (৩) ভাঙন হইতে গড়ন, গড়ন হইতে ভাঙন; (৪) অভিব্যক্তি হইতে লয়, লয় হইতে অভিব্যক্তি; (৫) অভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তি, অভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তি।

প্রথম বিবেচনায় এইরূপ। কিন্তু দ্বিতীয় একটি বিবেচনা এখনো অবশিষ্ট আছে—সেটি এই; যদিও দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, তথাপি দ্বিতীয় দিন প্রথম দিন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন—তৃতীয় দিন আরো বিভিন্ন, ইত্যাদি। মনে কর, প্রথম দিন ভাদ্র মাসের শেষ দিন—রৌদ্র প্রচণ্ড; তখন হইতে দিনের

উত্তাপ অল্পে অল্পে হ্রাসের দিকে চলিতে লাগিল ;—চারি মাস পরেই শীতের কণকণানি দীন দরিদ্রের অসহ্য হইয়া উঠিল। দিন যেমন প্রতিদিনই নূতন, বৎসরও তেমনি প্রতিবৎসরই নূতন; আমাদের দেশে বিজয়া-দশমীর দিন এক সময়ে বৎসরের আরম্ভদিন ছিল এরূপ অনুমান হয়—এক্ষণে তাহা কত পিছাইয়া পড়িয়াছে!

অতএব পৃথিবীর গতি-মার্গ শুধু যে কেবল চক্র তাহা নহে, তাহা প্রচক্র; অর্থাৎ প্যাঁচ।

প্র উপসর্গে বাহিরে প্রসারণ বুঝায়;—প্রসারণ শব্দটিই তাহার প্রমাণ। প্রশ্বাস অর্থাৎ বাহিরে প্রসারিত শ্বাস;—নিশ্বাস অর্থাৎ ভিতরে টানিয়া লওয়া শ্বাস; প্রবাস অর্থাৎ স্বদেশের বাহিরে বাস; নিবাস অর্থাৎ স্বদেশের ভিতরে বাস, ইত্যাদি। অতএব, প্রচক্র শব্দটি আমরা যদিও নূতন গড়িলাম, কিন্তু তাহাতে আমাদের দেশীয় ভাষার প্রাণে আঘাত লাগিতে পারে না; কেননা প্রচক্র শব্দের অর্থ আমরা এইরূপ করিতেছি—ভিতর হইতে বাহিরে ক্রমশ-প্রসারিত চক্র।

প্রচক্র চক্র

চক্রের উপর দিয়া চলিলে কিয়ৎ কাল পরে আমরা স্বস্থানে আসিয়া পড়ি; কিন্তু প্রচক্রের উপর দিয়া চলিলে হয় আমরা ক্রমশই বাহির হইতে বাহিরে চলিতে থাকি (ইহাকে বলে Evolution, অভিব্যক্তি), নয় আমরা ক্রমশই ভিতর হইতে ভিতর দিকে চলিতে থাকি (ইহাকে বলে Involution, লয়)।

বিজ্ঞানের মতে অভিব্যক্তির আরম্ভ একটি বিন্দু হইতে (প্রটোপ্লাজ্‌ম্ হইতে)। কিন্তু সে বিন্দু কিরূপ বিন্দু? বিন্দু তো

সকলই—ধূলিও বিন্দু—হিমবিন্দুও বিন্দু—বালুকাও বিন্দু—কিন্তু যে বিন্দু হইতে প্রাণ মন বিদ্যাবুদ্ধি ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইবে —সে বিন্দু কিরূপ বিন্দু? এ বিন্দু শুধু কেবল বিন্দু নহে, ইহার মধ্যে আরো কিছু আছে। প্রথমতঃ এই বিন্দুর মধ্যে একটা নড়া-চড়ার ভাব আছে—যাহাকে আমরা বলিতে পারি প্রাণ-বৃত্তি; দ্বিতীয়তঃ তাহার মধ্যে একটা আত্মরক্ষার এবং আত্মসমর্থনের ভাব আছে যাহাকে আমরা বলিতে পারি অহংবৃত্তি। এই বিন্দু যখন ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তিতে পদনিক্ষেপ করে তখন দেখা যায় তিনটি মূল উপাদান একসঙ্গে অভিব্যক্ত হইতেছে; আর, দেখিতে পাই -তিনের মধ্যে একটির পদবী সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, সেইটিকে আমরা বলিব জ্যেষ্ঠ উপাদান, তাহার অব্যবহিত নিচেরটিকে বলিব মধ্যম উপাদান, তৃতীয়টিকে বলিব কনিষ্ঠ উপাদান। জ্যেষ্ঠ উপাদানটি অহংবৃত্তি, মধ্যম উপাদানটি প্রাণ-বৃত্তি, কনিষ্ঠ উপাদানটি গঠন এবং আকৃতি। এইরূপে পাই-তেছি যে, বি ন্দুর অভিব্যক্তির তিনটি ধারা——অহংবৃত্তির অভি-ব্যক্তি, প্রাণবৃত্তির অভিব্যক্তি ও গঠন এবং আকৃতির অভি-ব্যক্তি। গঠন এবং আকৃতি হ'চ্চে রথ—মন-প্রাণবৃত্তি হচ্চে অশ্ব; আর, অহংবৃত্তি হচ্চে মন-প্রাণের পরিচালক—সারথী। যদি অহং-বৃত্তি না থাকে তবে আত্মরক্ষার কোনো অর্থ থাকে না—কে কাহার আত্মরক্ষা করিতেছে' তাহা বুঝিতে পারা যায় না; যদি প্রাণবৃত্তি না থাকে তবে "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" এ কথার কোনো অর্থ থাকে না—কেননা উদ্বর্ত্তন শব্দের অর্থই হচ্চে প্রাণধারণ করিয়া বর্ত্তিয়া থাকা; আকৃতি এবং গঠন চক্ষে দেখিবার সামগ্রী সুতরাং তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহারো কোনো দ্বিরুক্তি হইতে পারে না। সর্প হইতে পক্ষী অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিলে কি বুঝায়?

(১) প্রথমে বুঝায় পক্ষীর ডানা অভিব্যক্ত হইয়াছে, পদ অভি-ব্যক্ত হইয়াছে, পুচ্ছ অভিব্যক্ত হইয়াছে ইত্যাদি; তদ্ব্যতীত অস্থি স্নায়ু প্রভৃতির বিশেষত্বের অভিব্যক্তি যাহা ভিতরে হই-য়াছে তাহা বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন।

(২) দ্বিতীয়তঃ বুঝায়, পক্ষীর আকাশে উড্ডয়ন, গীতধ্বনি নিঃ-সারণ এবং আর আর প্রাণের স্ফূর্ত্তি যাহা সর্পজাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

(৩) তৃতীয়তঃ বুঝায় যে, পক্ষীর আত্মরক্ষার ভাব আপনাকে ছাপাইয়া উঠিয়া সন্তান-রক্ষা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। তাহার আমিত্ব উথলিয়া উঠিয়া মমত্বে (অর্থাৎ আমার-ত্বে) পরিণত হইয়াছে। সুতরাং পক্ষীর অহম্বৃত্তির পরিধি সর্পের অপেক্ষা বেশী।

অভিব্যক্তির ধারাত্রয় দেখাইয়াই আপাততঃ ক্ষান্ত হইলাম। আর এক সময়ে অভিব্যক্তির ভিত্তিমূলের পর্য্যালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

স্বরলিপি।

দেশ—তাল কাওয়ালি।

বল্ আমায় কি হয়েছে, কে তোরে কি কথা বলেছে,
ওরে আমার আদরিণী!
কিসের লাগি অভিমান, মুখখানি কেন ম্লান,
ছিছি ওকি, মোছো আঁখি,
সুধা-মুখে হাস দেখি,
আয় কোলে, আয় মা, দেরে চুমি।

২|২

।০।১।২´।৩।

০ ১ ২´ ৩
॥ ররা মা। পা ঞঞা। র্সা র্সা। ঞর্রা র্সঞা। ধপা মগা।
॥ বল্ আ। মায় কি, হ। য়ে ছে। কে,তো রে কি। কথা বলে।

॥ ০
। রা ঞঞা। ধধা ধঞধা। পমা গরা ॥ মপা ননা।
। ছে ওরে। আ মার। আদ রিণী ॥ কিসের লাগি।

। র্সর্সা র্সা। র্সর্সা র্সঞা। র্সর্সা র্সা। ঞর্সা র্র্রা।
। অভি মান। মুখ খানি। কেন ম্লান। ছিছি ও।

। র্রা র্মর্মা। র্রা র্সা। ঞঞা ধধা। ঞপা মমা।
। কি, মোছো। আঁ খি। সুধা মুখে। হাস দেখি।

। রমা রমা। পর্সা পা। ঞধা পমা ॥ ॥
। আয় কোলে। আয় মা। দেরে চুমি ॥ ॥

বেহাগ—একতালা।

আগে চল্ আগে চল্ ভাই!
পড়ে' থাকা পিছে মরে' থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই!
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় করে' পাঁজি পুঁথি ধরে
সময় কোথা পাবি বল্ ভাই!
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে করে',
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও
মহত্বের পথ ধরে'।
পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে' যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন
মিছে নয়নের জল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

চিরদিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথপাশে,
যারা চলে যায় কৃপা চক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে।
ধূলিশয্যা ছাড়ি ওঠ ওঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

ওঁ

। ্ না না। র্সা -া -া ॥ ্ নধা না। নর্ ্ র্সর্সা নধনা।
।— আ গে। চ — ল্ ॥ — আ গে। চ ল্ ভা ।
॥
। পা নধা না। র্সর্সা -া -া। পপধা -ধা ধধা।
। ই আ গে। চল্ — —। পড়ে — থা।

। পধপাঃ মঃ গা। গগমা -পা মপমা। গাঃ রঃ সা।
। কা পি ছে। মরে — থা। কা মি ছে।

। না মা গমা। পা পনা নধনা। ^ন^র্সা -া নধনা।
। বেঁ চে ম । রে কি বা। কল্ — ভা ।

। পা নধনা না । র্সা -া -া। া নধা না।
। ই আ গে । চল্ — —। — আ গে।

। নর্সর্রা র্সনা ^ধ^না। পা নধা না। র্সর্রর্সনা -র্সা -া ।
। চ ল্ ভা। ই আ গে। চ — ল্ ।

। পপা -া পা। না নাঃ র্সঃ। র্সর্সা -নর্সর্রা র্সা। র্সর্সা -া -া।
। প্রতি— নি। যে যে ই। যেতে — ছে। সময় — — ।

। নর্সা -া র্সা। -া র্রর্সর্রা র্সা। ননাঃ -ধঃ পা।
। দিন — ক্ষণ। — চে রে । থাকা — কি।

। নঃধনর্সঃ না -া। পপা -া পা। পাঃ পঃ পা।
। ছু নয় —। সময় — স । ময় ক রে।

। পনা -া ধা। ^ধ^র্সা না না। গগা মা পা। পা নধা না।
। পাঁজি—পুঁ। থি ধ রে। সম য় কো। থা পা বি।

। নর্র্সা -া নধনা। পা নধা না। র্সা -া -া ॥
। ব ল্ ভা । ই আ গে। চল্ — —॥

। সমা -া সপা। পা পা পা। পপা -া পা। পা পা ধা।
। পিছা — য়ে । যে আ ছে। তারে—ডে। কে না ও।

। ঞা ধঞর্সা ঞর্সঞা। -া ধা পধপা। মা -া -গমপমা।
। নি য়ে যাও । — সা থে। ক — — ॥

। গা -া -া । র্সর্সা -া র্গা। র্রা র্রর্মা র্গা। র্সর্রাঃ -র্গঃ র্রা।
। রে — — । কেহ — না। হি আ সে। একা — চ ।

। র্সা র্সা -া। গা মা পা। না নধা না। র্সর্রর্সনা -র্সাঃ -নঃ।
। লে যা ও। ম হ ত্বে। র প থ। ধ — — ।

। [ধ]নাঃ -ধঃ -পা। পা পা পা। না না নর্সা। র্সা নর্সর্রা র্সা।
। রে — —। পি ছু হ। তে ডা কে। মা য়া র।

। র্সনা র্সা -া। র্সর্সা -া র্সা। র্সা নর্সর্রা -র্সা। মনাঃ -ধঃ পা।
। কাঁ দন্ —। ছিঁড়ে— চ। লে যা ও। মোহে— র।

। নঃ -ধনর্সঃ না -া। র্সর্গা -া র্রা। র্গা র্গর্মর্পা র্মর্গা।
। বাঁ — ধন্ —। সাধি — তে। হ ই বে।

। র্সর্রাঃ -র্গঃ র্রা। র্সর্সা -া -া। গা মা পা। পনা নধা না।
। প্রাণে — র। সাধন্— —। মি ছে ন। য় নে র্।

। নর্সর্রা র্সা নধনা। পা নধনা না। র্সা -া -া॥ সা সা সা।
। জ ল্ ভা। ই আ গে। চল — —॥ চি র দি।

। পা পা পা। পা ধা পধা। ঞর্সা র্সা ঞধা। পা ধা মপা।
। ন্ আ ছি। ভি খা রী। র্ বে শে। জ গ তে।

। ধঞা ধা পধপা। পমা -া -গমপা। মগা -া -া।
। র্ প থ। পা — —। শে — —।

। র্সর্গা -া র্রা। র্র্মা র্গাঃ -র্রঃ। র্সা র্রর্গা র্রা।
। যায়া — চ। লে যায় —। রু পা চো।

। র্সা র্সা -া। গা মা পনা। না নধা না। নর্রা -র্সর্রর্সাঃ -নঃ।
। খে চা য়। প দ ধূ। লা উ ড়ে। আ — —।

। [ধ]নাঃ -ধঃ -পা। পপা -া পা। নাঃ নঃ না।
। সে — —। ধূলি — শ। য্যা ছে ড়ে।

। নর্সা -নর্সর্রা র্রর্সা। র্সাঃ র্সঃ র্সা। র্সা র্সা র্সা।
। ওঠ — ও। ঠ স বে। মা ন বে।

। -া র্রা র্সর্রর্সা। নাঃ ধঃ পা। নঃধনঃ র্সনা না।
। র্ মা থে। যো গ্ দি। তে —হ বে।

। র্সর্গা -া র্রা। র্রর্মাঃ র্গঃ র্গা। র্মর্রাঃ -র্গঃ র্রা। র্সা র্সা র্সা।
। তায — দি। না পা র। চেয়ে — দে। খ ত বে।

। গমা -া পা। পনা নধা না। নর্রা র্মর্রর্সা নধনা।
। ঐ — আ। ছে র সা। ত ল্ ভা।

। পা নধা না। র্সা -া -া॥
। ই আ গে। চল্— —॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

(১) া = এক মাত্রা। দুইটি কিম্বা ততোধিক স্বরাক্ষর একত্র করিয়া শেষ অক্ষরটির গায়ে আকার বসাইলে এইরূপ বুঝায় যে ঐ সুরগুলি এক মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইবে। যথা, সরসনা।

ঃ = অর্দ্ধ মাত্রা। াঃ = দেড় মাত্রা।

(২) ঋ = কোমল র ; জ্ঞ = কোমল গ ; হ্ম = কড়ি ম ;
দ = কোমল ধ ; ণ = কোমল ন।

(৩) খাদ সুরের চিহ্ন = হসন্ত ; উচ্চ সুরের চিহ্ন = রেফ্।

(৪) ॥ যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন। ফিরিয়া গিয়া আস্থায়ীর যে স্থান হইতে ধরিতে হইবে তাহার আগে যুগল ছেদ থাকে। আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া যেখানে থামিতে হয় তাহার শিরোদেশে যুগল ছেদ বসে।

(৫) এক মাত্রা কালস্থায়ী বিরামের চিহ্ন = হাইফেন-বিরহিত আকার।

(৬) যে সুরের নীচে গানের কথা নাই—যেখানে পূর্ব্ব কথার টানটি চলিতেছে সেইখানে হাইফেন বসে।

(৭) দ্বিতীয় গানটির উপরে "৩" এই যে তালাঙ্কটি আছে, ইহার অর্থ এই:—এই গানটির প্রত্যেক তাল-বিভাগের অন্তর্গত

তিনটি করিয়া মাত্রা আছে। তাই, আকারের বামপার্শ্বে ৩ এই সংখ্যাটি দেওয়া হইয়াছে। এই যে তিনটি করিয়া মাত্রা আছে, ইহার প্রত্যেক মাত্রাটি কতক্ষণ স্থায়ী তাহা জ্ঞাপনার্থ আকারের দক্ষিণপার্শ্বে ৩ সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, এক দুই তিন, এক দুই তিন, এই-রূপ খুব তাড়াতাড়ি এক হইতে তিন পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিতে যতটা সময় লাগে উহার প্রত্যেক মাত্রাটি তত-কাল স্থায়ী। কতটা দ্রুত, কতটা বিলম্বিত এই চিহ্নের দ্বারা তাহা জানা যায়।

সিংহল-ভ্রমণ।

১৪ই অক্টোবর ২৮শে আশ্বিন।

অদ্য সকালবেলা উঠিয়া সহরতলী ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। সহর অপেক্ষা সহরতলী দেখিতে অতি সুন্দর। বাড়ী-গুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বড় বড় নারিকেলের বাগান ও দারুচিনির গাছ। এই সকল বাগানের মধ্যে অতি পরিষ্কার এক একটী বাংলা। নারিকেল-বাগানে ছোট ছোট গাছে নানা রঙের নারিকেল ধরিয়াছে—লোকে ইচ্ছা করিলে হাত বাড়াইয়াও নারিকেল পাড়িতে পারে। এখানে নারিকেলের ব্যবহার খুব বেশী; এমন কি পাক করিবার সময় জলের পরি-বর্ত্তে নারিকেলের দুধ ব্যবহার হয়। যতপ্রকার নারিকেল আছে তন্মধ্যে কিং কোকোনাট্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহার নীচেই মিল্‌ক্ কোকোনাট্। কিং কোকোনাট্ ছোট হরিদ্রাবর্ণ,ছোট ছোট গাছে বহুল পরিমাণে ধরে। মিল্‌ক্ কোকোনাট্ বড় ও সবুজবর্ণ।

সহরতলী ভ্রমণ করিতে করিতে সিংহলবাসী কোন বন্ধুর সহিত মহম্মদ ক্যমি পাশার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। মিশর দেশের যুদ্ধের পর ইনি ইংরাজ গবর্মেন্ট কর্ত্তৃক কলম্বোতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। গবর্মেন্ট এক্ষণে পাঁচ শত টাকা মাসহারা দেন, উহাতেই তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। আমাদের আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। ইহাঁর বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর, মুখ দেখিলেই একজন বুদ্ধিমান্ ও তেজস্বী পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। আমরা তাঁহার সহিত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম। ঘর একটী বড় বাংলা। বৈঠকখানা ইংরাজী আস্‌বাবে সুসজ্জিত; ঘরের চারিদিকে কোচ ও চৌকি, মাঝখানে একটী টেবিলের উপর স্তূপাকার পুস্তক। আমরা বসিবামাত্র স্বহস্তে আমাদিগকে চুরুট দিয়া আমাদের সহিত ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমেই বলিলেন—আপনারা বিদেশী হইয়া আমার মত ক্ষুদ্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন এ জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। টেবিলের উপর যে পুস্তকগুলি ছিল সেইগুলি দেখাইয়া তিনি বলিলেন—ইহারাই আমার পরম বন্ধু; দিনরাত্রি ইহাদের সহিত গল্প করিয়া কাল কাটাই। এগুলি কেবল ইতিহাস। পৃথিবীতে যে দেশে যত প্রকার ইতিহাস পাওয়া যায়, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া ইনি নিজের মতামতসহ আরবী ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। দিনের বেলা সমস্ত লিখেন, রাত্রিকালে সেইগুলি পরিষ্কার করেন। প্রথম ভাগ শেষ হইয়াছে। ইনি আরও বলিলেন—আমি এত পরিশ্রম করিবার এই উপায়টী না পাইলে এতদিন মরিয়া যাইতাম। পুস্তকগুলি বারবার দেখাইয়া আমাদিগকে বলিলেন—

ইহারাই আমার প্রকৃত বন্ধু, ইহারাই আমার জীবন রক্ষা করিতেছে। প্রায় ছয় বৎসর হইল ইনি নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, এই সময়ের মধ্যে ইনি শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত ইংরাজী শিখিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁর নির্ব্বাসনের কারণ ও ইহাঁর সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদিগকে অনেক কথা বলিলেন। ইনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের যে সমস্ত মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেগুলি দেখিলে ইহাঁকে একজন পাকা ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া বোধ হয়। ইনি আরবি পাশার একজন প্রধান সচিব ছিলেন।

আমাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে একজন ভৃত্য ছোট ছোট পেয়ালায় কাফি লইয়া উপস্থিত হইল। প্রভু অপেক্ষা ভৃত্যের পরিচ্ছদ বেশী জমকালো। আমাদের কাফি-পান শেষ হইলে তবে পাশা নিজে পান করিলেন। ভৃত্যের হস্ত হইতে পেয়ালা লইবার সময় এবং পান-শেষে রাখিয়া দিবার সময় দুইবার তাহাকে অভিবাদন করিলেন। ইহা আমাদের নিকটে নূতন ঠেকিল।

বাসায় আসিয়াই আহার করিয়া বেলা তিনটার ট্রেনে ক্যাণ্ডি রওনা হইলাম।

গাড়ী চড়িবার চারি পাঁচ মিনিট পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এখানে রেলগাড়ীতে কয়লা ব্যবহার হয় না। কারণ, এখানে কয়লার খনি নাই। কয়লার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। গাড়ীতে যত যাত্রী ছিল সকলেই আমাদের যাহাতে যথেষ্ট স্থান হয় সে জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল এবং সকলেই আলাপ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। এ দেশের লোক খুব সরলপ্রকৃতি ও ভদ্র বলিয়া বোধ হইল।

কলম্বো হইতে প্রথম ষ্টেশন কল্যাণী নদীর অপর পারে।

কল্যাণী পর্য্যন্ত রেলের দুই ধারে বড় বড় নারিকেল ও সুপারির বন। কল্যাণী হইতে পানগোহালা ষ্টেশন পর্য্যন্ত ছোট ছোট পাহাড়, তাহার উপর নারিকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল ইত্যাদির জঙ্গল। চারিদিকে পাহাড় হইতে অজস্র ঝরণার জল পড়িতেছে, মধ্যে মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সৃষ্টি হইয়াছে। সমতল ভূমিতে ধান্যক্ষেত্র। পানগোহালার পরে একটী বড় নদী; উহাকে মহাবালুকা গঙ্গা বলে। এদেশে নদীর নাম গঙ্গা।

গাড়ী পাহাড়ের উপর দিয়া চলিতেছে। গাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইখানা ইঞ্জিন। পথ অতি দুর্গম; বড় বড় পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া টানেল প্রস্তুত করত রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এক একটী টানেল অতিক্রম করিতে আট দশ মিনিট সময় লাগে। ঘোর অন্ধকার, এমন কি দিবাভাগে নিজের গা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। আশপাশের গহ্বরগুলি এত গভীর যে দেখিলে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। এইরূপ এক স্থান এত উচ্চ ও দুর্গম যে সেই স্থান হইতে নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিতেই ভয় হয়। ইংরাজীতে এই স্থানটিকে সেন্সেশনল্ পয়েণ্ট বলে। কিন্তু কি সুন্দর দৃশ্য! চারিদিকে পর্ব্বত,মাঝে মাঝে আম, নারিকেল ও সুপারীর বাগান, মধ্যে মধ্যে বিবিধ লতাপাতাসুশোভিত নিকুঞ্জবন। পাহাড়ের পাদদেশে হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র ক্রমশঃ নিম্নগামী হইয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছে। এখানকার প্রকৃতির শোভা দেখিয়া মনে হইল মাই-কেল যথার্থই বলিয়াছেন—অয়ি চারু লঙ্কে, জগৎ-বাসনা তুই সুখের সদন।

এখানকার রেলওয়ে-ষ্টেশনে একটী মাত্র আলো থাকে। গাড়ী ছাড়িবার সময় ঘণ্টা দেয় না। ডাকগাড়ীর সহিত একখানা করিয়া গাড়ী থাকে উহাতে খাদ্য বিক্রয় হয়।

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে ক'রে',
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও
মহত্ত্বের পথ ধরে'।
পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে' যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন
মিছে নয়নের জল ভাই।
আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই।

চিরদিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথপাশে,
যারা চলে যায় কৃপা চক্ষে চায়,
পদধুলা উড়ে আসে।
ধূলিশয্যা ছাড়ি ওঠ ওঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল ভাই।
আগে চল্‌, আগে চল্‌ ভাই।

৩ া ৩

। । না না। র্সা -া -া॥ া নধা না। নর্র্া র্সর্র্সা নধনা।
।— আ গে। চ — ল্‌॥ — আ গে। চ ল্‌ ভা।
॥
। পা নধা না। র্সর্র্সা -া -া। পপধা -ঞা ঞধা।
। ই আ গে। চল্‌ — —। পড়ে — থা।

। পধপাঃ মঃ গা। গগমা -পা মপমা। গাঃ রঃ সা।
। কা পি ছে। মরে — থা। কা মি ছে।

। সা মা গমা। পা পনা নধনা। ^ন^র্সা -া নধনা।
। বেঁ চে ম। রে কি বা। ফল্ — ভা।

। পা নধনা না। র্সা -া -া। া নধা না।
। ই আ গে। চল্ — —। — আ গে।

। নর্সর্রা র্সনা ^ধ^না। পা নধা না। র্সর্রর্সনা -র্সা -া।
। চ ল্ ভা। ই আ গে। চ — ল্।

। পপা -া পা। না নাঃ র্সঃ। র্সর্সা -নর্সর্রা র্সা। র্সর্সা -া -া।
। প্রতি — নি। মে যে ই। যেতে — ছে। সময় — —।

। নর্সা -া র্সা। -া র্রর্সর্রা র্সা। ননাঃ -ধঃ পা।
। দিন — ক্ষণ। — চে রে। থাকা — কি।

। নঃধনর্সঃ না -া। পপা -া পা। পাঃ পঃ পা।
। ছু নয় —। সময় — স। ময় ক রে।

। পনা -া ধা। ^ধ^র্সা না না। গগা মা পা। পা নধা না।
। পাঁজি — পুঁ। থি ধ রে। সম য় কো। থা পা বি।

। নর্রর্সা -া নধনা। পা নধা না। র্সা -া -া ॥
। ব ল্ ভা। ই আ গে। চল্ — — ॥

। সসা -া সপা। পা পা পা। পপা -া পা। পা পা ধা।
। পিছা — রে। যে আ ছে। তারে — ডে। কে না ও।

। ঞা ধঞর্সা ঞর্সঞা। -া ধা পধপা। মা -া -গমপমা।
। নি য়ে যাও। — সা থে। ক — — ॥

। গা -া -া। র্সর্সা -া র্গা। র্রা র্রর্মা র্গা। র্সর্রাঃ -র্গঃ র্রা।
। রে — —। কেহ — না। হি আ সে। একা — চ।

। র্সা র্সা -া। গা মা পা। না নধা না। র্সর্রর্সনা -র্সাঃ -নঃ।
। লে যা ও। ম হ ত্বে। র প থ। ধ — —।

। ধনাঃ -ধঃ -পা। পা পা পা। না না নর্সা। র্সা নর্সর্রা র্সা।
। রে — —। পি ছু হ। তে ডা কে। মা য়া র।

। র্সনা র্সা -া। র্সর্সা -া র্সা। র্সা নর্সর্রা -র্সা। নন্নাঃ -ধঃ পা।
। কাঁ দন্ —। ছিঁড়ে— চ। লে যা ও। মোহে— র।

। নঃ -ধনর্সঃ না -া। র্সর্গা -া র্রা। র্গা র্গর্মর্পা র্মর্গা।
। বাঁ — ধন্ —। সাধি — তে। হ ই বে।

। র্সর্রাঃ -র্গঃ র্রা। র্সর্সা -া -া। গা মা পা। পনা নধা না।
। প্রাণে — র। সাধন্— —। মি ছে ন। য় নে র্।

। নর্সর্রা র্সা নধনা। পা নধনা না। র্সা -া -া॥ সা সা সা।
। জ ল্ ভা। ই আ গে। চল — —॥ চি র দি।

। পা পা পা। পা ধা পধা। ঞর্সা র্সা ঞধা। পা ধা মপা।
। ন্ আ ছি। ভি খা রী। র্ বে শে। জ গ তে।

। ধঞা ধা পধপা। পমা -া -গমপা। মগা -া -া।
। র্ প থ। পা — —। শে — —।

। র্সর্গা -া র্রা। র্রর্মা র্গাঃ -র্রঃ। র্সা র্রর্গা র্রা।
। যারা — চ। লে যায় —। রু পা চো।

। র্সা র্সা -া। গা মা পনা। না নধা না। নর্রা -র্সর্রর্সাঃ -নঃ।
। খে চা য়। প দ ধূ। লা উ ড়ে। আ — —।

। ধনাঃ -ধঃ -পা। পপা -া পা। নাঃ নঃ না।
। সে — —। ধূলি — শ। য্যা ছে ড়ে।

। নর্সা -নর্সর্রা র্রর্সা। র্সাঃ র্সঃ র্সা। র্সা র্সা র্সা।
। ওঠ — ও। ঠ স বে। মা ন বে।

। -া র্রা র্সর্রর্সা। নাঃ ধঃ পা। নঃধনঃ র্সনা না।
। র্ সা থে। যো গ্ দি। তে -হ বে।

। র্সর্গা -া র্রা। র্র্মাঃ র্গঃ র্গা। র্সর্রাঃ -র্গঃ র্রা। র্সা র্সা র্সা।
। তায — দি। না পা র। চেয়ে — দে। থ ত বে।

। গমা -া পা। পনা নধা না। নর্রা র্সর্র্সা নধনা।
। ঐ — আ। ছে র সা। ত ল্ ভা।

। পা নপা না। র্সা -া -া॥
। ই আ গে। চল্ — — ॥

চিহ্নের ব্যাখ্যা।

(১) ।=এক মাত্রা। দুইটি কিম্বা ততোধিক স্বরাক্ষর একত্র করিয়া শেষ অক্ষরটির গায়ে আকার বসাইলে এইরূপ বুঝায় যে ঐ সুরগুলি এক মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইবে। যথা, সরসনা।

ঃ=অর্দ্ধ মাত্রা। ।ঃ=দেড় মাত্রা।

(২) ঋ=কোমল র; জ্ঞ=কোমল গ; হ্ম=কড়ি ম; দ=কোমল ধ; ঞ=কোমল ন।

(৩) খাদ সুরের চিহ্ন=হসন্ত; উচ্চ সুরের চিহ্ন=রেফ্।

(৪) ॥ যুগল ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন। ফিরিয়া গিয়া আস্থায়ীর যে স্থান হইতে ধরিতে হইবে তাহার আগে যুগল ছেদ থাকে। আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া যেখানে থামিতে হয় তাহার শিরোদেশে যুগল ছেদ বসে।

(৫) এক মাত্রা কালস্থায়ী বিরামের চিহ্ন=হাইফেন-বিরহিত আকার।

(৬) যে সুরের নীচে গানের কথা নাই—যেখানে পূর্ব্ব কথার টানটি চলিতেছে সেইখানে হাইফেন বসে।

(৭) দ্বিতীয় গানটির উপরে "৩" এই যে তালাঙ্কটি আছে, ইহার অর্থ এইঃ—এই গানটির প্রত্যেক তাল-বিভাগের অন্তর্গত

তিনটি করিয়া মাত্রা আছে। তাই, আকারের বামপার্শ্বে ৩ এই সংখ্যাটি দেওয়া হইয়াছে। এই যে তিনটি করিয়া মাত্রা আছে, ইহার প্রত্যেক মাত্রাটি কতক্ষণ স্থায়ী তাহা জ্ঞাপনার্থ আকারের দক্ষিণপার্শ্বে ৩ সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, এক দুই তিন, এক দুই তিন, এই-রূপ খুব তাড়াতাড়ি এক হইতে তিন পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিতে যতটা সময় লাগে উহার প্রত্যেক মাত্রাটি তত-কাল স্থায়ী। কতটা দ্রুত, কতটা বিলম্বিত এই চিহ্নের দ্বারা তাহা জানা যায়।

সিংহল-ভ্রমণ।

১৪ই অক্টোবর ২৮শে আশ্বিন।

অদ্য সকালবেলা উঠিয়া সহরতলী ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। সহর অপেক্ষা সহরতলী দেখিতে অতি সুন্দর। বাড়ী-গুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বড় বড় নারিকেলের বাগান ও দারুচিনির গাছ। এই সকল বাগানের মধ্যে অতি পরিষ্কার এক একটী বাংলা। নারিকেল-বাগানে ছোট ছোট গাছে নানা রঙের নারিকেল ধরিয়াছে—লোকে ইচ্ছা করিলে হাত বাড়াইয়াও নারিকেল পাড়িতে পারে। এখানে নারিকেলের ব্যবহার খুব বেশী; এমন কি পাক করিবার সময় জলের পরি-বর্ত্তে নারিকেলের দুধ ব্যবহার হয়। যতপ্রকার নারিকেল আছে তন্মধ্যে কিং কোকোনাট্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তাহার নীচেই মিল্ক্ কোকোনাট্। কিং কোকোনাট্ ছোট হরিদ্রাবর্ণ, ছোট ছোট গাছে বহুল পরিমাণে ধরে। মিল্ক্ কোকোনাট্ বড় ও সবুজবর্ণ।

সহরতলী ভ্রমণ করিতে করিতে সিংহলবাসী কোন বন্ধুর সহিত মহম্মদ ফ্যুমি পাশার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। মিশর দেশের যুদ্ধের পর ইনি ইংরাজ গবর্মেন্ট কর্ত্তৃক কলম্বোতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। গবর্মেন্ট এক্ষণে পাঁচ শত টাকা মাসহারা দেন, উহাতেই তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। আমাদের আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। ইহাঁর বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর, মুখ দেখিলেই একজন বুদ্ধিমান্ ও তেজস্বী পুরুষ বলিয়া বোধ হয়। আমরা তাঁহার সহিত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম। ঘর একটী বড় বাংলা। বৈঠকখানা ইংরাজী আস্‌বাবে সুসজ্জিত ; ঘরের চারিদিকে কৌচ ও চৌকি, মাঝখানে একটী টেবিলের উপর স্তূপাকার পুস্তক। আমরা বসিবামাত্র স্বহস্তে আমাদিগকে চুরুট দিয়া আমাদের সহিত ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমেই বলিলেন—আপনারা বিদেশী হইয়া আমার মত ক্ষুদ্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন এ জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। টেবিলের উপর যে পুস্তকগুলি ছিল সেইগুলি দেখাইয়া তিনি বলিলেন—ইহারাই আমার পরম বন্ধু ; দিনরাত্রি ইহাদের সহিত গল্প করিয়া কাল কাটাই। এগুলি কেবল ইতিহাস ; পৃথিবীতে যে দেশে যত প্রকার ইতিহাস পাওয়া যায়, সমস্ত সংগ্রহ করিয়া ইনি নিজের মতামতসহ আরবী ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। দিনের বেলা সমস্ত লিখেন, রাত্রিকালে সেইগুলি পরিষ্কার করেন। প্রথম ভাগ শেষ হইয়াছে। ইনি আরও বলিলেন—আমি এত পরিশ্রম করিবার এই উপায়টী না পাইলে এতদিন মরিয়া যাইতাম। পুস্তকগুলি বারবার দেখাইয়া আমাদিগকে বলিলেন—

ইহারাই আমার প্রকৃত বন্ধু, ইহারাই আমার জীবন রক্ষা করিতেছে। প্রায় ছয় বৎসর হইল ইনি নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, এই সময়ের মধ্যে ইনি শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত ইংরাজী শিখিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁর নির্ব্বাসনের কারণ ও ইহাঁর সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদিগকে অনেক কথা বলিলেন। ইনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের যে সমস্ত মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেগুলি দেখিলে ইহাঁকে একজন পাকা ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া বোধ হয়। ইনি আরবি পাশার একজন প্রধান সচিব ছিলেন।

আমাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে একজন ভৃত্য ছোট ছোট পেয়ালায় কাফি লইয়া উপস্থিত হইল। প্রভু অপেক্ষা ভৃত্যের পরিচ্ছদ বেশী জমকালো। আমাদের কাফি-পান শেষ হইলে তবে পাশা নিজে পান করিলেন। ভৃত্যের হস্ত হইতে পেয়ালা লইবার সময় এবং পান-শেষে রাখিয়া দিবার সময় দুইবার তাহাকে অভিবাদন করিলেন। ইহা আমাদের নিকটে নূতন ঠেকিল।

বাসায় আসিয়াই আহার করিয়া বেলা তিনটার ট্রেনে ক্যাণ্ডি রওনা হইলাম।

গাড়ী চড়িবার চারি পাঁচ মিনিট পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এখানে রেলগাড়ীতে কয়লা ব্যবহার হয় না। কারণ, এখানে কয়লার খনি নাই। কয়লার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। গাড়ীতে যত যাত্রী ছিল সকলেই আমাদের যাহাতে যথেষ্ট স্থান হয় সে জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল এবং সকলেই আলাপ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। এ দেশের লোক খুব সরলপ্রকৃতি ও ভদ্র বলিয়া বোধ হইল।

কলম্বো হইতে প্রথম ষ্টেশন কল্যাণী নদীর অপর পারে।

কল্যাণী পর্য্যন্ত রেলের দুই ধারে বড় বড় নারিকেল ও সুপারির বন। কল্যাণী হইতে পানগোহালা ষ্টেশন পর্য্যন্ত ছোট ছোট পাহাড়, তাহার উপর নারিকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল ইত্যাদির জঙ্গল। চারিদিকে পাহাড় হইতে অজস্র ঝরণার জল পড়িতেছে, মধ্যে মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সৃষ্টি হইয়াছে। সমতল ভূমিতে ধান্যক্ষেত্র। পানগোহালার পরে একটী বড় নদী; উহাকে মহাবালুকা গঙ্গা বলে। এদেশে নদীর নাম গঙ্গা।

গাড়ী পাহাড়ের উপর দিয়া চলিতেছে। গাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইখানা ইঞ্জিন। পথ অতি দুর্গম; বড় বড় পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া টানেল প্রস্তুত করত রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এক একটা টানেল অতিক্রম করিতে আট দশ মিনিট সময় লাগে। ঘোর অন্ধকার, এমন কি দিবাভাগে নিজের গা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। আশপাশের গহ্বরগুলি এত গভীর যে দেখিলে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। এইরূপ এক স্থান এত উচ্চ ও দুর্গম যে সেই স্থান হইতে নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিতেই ভয় হয়। ইংরাজীতে এই স্থানটিকে সেন্সেশনল্ পয়েণ্ট বলে। কিন্তু কি সুন্দর দৃশ্য! চারিদিকে পর্ব্বত,মাঝে মাঝে আম, নারিকেল ও সুপারীর বাগান, মধ্যে মধ্যে বিবিধ লতাপাতাসুশোভিত নিকুঞ্জবন। পাহাড়ের পাদদেশে হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র ক্রমশঃ নিম্নগামী হইয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছে। এখানকার প্রকৃতির শোভা দেখিয়া মনে হইল মাই-কেল যথার্থই বলিয়াছেন—অয়ি চারু লঙ্কে, জগৎ-বাসনা তুই সুখের সদন।

এখানকার রেলওয়ে-ষ্টেশনে একটী মাত্র আলো থাকে। গাড়ী ছাড়িবার সময় ঘণ্টা দেয় না। ডাকগাড়ীর সহিত একখানা করিয়া গাড়ী থাকে উহাতে খাদ্য বিক্রয় হয়।

রামবুক্‌না ষ্টেশন হইতে ক্যাণ্ডি পর্য্যন্ত রেল অতি উচ্চ পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়াছে।

আমরা রাত্রি আটটার সময় ক্যাণ্ডিতে পৌছিলাম। প্রিয় ভ্রাতা ধর্ম্মপালের কয়েক জন বন্ধু অতি আগ্রহের সহিত আমাদিগকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন। ইহাঁদের মধ্যে একজন তত্রত্য বুদ্ধিষ্ট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, আর একজন সম্ভ্রান্ত উন্নতিশীল ব্যক্তি—ঐ স্কুলের সেক্রেটারী, এবং আর একজন ঐ স্কুলের ছাত্র।

আমাদের বাসা বুদ্ধিষ্ট হাইস্কুলের ছাত্রদের বোর্ডিংয়ের দোতলায় নির্দ্দিষ্ট ছিল। মফস্বল হইতে যে সকল ধনবান লোকের ছেলেরা এখানে পড়িতে আসেন তাঁহারাই এই বোর্ডিংয়ে বাস করেন। এই বোর্ডিং-হাউসে ছেলেদের আহারাদির বেশ সুবন্দোবস্ত। শিক্ষাবিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি আছে।

বৃষ্টি হইতেছিল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছাত্র ও শিক্ষকগণের সহিত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। রাত্রিতে শয়ন করিয়া সিংহলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কমল-কুমারিকাশ্রম।

(ফরাসী হইতে অনুবাদিত)

বৌদ্ধ উপাখ্যান।

বৌদ্ধধর্ম্মে একটি উন্নত ও মহৎ কথা আছে। তাহা এই যে, আধ্যাত্মিক নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মানবের মনোগত ভাব স্বীয় শক্তিদ্বারা সফলতা লাভ করিতে পারে।

কিন্তু এরূপ ক্ষমতা যে সকলেরই আছে তাহা নয়। ইতর লোকের ইহাতে কোনই অধিকার নাই, তাহাদের নির্জ্জীব বাসনা স্বপ্ন অপেক্ষা অস্পষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী, সংকল্পসাধনে অক্ষম; কেবলমাত্র মানসিক জীবনের একাগ্র চর্চ্চাই অলৌকিক ফললাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

সিদ্ধিপ্রয়াসী ব্যক্তির মনোনিবেশ কতকাল স্থায়ী হয় তাহার উপর বিশেষ কিছুই নির্ভর করে না। অনেক সাধুপুরুষ ত নির্জ্জন অরণ্যে ও নিস্তব্ধ আশ্রমে সমস্ত জীবন নিষ্ফল ধ্যানে যাপন করিয়াছেন, অথচ কখনও কখনও একটি মাত্র আনন্দোচ্ছ্বাসে কোন তেজস্বী ভক্ত হৃদয়ের অনৈসর্গিক মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে। আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা, অন্তর্নিহিত বাসনার আবেগই প্রকৃতপক্ষে ফলদায়ক।

এই বিশ্বাসের সত্যতা অনেক অকাট্য দৈব ঘটনাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহার মধ্যে হয়ত নিম্নলিখিত ঘটনাটি সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য।

(১)

শতবর্ষীয় সিডার ও প্লেনবৃক্ষসঙ্কুল একটি বনপ্রান্তে তিনটি অসমবিস্তৃত সরোবর পরস্পরের জলে জল মিশাইতেছে; তাহাদের উপরিভাগস্থিত কমল-পুষ্পাবরণে সে ধীর স্রোত লক্ষিত হয় না।

প্রথম সরোবরটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং তীরস্থ তরুর শাখায় প্রায় সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত; তাহার ভিতরে প্রচ্ছন্ন একটি উৎস এই তিনটি জলাশয়কে পরিপোষণ করিতেছে। সরোবরগুলির তীরে মন্দির, পাগোডা ও দীর্ঘ সৌধশ্রেণী বিরাজমান।

ইহাই বিখ্যাত কমল-কুমারিকাশ্রম; কেবলমাত্র চীনদেশে

বিখ্যাত নহে—জাপানে, কোরিয়া রাজ্যে, আসিয়ার সীমান্তে যে কোন প্রদেশে বুদ্ধের জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছে, সর্ব্বস্থানেই ইহা প্রসিদ্ধ। দুই শত বৎসর হইল একদল কুমারী এখানে একটি সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন, সেই অবধি কত সহস্র রমণী ইহার ভাবমাহাত্মো আকৃষ্ট, সংসারক্লেশে তাপিত বা পাপে অনু-তপ্ত হইয়া এই স্থানে আসিয়া পরম ধন, অর্থাৎ বিস্মৃতি, লাভ করিয়াছিল, বিশ্বসংসার মায়া জানিয়া সান্ত্বনা পাইয়াছিল, এবং ইন্দ্রিয় মনের সেই লয়সাধন করিয়াছিল যাহা চরম নির্ব্বাণের প্রথম সোপান।

বহুকাল পূর্ব্বে একটি অলৌকিক ঘটনাদ্বারা এই সরোবর-শোভিত স্থানটি কোন মহৎ ধর্ম্মাশ্রমের প্রতিষ্ঠাভূমিস্বরূপ স্পষ্টতই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। একদা নির্ম্মল নিদাঘ-নিশীথে, চন্দ্রের উজ্জ্বল আলোকে যখন তারাগুলি অদৃশ্যপ্রায়, তখন আকাশ হইতে সরোবরের স্থির জলে কমল-বীজ বর্ষিত হইয়াছিল। পরদিবস প্রত্যূষে, সরোবর-বক্ষে শ্যামল পদ্মপত্রজাল বিস্তীর্ণ হইল। ক্রমে ক্রমে পত্রগুলি পরিণত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সমুদায় জলাশয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তৎপরে সন্ধ্যাগমে, যে মুহূর্ত্তে সূর্য্য আকাশ-সীমান্তে অস্ত গেল, সমস্ত পুষ্প একত্রে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, এবং তাহাদের আরক্ত দলগুলির সুকুমার সুগন্ধ আরতি-ধূপের ন্যায় আকাশ অভিমুখে উত্থান করিল।

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সরোবরটির পূর্ব্ব তীরে একটি প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর এবং সম্মুখে একটি দীর্ঘ মর্ম্মরপ্রস্তরমণ্ডিত প্রাঙ্গণ, তাহাতে তাম্রকলসমধ্যে উৎস উঠিতেছে। প্রাঙ্গণের দ্বারদেশ হইতে কেবলমাত্র মন্দিরের ছাদ দৃষ্ট হয়—নীল-ইষ্টকমণ্ডিত ভীষণাকার স্বর্ণজন্তুভূষিত, মধ্যস্থলে

নিম্ন এবং চতুষ্পার্শ্বে উচ্চ, যেন একটা বৃহৎ শিবির। ওই ছাদ ভূমির এত নিকট পর্য্যন্ত নামিয়াছে এবং এতদূর ছায়া বিস্তার করিয়াছে যে, মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ সিডারস্তম্ভ ও প্রবেশ-দ্বার প্রথমে চক্ষুগোচর হয় না। কিন্তু নিকটে আসিয়া মন্দি-রের মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত ভিত্তিতলে দাঁড়াইলে মুক্ত বাতায়ন দিয়া সমুদায় অভ্যন্তরদেশ এক দৃষ্টিক্ষেপেই লক্ষিত হয়। মন্দির শত শত দেবতা ও উপদেবতার প্রতিমায় পূর্ণ; তাহা দেখিয়া মনশ্চক্ষের সমক্ষে সেই লোকান্তর-দৃশ্য উদয় হয়, যেখানে দেহমুক্ত আত্মা গমন করে, যেখানে জন্মবন্ধনহীন দীপ্যমান প্রাণীসকল বিচরণ করে।

দেবালয়ের রহস্যময় সুদূর অন্তর্দ্দেশে ধূপপাত্র হইতে নিয়তই যে নীলাভ ধূম উত্থিত হইতেছে তাহার অপর প্রান্তে বুদ্ধদেবের বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি কমলাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। অন্য সকল দেবতার উপর তিনি আধিপত্য বিস্তার করিয়া স্বীয় আত্মাদ্বারা এই পবিত্র নিকেতন পূর্ণ করিতেছেন।

দ্বিতীয় সরোবরটির নিকট অপেক্ষাকৃত সামান্য গৃহসকল সমবেত; ইহা কুমারীগণের বাসস্থান, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ দীর্ঘ বারান্দার তলে শ্রেণীবদ্ধ; ইহার পরে ঘণ্টার ঘর এবং পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন ও বহুমূল্য দ্রব্যাদির ভাণ্ডার।

অবশেষে ক্ষুদ্রতম সরোবরটির ধারে কেবল একটিমাত্র সামান্য পাগোডা কামেলিয়া আজালিয়া প্রভৃতি পুষ্পকুঞ্জমধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

এই ছোট মন্দিরটি কানন দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। তিনি "করুণার অধিষ্ঠাত্রী জ্যোতির্ম্ময় আকাশের মহীয়সী রাজ্ঞী; শুভ্র-

বসনা মহাদেবী, চিরপাবনা, চিরমধুরা চিরকরুণাময়ী।” কেবল তাঁহারই প্রতিরূপ এখানে বিরাজ করিতেছে; প্রাচীরে লম্বমান একটি রেশমী কাপড়ের উপর তিনি চিত্রিত রহিয়াছেন। পরিধানে দীর্ঘ শুভ্র বেশ, হস্তে একটি পদ্মপুষ্প, মস্তকের চতুর্দ্দিকে কনকচ্ছটা; যেরূপ মূর্ত্তি ধরিয়া বহুকালপূর্ব্বে তিনি পূর্ব্বসাগরের নীল তরঙ্গরাশির উপর দিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং মানবের দুঃখ-দৈন্য লাঘব করিবার নিমিত্ত তাঁহার মনের সৌন্দর্য্য, তাঁহার বচনের মাধুর্য্য ও তাঁহার হৃদয়ের অপরিমিত মমতা আনিয়া দিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি।

দেবীর পদতলে ভূমির উপর একটি উইলো-শাখা জলে নিমগ্ন রহিয়াছে; শুষ্ক তৃষিত চিত্তকে কানন দেবী, যে পবিত্র বারিবিন্দু-সিঞ্চনে তৃপ্ত করেন এই আর্দ্র শাখা তাহারই সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বেদীর উপর প্রজ্জলিত দুটি লাল মোমের বাতি দেবালয়ের মধ্যে একপ্রকার ম্লান আলোক, এক কোমল দীপ্তি বিস্তার করিতেছিল, পুষ্পপাত্রপূর্ণ ম্যাগ্‌নোলিয়া-কুসুমের সুগন্ধ চিররক্ষিত ধূপের সৌরভের সহিত মিশিতেছিল। এই মন্দির এবং ইহার চতুর্দ্দিকস্থ কামেলিয়াকুঞ্জ যেন আশ্রমের মধ্যেও একটি নিভৃত নিলয় রচনা করিয়াছিল, এই স্থানটী এমনি শান্তিময়, নিস্তব্ধ, রহস্য-পরিবৃত ও ধ্যানানুকূল।

অপরাহ্নে এই পাগোডা যে ক্ষুদ্র সরোবরে আপন ছায়া ভাসাইত, সেটির মধ্যেও একটি পুণ্য প্রভাব ছিল। কুমারিকাশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রীগণ এটিকে একটি পবিত্র মৎস্য-সরোবর করিয়া তুলিয়াছিলেন, কারণ, বুদ্ধদেব ইহারই জলে কমলবীজ নিক্ষেপ করিয়া অবশ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তাঁহার এই অতি প্রিয় উপদেশটি এই স্থানেই বিশেষরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে—“প্রাণ-

বিশিষ্ট সকল সৃষ্টবস্তুর নিমিত্ত যেন তোমার চোখে একটু জল এবং মুখে একটু হাসি থাকে; জলস্থলবাসী তুচ্ছতম জীবকেও কখনও একটু ভালবাসা দিতে ত্রুটি করিও না।" সেইজন্য সর্ব্বপ্রকার জলজন্তু, মৎস্য, কচ্ছপ, জলসর্প প্রভৃতি এই আশ্রমবাসীকর্ত্তৃক সযত্নে সরোবরে রক্ষিত হইত, প্রতি সন্ধ্যায় তাহারা ইহাদের খাদ্যদান করিত ও বৎসরে তিনবার করিয়া একদল বৌদ্ধ পুরোহিত সমারোহসহকারে আসিয়া তাহাদিগকে জলদেবী চন্দ্রের মূর্ত্তি-অঙ্কিত চালের রুটি খাওয়াইত।

(২)

একদিন বসন্তের সন্ধ্যাকালে একটি যুবতী আসিয়া আশ্রমকর্ত্রীর দর্শন প্রার্থনা করিল; এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবার প্রাবেশিক প্রতিজ্ঞাগ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিল এবং বিনা পরীক্ষায় কুমারীগণের নীললোহিত ও শুভ্রবসন পরিতে চাহিল। তাহার নাম লাইট্‌সি এবং সে তাহার অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। অনেক দুঃখকষ্টের পীড়নে সে এই অল্পবয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া আশ্রমে আসিয়াছে। তাহার পিতা অতুল সম্পদশিখর হইতে সহসা বিচ্যুত হইয়া মস্তকদানে ঐশ্বর্য্যদম্ভের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন; পিতার অপরাধ-স্বীকারে অসম্মত হওয়ায় তাহার দুই ভ্রাতার প্রাণদণ্ড হইয়াছে; শোকে জর্জ্জরিত হইয়া তাহার মাতা মরিয়াছেন, এবং যে তাহার বাগ্দত্ত প্রণয়ী সেও জন্মের মত মাঞ্চুরিয়ার মরুময় সীমান্তপ্রদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

এক্ষণে সহায়হীন, স্বজনহীন, প্রেমহীন সংসারের সহিত সকলপ্রকার বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া এই অনাথিনী দুঃখদৈন্যপূর্ণ পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক কমল-কুমারিকাশ্রমে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে।

প্রথম প্রথম সবই তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিল। এত উৎ-কণ্ঠা, এত শোচনীয় দুর্ঘটনা, আতঙ্ক ও অশ্রুজলের পর অবশেষে সে বিশ্রাম লাভ করিল।

তাহার বাসস্থানের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সরোবরের প্রশান্ত দৃশ্য এবং অরণ্যের সুগম্ভীর মহান্ ভাব লাইটুসির চিত্তকে ক্রমশঃ সুস্থির করিল; আশ্রমের সর্ব্বত্র-বিরাজমান যে নীরবতা কেবলমাত্র প্রার্থনার গুঞ্জনধ্বনিতে ভঙ্গ হইত, তাহাতে সে আপ-নার মর্ম্মস্থলমধ্যে মুমূর্ষু জীবনের চেতনা-শ্বাস শুনিতে পাইত; প্রতিদিন একই সময়ে একই কাজ করিতে করিতে তাহার মনের গতি ও হৃৎস্পন্দন সুনিয়মিত হইয়া আসিল; এবং যে সকল আরাধ্য বস্তুদ্বারা সে বেষ্টিত থাকিত, সেগুলির অন্তর্নিহিত ভাব তাহার মনের সহিত মিশিয়া স্বীয় শান্তিতে তাহাকে পূর্ণ করিল।

দিনের মধ্যে দুইবার বড় মন্দিরে বৌদ্ধ উপাসনা সম্পন্ন হইত। কুমারীগণ নিঃশব্দে, দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, পার্শ্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিত, ধূপধূমাচ্ছন্ন দেবীর সম্মুখে নয়টি বিভাগে তাহারা আসন গ্রহণ করিত এবং আশ্রমকর্ত্রীর একটি ইঙ্গিতে অনুষ্ঠান আরম্ভ হইত। সমস্বরে, অতি মৃদুকণ্ঠে সকলে ধর্ম্মমন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিত; "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ—পদ্মমধ্যস্থিত পরম রত্ন, তোমাকে নমস্কার।" এই সকল কণ্ঠের একত্র উত্থানপতনে একটি বৃহৎ পক্ষীর পক্ষ-আস্ফালনের ন্যায় শব্দ হইত।

উপাসনাদ্বয়ের অবকাশকালে লাইটুসি বৌদ্ধধর্ম্মের মত সম্বন্ধে উপদেশ পাইত। সে শিখিল যে, জীবমাত্রকেই মরিতে হইবে এবং জীবন কেবল মৃত্যুর পূর্ব্বাভাস; মৃতেরা যোগ্যতা অনুসারে নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়; দুরাচারী ও পাপাত্মারা নরকযন্ত্রণা ভোগ করে; পৃথিবীর অধিকাংশ সাধারণ মনুষ্য,

যাহারা কোন বিশেষ পাপ বা পুণ্য করে নাই, যাহাদের জীবন সমান নিস্তেজভাবে কাটিয়া গিয়াছে, তাহারা পুনর্ব্বার অন্যান্য দেহ ধারণ করিয়া সংসারভার বহন করে; দুঃখভোগ ও ধ্যান-দ্বারা যাহাদের কলুষনাশ হইয়াছে, তাহারা পুনর্জ্জন্মের কঠোর দণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইয়া দ্যুলোকের জ্যোতির্মণ্ডলে গিয়া বাস করে; এবং যাহারা পুণ্যাত্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কাম, যোগবলে আত্মার চরম উৎকর্ষে উপনীত, তাহারাই কেবল নির্ব্বাণলাভ করে ও চিরনির্ব্বাপিত দীপশিখাবৎ অনন্তের ক্রোড়ে লীন হইয়া যায়। সে আরও শুনিল যে, দানশীলতা ও পবিত্রতা সর্ব্বগুণমধ্যে শ্রেষ্ঠ; ধর্ম্মোচ্ছ্বাসের তিন ক্রমবিভাগ, চারি মহান সত্য, অস্তিত্বের পঞ্চ পথ, পরম জ্ঞানের ষষ্ঠ প্রকার, সপ্ত পুণ্য বস্তু এবং মুক্ত আত্মার ক্রমান্বয় অষ্ট অবস্থা, এই সকলের বিভিন্নতা তাহাকে বুঝানো হইল; অবশেষে তাহাকে বলা হইল যে, যাহার সংখ্যা নাই তাহা অপেক্ষাও বুদ্ধে আধ্যাত্মিক গুণ অসংখ্য। এই সকল বিশ্বাস, সঙ্কেত ও গূঢ়মন্ত্র আয়ত্ত করিতে লাইট্সির অপরিণত বুদ্ধি যতই অক্ষম হইত সেই পরিমাণে সেগুলি প্রবলভাবে তাহার কল্পনাশক্তিকে উত্তেজিত করিত।

আবার প্রতিদিন যখন সূর্য্য বনের পশ্চাতে নামিয়া যাইত, সেই সময়ে, আশ্রমের সর্ব্বপ্রধান গৃহে, কুমারীগণ একত্রে দীর্ঘকাল ধ্যানে নিরত হইত। ভূমিতলস্থ আসনোপরি ভক্তিভরে উপবিষ্ট হইয়া তাহারা একাগ্রচিত্তে "সত্যধর্ম্ম-কমল"-এর কোন শ্লোকের প্রতি মনোনিবেশ করিত, যথা—"মানবের সকল অবস্থাই মরীচিকাবৎ, স্বপ্নবৎ, জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ববৎ;" অথবা—"পদ্মপত্রের প্রতি জলবিন্দু যে পরিমাণে আকৃষ্ট, তুমি বিষয়ে ততো-

ধিক মাত্রায় আসক্ত হইও না, কারণ, বাসনা, সুখ, ধন, সংসার সকলই মিথ্যা।”

এই গৃহের প্রাচীর আলেখ্য-ভূষিত স্বর্ণমণ্ডিত লাক্ষাদ্বারা আবৃত; তাহার উপর এই ধ্যাননিমগ্না রমণীগণ তাহাদের অনির্দ্দিষ্ট দৃষ্টি প্রেরণ করিত এবং তাহাদের মানসিক কল্পনা বাহিরে মূর্ত্তিমান দেখিতে পাইত। এই লাক্ষাপটের উপর বুদ্ধের মহৎ জীবনের ঘটনাসমূহ চিত্রিত রহিয়াছে। লুম্বিনীর পুষ্পোদ্যানে তাঁহার জন্ম, উরুবিম্বের মায়াকাননে তাঁহার দীর্ঘ নির্জ্জনবাস, বোধিমন্দের দাড়িম্ববৃক্ষতলে তাঁহার বুদ্ধ অবস্থার সম্পূর্ণতালাভ—তাঁহার অসংখ্য অলৌকিক ক্রিয়া, অবশেষে কুশিনগরে তাঁহার মৃত্যু, এবং দেবতা ও ভক্তগণসমক্ষে চন্দনকাষ্ঠের চিতায় তাঁহার শবদাহ। অন্যান্য চিত্রও ছিল, যথা, সেই দ্যুতিমান স্বর্গলোক, যেখানে জীবন-দুঃস্বপ্নোত্থিত মহাত্মারা গমন করেন,—অথবা অমিত-বুদ্ধের অপরূপ রাজ্য, যেখানে প্রকৃতি সুবর্ণ, রজত, প্রবাল, মণিমুক্তা ও চিরনবীন কুসুমে বিভূষিত এবং যেস্থানের প্রাণী ও পদার্থসকল সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ও জ্যোতির্ম্ময়। ধূপধূমের মধ্য দিয়া দেখিলে মনে হইত যেন লাক্ষার স্বর্ণময় ভিত্তির উপর একপ্রকার রৌদ্রবর্ণ বাষ্প উঠিতেছে, তাহাতে করিয়া ভিত্তিলিখিত পুণ্য কমনীয় চিত্রাবলী অধিকতর রহস্যপূর্ণ ও অশরীরী হইয়া উঠিত।

অনেকক্ষণ ধরিয়া এই ধ্যানসভা চলিত। কোনরূপ শব্দ সেই সমাধির ব্যাঘাত করিত না। কেবল সময়ে সময়ে হয়ত একটি শ্বাস বহিয়া যাইত, কিন্তু এত মৃদু যে বুঝা যায় না তাহা এই রমণীগণের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস কি তাহাদের অন্তরের নিঃস্বন বা মনের শূন্যে বিহারধ্বনি। এইরূপে যে সময় কাটিত তাহা

লাইট্সির পক্ষে অনির্ব্বচনীয় সুখকর হইত। সে এমন সুগভীর শান্তি উপভোগ করিত যে তাহার মনে হইত যেন কোন দৈব-সূত্রে সে সেই সমুজ্জল শান্তিলোকের দ্বারে উপনীত হইয়াছে, যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ হইয়া বিশ্রাম লাভ করে।

সন্ধ্যা হইলে পর, লাইট্সি একাকী তাহার ক্ষুদ্র কক্ষে ফিরিয়া আসিত, এবং, যে মহারাত্রি তাহার অন্ধকার অঞ্চলে এই শতবর্ষীয় অরণ্যকে ঢাকিয়া রাখে, নিদ্রা বিসর্জ্জন করিয়া মুক্ত বাতায়ন-পথে সেই রাত্রির শোভা নিরীক্ষণ করিত। নির্ম্মল শীতল বায়ু তাহার মুখে স্নেহহস্ত বুলাইত ও তাহার সর্ব্বশরীরে যেন একটা জীবনের হিল্লোল আসিয়া লাগিত; ঘুমন্ত বিশাল অরণ্যের আর্দ্র গন্ধ তাহাকে মধুর বিহ্বলতায় আপ্লুত করিত; কোন কোন নিশাচর পক্ষীর সকরুণ গান তাহার বিচলিত হৃদয়ে প্রতিধ্বনি জাগাইত; কতই মোহন সূক্ষ্ম দৃশ্য, সৌরভ, অস্ফুট রব ও প্রতিমূর্ত্তি তাহার মনে উদয় হইয়া এক নূতন জগৎ সৃজন করিত। এই হৃদয়ই অনতিপূর্ব্বে শোকে মগ্ন ও বিপদের খরতাপে যেন বিশুষ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ইহা-রই মধ্যে নূতন প্রাণ পাইয়া পুনঃ প্রস্ফুটনোন্মুখ হইয়াছে।

এই শান্তি কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হইল না। ইহা কেবল একপ্রকার ক্ষণিক বিরাম, যেন এই দুর্ভাগিনী ভাল করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে পারিবে বলিয়াই বল সঞ্চয় করিয়াছিল। কুমা-রিকাশ্রমে প্রবেশ অবধি লাইট্সির মন যে সুখনিদ্রায় নিমগ্ন ছিল, একদিন সহসা অকারণে তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার জীবনের কষ্ট, তাহার ব্যর্থ যৌবন, তাহার আশাহত ভবিষ্যৎ, [illegible] একটি [illegible] চিত্রে তাহার মানসপটে আবির্ভূত হইল এবং [illegible] [illegible]লিল।

কিন্তু তাহার দুঃখের মধ্যে একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল; তাহার অতীত জীবনের এক অংশ অতি সুদূরে অপসৃত, বিস্মৃতি ও ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল; সন্ধ্যাকালে আশ্রমের সরোবর হইতে যে হেমন্ত কুহেলিকা উঠিত, তাহারই ন্যায় সেটা অনির্দ্দিষ্ট ও ভাসমান বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার দুঃখস্মৃতি যে লোপ পাইতেছিল, তাহার হৃদয়ে যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাহার মধ্যে একটি স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে জাজ্বল্যমান রহিয়া গেল—যে প্রথম প্রেমপাশে সে আবদ্ধ হইয়াছিল, যে প্রেম তাহার জীবন-প্রভাতে এমন মধুরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু যাহাতে আর কিছুতেই প্রাণের সঞ্চার হইবে না—সেই প্রেমের স্মৃতি। এইরূপে, লাইট্‌সির মনোবেদনা পূর্ব্বের ন্যায় তাহার দুঃখের সকল কারণগুলির উপর প্রসারিত ও বিস্তৃত না হইয়া, এখন একটিমাত্র বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইল, সুতরা তাহার নিকট অধিকতর তীব্র ও অসহ্য বোধ হইল।

তাহার পূর্ব্বাবস্থার সংযত বিষাদ ও তাহার প্রথম উপাসনা ভক্তিপূর্ণ সহিষ্ণুতার পরিবর্ত্তে এখন হইতে এক ব্যাকুল আবে তাহার মনকে অধিকার করিল; বহুদিনের রুদ্ধ উচ্ছ্বাসকে মু করিয়া সে সারাদিন তাহার প্রণয়ীর কথা ভাবিত, প্রতিরা তাহার স্বপ্ন দেখিত।

যে ধর্ম্মকর্ম্মে সে সমস্ত দিন ব্যাপৃত থাকিত, যে আধ্যাত্মি তত্ত্বসম্বন্ধে সে উপদেশ পাইত, যে দৈবচিহ্নসকল তাহা চতুষ্পার্শ্বে বিরাজ করিত, সে সমস্ত এখন তাহাকে সান্ত্বনা দেওয় দূরে থাক, কেবল তাহার আন্তরিক দুঃখ স্পষ্টতর হৃদয়ঙ্গম করা ইয়া আরও কষ্ট বাড়াইত। বৌদ্ধ উপাসনায় তাহার মনে নির্ব্বা ণের যে পরম সুখ ও শা

এমন মুগ্ধ করিয়াছিল, এখন সেই ভাবেই তাহাকে নৈরাশ্যে পূর্ণ করিত, কারণ, সে সুখ বহুদূরবর্ত্তী, অতীব দুর্লভ বলিয়া বোধ হইত, অথচ তাহার দুঃখ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান ও প্রতিদিন হৃদয়ের গভীরতর স্তরভেদী। এমন কি, ধর্ম্মে যে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ আনন্দের কথা বলিত, তাহা মনে করিয়া লাইট্সির ভয় হইত, কারণ, তাহা লাভ করিবার পূর্ব্বে সমস্ত বাসনা, সমস্ত হৃদয়বৃত্তি ও সমস্ত স্মৃতি বিসর্জ্জন দিতে হয়। একমাত্র সুখ তাহার বাঞ্ছনীয় মনে হইত—সজ্ঞানে তাহার প্রিয়তমের পুনর্দর্শনলাভ; মুহূর্ত্তেকের জন্যেও একবার তাহাকে দেখা; তাহার সহিত একটি অন্তিম চুম্বনের আদানপ্রদান, ও মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তাহাদের দুই হৃদয়ের সংমিশ্রণ।

সন্ধ্যাকালে আশ্রমের বৃহৎ গৃহে যখন একত্র ধ্যান হইত, সেই সময়েই এই কথা লাইট্সির মনে বেশী জাগিত। সে তাহার সহচরীদের নিকট আনত দেহে উপবিষ্ট থাকিত, তাহাদেরই ন্যায় মৌন, তাহাদেরই ন্যায় স্থির, কিন্তু মনের ভাবে তাহাদের সহিত এত পৃথক যে, সে যেন আর এক পৃথিবীর অধিবাসিনী; তাহাদের মন যেমন স্থির এবং সমাহিত, লাইট্সির অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় তেমনি অস্থির চঞ্চল।

তখন তাহার মানসী মূর্ত্তি সাকাররূপে তাহার নয়ন-পথে উদিত হইত; ধূপধূমের ওপারে, লাক্ষার স্বর্ণভিত্তির উপরে সে তাহার প্রণয়ীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইত। অমনি তাহার আপাদমস্তক শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, এবং কম্পিত-হৃদয়ে সে তাহার প্রিয়তমের দর্শনসুখসম্ভোগ করিত।

কিন্তু তাহার মনের একনিষ্ঠতা, শরীরের দীর্ঘকালস্থায়ী নিশ্চলতা, এবং গৃহস্থিত ধূপবাষ্পের গাঢ় গন্ধ, সমস্ত মিলিয়া

অবশেষে তাহাকে অচেতনপ্রায় করিয়া ফেলিত। তাহার কর্ণকুহর শব্দিত হইতে থাকিত, অঙ্গ অসাড় হইয়া আসিত ও একপ্রকার অপূর্ব্ব নির্জ্জীবতাক্রান্ত হইয়া সে অন্তরবাহির-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংজ্ঞারহিত হইয়া পড়িত।

পরদিবস হইতে অন্যান্য গুরুতর উপসর্গ আরম্ভ হইত। প্রিয় মূর্ত্তি দেখিবামাত্র লাইট্‌সির অন্তঃকরণ প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া যেন বিহঙ্গের ন্যায় সেই দিকে প্রধাবিত হইত; কিন্তু অকস্মাৎ সে হৃদয়ে একরূপ বেদনা অনুভব করিত, এমনি তীক্ষ্ণ ও মর্ম্মভেদী যে, মনে হইত যেন তাহার প্রাণের ভিতরকার কোনও গোপন স্নায়ু ছিন্ন হইয়াছে; তখন তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইত, তাহার চক্ষু অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া আসিত, এবং হিমদেহ ও জ্ঞানশূন্য হইয়া সে ভূতলে পড়িত। মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে পরও একপ্রকার গভীর মোহে সে আচ্ছন্ন থাকিত, তাহা ক্রমে ধীরে ধীরে অবসাদে মিলাইয়া যাইত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা লাইট্‌সির এই অচৈতন্য অবস্থা প্রায় একঘণ্টাকাল স্থায়ী হইল। কিছু দিন পরে সেই একই লক্ষণ আবার প্রকাশ পাইল এবং উত্তরোত্তর দীর্ঘকালস্থায়ী ও ঘন ঘন হইতে লাগিল। এই উপসর্গ শীঘ্রই প্রাত্যহিক হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কুমারী সঙ্গিনীদের মনে করুণার উদ্রেক হইল, তাহারা এই ঘন ঘন মূর্চ্ছা অস্বাস্থ্যনিবন্ধন মনে করিল। লাইট্‌সির আকার শোচনীয় হইয়াছিল; সে প্রায় উপবাসী থাকিত; তাহার মুখ মৃতবৎ বিবর্ণ ও শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; তাহার কালিমা-বেষ্টিত নয়নের দৃষ্টি যেন অতি দূর দূরান্তরে স্থাপিত এবং অসাধারণ বিষাদভাবাপন্ন, এমন কি তাহার কণ্ঠস্বরও যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া অধিকতর মৃদু এবং আশ্চর্য্য

শ্রুতিমধুর গাম্ভীর্য্যযুক্ত হইয়া আসিল। তাহার লম্বা শাদা ঢিলা বসন পরিয়া তাহাকে চলিতে দেখিলে মনে হইত যেন প্রেত-মূর্ত্তি, যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের প্রাণী স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যস্থলে দোদুল্যমান রহিয়াছে।

বস্তুতঃ লাইট্‌সি সর্ব্বদা স্বপ্নেই বাস করিত, সেই নিমিত্তই তাহার সন্ধ্যাকালীন মূর্চ্ছাভঙ্গে এত বিলম্ব হইত। সর্ব্বত্রই সে তাহার প্রবাসী প্রণয়ীকে দেখিতে পাইত, সকল স্থানেই তাহার অলক্ষিত অস্তিত্ব অনুভব করিত। তাহার সহিত মৌন সম্ভাষণে লাইট্‌সি মোহিত হইত এবং প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া থাকিত।

তাহার সমস্ত জীবন স্বপ্নেই কাটিত; এমন কি সে যখন ক্ষণ-কালের জন্য সত্যজগতে ফিরিয়া আসিত তখন তাহার শরীর মন অবসন্ন বোধ হইত, কোন বিষয়ই তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত না, চিন্তা বা দুঃখ বা অনুভব করিবার শক্তি আর তাহার থাকিত না; এরূপ অবস্থা তাহার স্বপ্নের ব্যাঘাত মাত্র; তাহার জাগরণ কেবল বাহ্যিক, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সজ্ঞান অবস্থা স্বপ্নহীন সুষুপ্তির তুল্য।

(৩)

ইতিমধ্যে হেমন্তকালের আগমনে বৃক্ষপল্লব গাঢ়বর্ণ ধারণ করিল, সকাল সন্ধ্যায় সরোবরের উপর হইতে বাষ্প উত্থিত হইল, ম্লান আকাশে ঘনঘোর মেঘমালা ভাসিয়া যাইতে লাগিল; ধরণী বিষাদজালে আবৃত হইল।

হেমন্তের সঙ্গে সঙ্গে মৃতদের সাম্বৎসরিক উৎসবকাল আগত হইল।

সন্ধ্যার প্রারম্ভ হইতে ফল, ফুল, উপহার ও বিবিধ খাদ্যদ্রব্য-সজ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেবিল আশ্রমের সর্ব্বত্র স্থাপিত হইল—মন্দির ও

পাগোডার প্রবেশ-পথে, উদ্যানে, সরোবরতটে ; কারণ, রজনীর প্রথম প্রহরে মৃতদের নিগূঢ় নিবাসের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, এবং জীবিতদের প্রেম ও স্মৃতি-তৃষ্ণার্ত্ত মৃতাত্মারা প্রবলবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসে।

চীনরাজ্যে ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সকল প্রদেশেই এই উৎসবটি অবশ্যকর্ত্তব্য এবং বৎসরের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এমন সামান্য পাগোডা ছিল না যেখানে ইহা সমারোহসহকারে সম্পাদিত না হইত; এমন দরিদ্র পরিবার ছিল না যাহারা গৃহস্থ বেদীর উপরে মোমবাতি, আহার্য্য সামগ্রী ও পুণ্য গন্ধদ্রব্য না রাখিত।

কমল-কুমারিকাশ্রমে এই উৎসব উপলক্ষে বৃহৎ অনুষ্ঠান ও মহা সমারোহ হইত। এই সম্প্রদায়ের পূজ্যতম স্মৃতিচিহ্ন, পরমারাধ্য দেবপ্রতিমা, সর্ব্বাধিক মূল্যবান পূজার উপকরণ, ধর্ম্মসংক্রান্ত শিল্পবিদ্যার যে কিছু ঐশ্বর্য্য ভক্তবৃন্দ ও সম্রাটদিগের দানশীলতায় বহু শতাব্দী ধরিয়া রাশাকৃত হইতেছিল—সে সমস্ত হস্তে লইয়া একদল লোক শ্রেণীবদ্ধভাবে ভক্তিভরে পাগোডা ও সরোবর প্রদক্ষিণ করিত, তাহা দেখিবার নিমিত্ত বিস্তর লোকসমাগম হইত। নিকটবর্ত্তী নগর ও পঞ্চাশতাধিক ক্রোশ দূর হইতে এখানে লোক আসিত। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মন্দিরে অবিচ্ছিন্ন উপাসনা চলিত, সকলেই তাহাতে যোগদান করিতে পারিত।

কিন্তু কানন দেবীর মন্দিরে কেবলমাত্র কুমারীগণের প্রবেশাধিকার ছিল। এই দিবস তাঁহাকে সবিশেষ আন্তরিক ভক্তির সহিত পূজা করা হইত, কারণ তাঁহারই অনুকম্পায়, রসাতল দেবতার নিকট তাঁহারই করুণাময় অনুরোধবশতঃ মৃতাত্মারা

অনুগ্রহস্বরূপ, বৎসরে একবার পাতালরাজ্য ত্যাগপূর্ব্বক অদৃশ্য ও মৌনভাবে মর্ত্ত্যের আলোকে আসিতে পারে।

এই সকল অনুষ্ঠান লাইট্‌সির পক্ষে হিতকর হইলেও তাহার হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ করিয়া দিল; বর্ত্তমান স্বপ্নের পরিবর্ত্তে অতীতের শোকাতুর মূর্ত্তি চিত্তপটে দেখা দিল; একে একে তাহার স্মৃতি সকল জাগিয়া লাইট্‌সির মনে বিষাদমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক করিল ও তাহার ভারাক্রান্ত হৃদয় হইতে অশ্রুজল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

লাইট্‌সি তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নিমিত্ত যে বেদী রচনা করিয়াছিল, তাহার সম্মুখে তিন ঘণ্টা প্রণত রহিল। একে একে তাহাদের নিকট সব নিবেদন করিল—পূজার খাদ্যদ্রব্যের উপাদেয় গন্ধ, হেমন্তের ফলের সৌরভ, চায়ের মৃদু পরিমল, ধান্যমদিরার বাষ্প, তাম্রকলসপূর্ণ ম্যাগনোলিয়া-কুসুমসুবাস, অবশেষে ধূপপাত্রে প্রজ্বলিত সোনালি ও রূপালি কাগজের ধূম্র। সর্ব্বান্তঃকরণে সে পরম বুদ্ধদেব ও করুণাময়ী কানন দেবীর পূজা করিল; তাহার পূজনীয় পিতৃপুরুষদিগের জন্য প্রার্থনা করিল; তাহার পিতা ও ভ্রাতাদের অন্যায় বিচারে প্রাণনাশ হওয়া প্রযুক্ত তাহাদের সমাধি সম্পন্ন হয় নাই, তাহার মাতারও নিতান্ত হীনভাবে গোপন সৎকারকার্য্য হইয়াছিল, ইহাদের সকলের জন্যই লাইট্‌সি দেবতাকে ডাকিল। তাহার ব্যাকুলতার সহিত একপ্রকার অনির্দ্দিষ্ট অনুতাপের ভাব মিশ্রিত হইল, কারণ সে বুঝিতে পারিল যে এই যে ভক্তিপূর্ণ স্মৃতি এখন তাহার হৃদয় পূর্ণ করিতেছে, ইহা অতি অল্পদিনেই তাহার মন হইতে বিলুপ্ত হইয়া একটিমাত্র স্মৃতিকে স্থান দান করিয়াছিল।

কানন দেবীর পাগোডার নিকট, আজালিয়া ও কামেলিয়া-কুঞ্জের মধ্যে একটি বিশেষ বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে মৃতাত্মারা সমাধি লাভ করে নাই, যাহাদের বংশরক্ষা হয় নাই, বা যাহারা অধম সন্তানগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, যে হতভাগ্যেরা কখনো বিশ্রাম পাইবে না, যাহারা শান্তিহীন ও আশাহীন হইয়া অদৃশ্য জগতে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদেরই উদ্দেশে এই বেদী রচিত। যে দিবস অন্যান্য মৃতদের পক্ষে এমন সুখজনক, সেই একমাত্র দিনে, কমল-কুমারিকাশ্রমের পুণ্য-ফলে, তাহারা আশ্রয় পাইত।

লাইট্‌সির প্রণয়ীর আত্মা হয়ত এই দুর্ভাগ্যদলভুক্ত, হয়ত তাহার সেখানে মৃত্যু হইয়াছে, একাকী, পরিত্যক্ত—নির্ব্বাসন-ভূমিতে হয়ত তাহার দেহ সংকারসম্মানবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—এই কথা লাইট্‌সির মনে অকস্মাৎ উদয় হওয়াতে সে এমন প্রবল আবেগাক্রান্ত হইল যে অবশ ও মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। নিজ কক্ষে তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হইলে পর লাইট্‌সির যখন জ্ঞান হইল, তখন আপনাকে এমনি দুর্ব্বল, সংসার হইতে এমনি বিচ্ছিন্ন বোধ হইতে লাগিল, যে, সে ভাবিল বুঝি মৃত্যু আগতপ্রায়।

সন্ধ্যার দিকে তাহার অত্যন্ত জ্বর হইল। তাহার ইন্দ্রিয়সকল একে একে সচেতন হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ শক্তি ধারণ করিল। বাতায়ন দিয়া তাহার দৃষ্টি আকাশের অপরিমেয় দূরত্ব ভেদ করিল, কোটি কোটি তারকা তাহার নিকট স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল, তাহার গৃহ যে চন্দ্রকিরণে প্লাবিত হইতেছিল তাহার অত্যুজ্জ্বলতা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল; এবং এই গভীর রাত্রে কুমারিকাশ্রম যে নিস্তব্ধতায় নিমগ্ন ছিল, তাহার মধ্যেও লাইট্‌সির

বিস্মিত শ্রবণপথে অসংখ্য ক্ষীণতম শব্দ প্রবেশ করিল, যাহার কারণ বা দিক সে নিরূপণ করিতে পারিল না।

সহসা লাইট্সি বাহিরে অনতিদূরে একটি বাষ্পময় মনুষ্যাকার দেখিতে পাইল, একটি প্রেতমূর্ত্তি তরঙ্গায়িত অনায়াস-গতিতে তাহার দিকে আসিতেছিল, যেন চন্দ্ররশ্মির উপর দিয়া পিছলিয়া চলিতেছে; তাহার অঙ্গুলীমধ্যে স্বর্ণকমলপুষ্প জাজ্বল্যমান।

লাইট্সির নিকটবর্ত্তী হইলে পর সে কথা কহিল; তাহার কণ্ঠস্বর দৃঢ়তাব্যঞ্জক অথচ এমন ক্ষীণ যে তাহার মুখ দিয়া শ্বাস বাহির হইল না; "আইস" সে বলিল, "আইস। আজিকার রাত্রে শত সহস্র দেহমুক্ত আত্মা নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে, এবং যে সকল মানব শ্রেষ্ঠ ভক্তির প্রভাবে বা কোন গভীর দুঃখ-ভোগবশতঃ বাস্তব জগৎ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে তাহাদের আত্মাও সেই সঙ্গে মুক্তভাবে বিহার করিতেছে; আইস; আজি-কার রাত্রি রহস্যে পূর্ণ, বুদ্ধের প্রেমে পূর্ণ। আজিকার রাত্রে পুণ্য কমলসমূহ তাহাদের বিমলতম সৌরভ বিতরণ করিয়াছে, তাহাতে গগণমার্গ এখনও সুবাসিত—আমার সহিত আইস!" এই কথায় লাইট্সি এক অজানিত,মধুর অথচ প্রবল আলোড়ন অনুভব করিল; তাহার নিঃশ্বাস বেগে প্রবাহিত হইল, তাহার সমস্ত স্নায়ু কাঁপিতে লাগিল, তাহার হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। একপ্রকার উচ্ছ্বাস তাহাকে বিক্ষুব্ধ করিল, তারপরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাহার আত্মা দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিল। বাষ্পোন্মুখ জলের ন্যায় সে লঘু হইল, দৃষ্টিগোচর শ্বাসের ন্যায় সূক্ষ্ম হইল। দেবযোনির রহস্যপূর্ণ আহ্বানের বশবর্ত্তী হইয়া লাইট্সি তাহার দিকে গমন করিল; সে তাহার শিথিল আকার নিজবাহুতে তুলিয়া আকাশে লইয়া গেল।

প্রথমে সে লাইট্‌সিকে নিশীথ-আকাশের স্বচ্ছ নীলিমায় অতি উচ্চে উঠাইল, এবং অশ্রিমের উপরে মুহূর্ত্তেক উড্ডীন রহিল, যেন সে দিক্‌নির্ণয়ে অক্ষম; তাহার পরে দ্রুতগতিতে উ... মুখে লইয়া চলিল।

...তাহাদের নিম্নে পর্ব্বত, উপত্যকা, বন, ধান্যক্ষেত্র, নগর, ...অন্ধকারে অন্তর্ধান হইতে লাগিল।

শীঘ্রই দেখা গেল একটি বৃহৎ নদী সমতল ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত; উজ্জ্বল চন্দ্রকরে উদ্ভাসিত, চঞ্চল তারারশ্মির সহস্র প্রতিবিম্বে আলোকিত হইয়া যেন প্রকাণ্ড রজতসর্পের ন্যায় তাহার দুই তটের মধ্যে বক্রগতিতে চলিয়াছে। একজন ধীবরের ধীর গান যেন রাত্রে দিশাহারা বিলাপের ন্যায় আকাশ পানে উত্থিত হইতেছে।

...ত, বন ও ধান্যক্ষেত্র ক্রমাগত একের পর এক আসিতে লাগিল।

অতি সুদূর পূর্ব্বদিক হইতে এক অস্ফুট অবিরাম ছন্দোবদ্ধ ধ্বনি ... গেল, যেন কোন ঘুমন্ত বিরাট প্রাণীর প্রবল ও নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসশব্দ, এবং বাতাসে লবণাক্ত গন্ধোচ্ছ্বাস ভাসিতে লাগিল।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে শব্দ আকাশে মিলাইয়া গেল ... শূন্য-বিহারী ... র নীচে এখন বালুকাময় সমভূমি প্রসারিত হইল। ...তলের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, সহসা একটি ... নগরী দেখা দিল, তাহার চতুর্দ্দিকে তিনটি প্রাচীর, মধ্যে ... বৃক্ষশোভিত প্রশস্ত রাজপথ, এবং ... প্রাসাদের সংখ্যা অধিক। তাহার মধ্যদেশে একক-অসাধারণ বৃহদায়তন অট্টালিকা যেন একটি স্বতন্ত্র নগর

রচনা করিয়াছে, সেগুলির স্বর্ণমণ্ডিত ছাদ হইতে জ্যোৎস্নালোকে যেন অলৌকিক জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছিল। মন্দির ও শিবির-শোভিত একটি সুরম্য বিশাল উদ্যান বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে আবদ্ধ একটি মুক্তাভ হ্রদে কমলপুষ্প বিরাজ করিতেছে। এই মায়াপুরী হইতে অস্ফুট সঙ্গীত, বাদ্য, সুগন্ধ ও উৎসবের প্রতিধ্বনি উঠিতেছিল।

লাইট্‌সি তাহার শূন্যপথযাত্রার দ্রুতগতিতে পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষীণস্বরে কহিল "ইহাই কি আমাদের গম্যস্থান? আমরা কি এখানে থামিব না? আমাকে তুমি কোথায় লইয়া যাইতেছ?" কিন্তু সে দেবপুরুষ ইহারই মধ্যে এক পক্ষের আস্ফালনে তাহাকে উচ্চতর আকাশে তুলিয়া দিল। "না, এখনো উড়িয়া যাই চল, এই নগরের নাম পিকিন; এই প্রাসাদ স্বর্গসুতের রহস্যময় আবাস-স্থান। এই রাজ-অট্টালিকার সীমার মধ্যে যত দুশ্চিন্তা ও দুঃখ আছে এমন পৃথিবীর আর কোনখানে নাই। এদিকে আবার রাত্রি অবসানপ্রায়, শীঘ্রই দিনের আলো প্রকাশিত হইবে, অথচ আমাদের এখনও দীর্ঘ পথ উত্তীর্ণ হইবার আছে, এতক্ষণে কেবলমাত্র বিরাট প্রাচীরে আসিয়া পৌঁছিলাম।"

তখন লাইট্‌সি দেখিল একটি সুদীর্ঘ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাকার নদী ও গহ্বর অতিক্রম করিয়া সুদূর আকাশসীমান্তবর্ত্তী মরুতে মিশাইয়া গিয়াছে। বালুকাময় সমভূমির পরিবর্ত্তে এখন ঝাউ-বন ও লার্চ বৃক্ষ দেখা গেল। চন্দ্র এখনো একটি পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডলাকারে জ্যোতি বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু তারার আলো সব নিভিয়া গিয়াছিল। আকাশ ক্রমশঃ শীতল হইল, তীব্র ও রূঢ় বায়ু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঘখণ্ডকে কশাঘাত করিতে লাগিল, রাজপক্ষী দলে দলে দক্ষিণ মুখে উড়িয়া চলিল।

যখন ম্লান উষার প্রথম আলো আকাশকে রেখাঙ্কিত করিল, তখন সেই দেবযোনি তাহার আকাশ-যাত্রা নিবৃত্ত করিয়া ধীরে ধীরে ধরাতল অভিমুখে নামিতে লাগিল। সেখানে দুর্গপ্রাচীর ও তুষারমণ্ডিত নদীবেষ্টিত কতকগুলি সামান্য কুটীর লক্ষিত হইল। অপর দিকে সীমাহীন সমতলক্ষেত্র প্রসারিত, তাহার উপর বৃহৎ মৃত্যু-আচ্ছাদনের ন্যায় নীহাররাশি আপন শুভ্রতা বিস্তার করিয়াছে। এই মরুময় প্রদেশ, প্রত্যূষের আধ-আলো আধ ছায়াতে অধিকতর শূন্য ও উচ্ছৃঙ্খল দেখাইতেছিল। ইহাই মাঞ্চুরিয়ার উত্তর সীমানা।

এইখানে একটা দীনহীন কুটীরে, মলিন শয্যায় লাইট্‌সির প্রণয়ী পড়িয়া ছিল। আশায় নিরাশ, প্রেমে বঞ্চিত, ও সর্ব্বজন-পরিত্যক্ত হইয়া, তাহার দুঃখ সহিবার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, তাহার আর বাঁচিবার সাধ বা শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। এই নিরানন্দ দেশে আসা অবধি এক অবসাদরোগে তাহার ক্ষয় হইতেছিল, ও মৃত্যু অল্পে অল্পে তাহার দেহ অধিকার করিতেছিল। পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যাকালে তাহার পীড়ার অকস্মাৎ বৃদ্ধি হইল; এখন তাহার শ্বাস অতি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, তাহার ছায়াচ্ছন্ন নয়নে আর আলো প্রবেশ করিতেছে না। কিন্তু চিন্তার শিখা এখনো তাহার প্রাণের ভিতর জ্বলিতেছিল; মৃত্যুযন্ত্রণায়ও সে লাইট্‌সির স্বপ্ন দেখিতেছিল, ও পূর্ব্বপ্রেমের আন্তরিক আকুলতার সহিত তাহাকে ডাকিতেছিল।

সহসা লাইট্‌সি প্রবেশ করিল, তাহার বিবর্ণ ওষ্ঠ মুমূর্ষুর পাংশু অধরের উপর রাখিল, ও একটি চুম্বনে তাহার অন্তিম শ্বাস গ্রহণ করিয়া লইল।

তাহার মৃত্যু হইলে পর দুই জনের আত্মা অবশেষে মিলিত

হইয়া একত্রে আকাশ অভিমুখে উঠিল, এবং প্রত্যক্ষ জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্ত ঈশ্বরের মনোরাজ্যে গিয়া পৌঁছিল। সেই অবধি তাহাদের নিকট এক অভিনব পৃথিবী প্রকাশিত হইল, এক অশরীরী পৃথিবী, যেখানে দেহমুক্ত আনন্দময় প্রাণী-সকল বাস করে, যাহার উর্দ্ধে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ লয়, পরম নির্ব্বাণলোক বিরাজমান। চিরদিনের জন্য তাহারা অশ্রুসাগ-রের পরপারে উপনীত হইল, মর্ত্ত্যক্লেশের স্মৃতিমাত্রও তাহাদের রহিল না।

৪

কিন্তু কমল-কুমারিকাশ্রমস্থিত লাইট্‌সির দেহ জীবিত রহিল। সে নিঃশ্বাস ফেলিত, উঠিত, বেড়াইত, তাহার নিয়মিত কাজকর্ম্ম করিত—মন্দিরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, ধ্যানশালায় দীর্ঘ উপবেশন, সরোবরতীরে একাকী ভ্রমণ। কিন্তু তাহার মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছিল, তাহার শরীরে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, তাহার নয়নতারা জ্যোতিহীন হইয়া গিয়াছিল, তাহার শীর্ণ ওষ্ঠাধর হইতে মধ্যে মধ্যে যে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনা যাইত তাহা যেন বাষ্পের ন্যায় নির্গত হইত ও তাহার কথার কোন অর্থ থাকিত না; তাহার হস্তপদচালনায় এক আশ্চর্য্য ধীরতা ও অনিশ্চিততা লক্ষিত হইত—সে যেন এক অজ্ঞেয় বাহ্যিক শক্তির আজ্ঞা পালন করিয়া চলিত।

এই অপূর্ব্ব অবস্থা নয় দিবসকাল রহিল।

তাহার সখীদের মধ্যে একদল বলিত সে নিশ্চিত পাগল হইয়া গিয়াছে; অপরপক্ষ ভীতিগ্রস্ত হইয়া বলিত যে, সে কোন বহুকালমৃত অযত্নসমাধিসম্পন্ন কুমারীর প্রেতাত্মা, মন্দিরের নিকট বিচরণ করিবার জন্য উঠিয়া আসিয়াছে।

অবশেষে দশম দিনের প্রাতঃকালে এই আত্মাশূন্য দেহ চিরকালের জন্য শীতল ও শান্ত হইল।

প্রচলিত প্রথা অনুসারে কুমারীগণ তাহার অন্তিম সজ্জায় প্রবৃত্ত হইল। তাহারা মৃতদেহে শ্বেত পশমের নূতন বস্ত্র পরাইল, সযত্নে কেশগুচ্ছ সাজাইয়া দুটি শৃঙ্গনির্ম্মিত কণ্টকদ্বারা মস্তকের উপরিভাগে স্থাপন করিল, হস্তের অঙ্গুলী রৌপ্যে মণ্ডিত করিল, বিশীর্ণ গণ্ডস্থলে শ্বেতচূর্ণ মাখাইল, ওষ্ঠাধরে অলক্ত, চিবুকের নিম্নভাগে একটি নীলরেখা দিল; তাহার পরে দুটি শবোত্তরীয়ে তাহাকে আবৃত করিয়া একটি সিডারকাষ্ঠের বাক্সে শয়ান করাইল, তাহার ভিতরে পদ্ম এবং উইলোপত্র স্থাপন করিল।

পরদিবস লাইট্‌সির দেহ আশ্রমের সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইল; ক্ষেত্রটি আজালিয়াশোভিত একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর স্থিত, সেখান হইতে সরোবর এবং সমস্ত আশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

যতক্ষণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলিতেছিল, অভূতপূর্ব্ব ঘটনাসমূহে দর্শকদিগের মন ভয়ে অস্থির করিতেছিল। প্রেতাত্মাদিগের সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত যে সোনালি রূপালি কাগজখণ্ড প্রজ্বলিত করা হইত, সেগুলি বিনাধূমে দগ্ধ হইল; ধূপধূনার বর্ত্তিকা পুড়িবার সময় গন্ধ পাওয়া গেল না এবং মোমবাতি জ্বালাইবামাত্র নিভিয়া গেল, যদিও কোনপ্রকারে বাতাসের লেশমাত্র বুঝা গেল না।

সারসংগ্রহ।

নূতন "ফেডারেশন"।

উপনিবেশস্থাপন এবং রাজ্যবিস্তারের সহিত ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞের মনে এক দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে যে, এই সকল শতযোজনব্যবহিত ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ড চিরদিন কখনও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে না—আজই হোক্ কালই হোক্ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মত কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের শাসনকর্তৃত্ব লঙ্ঘন করিয়া স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং এইবেলা দিন থাকিতে সেই ভাবী অনিবার্য্য বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, কিম্বা এমন কোনও অমোঘ সদুপায় অবলম্বন করা যাহাতে কখনও বিচ্ছেদ ঘটিবার কারণ না উপস্থিত হয়।

অধিকাংশ বড় বড় রাজনৈতিক পণ্ডিতদিগের মতে এ বিচ্ছেদ নিবারণ করা মানবচেষ্টার সাধ্যাতীত। কিন্তু জর্জ পার্কিন প্রভৃতি একশ্রেণীর লেখকগণের বিশ্বাস সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ইহাঁদের মত এই যে, বাষ্পযান এবং তাড়িতবার্ত্তাবহের কল্যাণে প্রাকৃতিক ব্যবধান এখনকার দিনে নগণ্যের মধ্যে, সুতরাং ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ডের সহিত কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশসমূহের বৃহৎ একটি যুক্তরাজ্যরূপে অবস্থিতি তাদৃশ অসম্ভব নয়। এবং এরূপ দৃঢ় যোগবন্ধন যখন সকলেরই পক্ষে সুবিধাজনক তখন কোনও পক্ষ হইতে আপত্তি উঠিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব যেখানে বন কাটিয়া বা লোক মারিয়া জন্ বুলের বৎস হাত

পা ছড়াইবার জমি করিয়া লইয়াছে, সেই সেই স্থান লইয়া একটি "ইম্পিরিয়াল্ ফেডারেশন্" গঠিত হউক্।

কিন্তু এক মহা সমস্যা ভারতবর্ষ। তাহাকে লইয়া কি করা যায়? ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব—অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া ইংলণ্ডের একদণ্ড চলে না। ইংরাজ শ্রমজীবীর অন্নের সংস্থান ভারতবর্ষ। বড় সামান্য সংস্থান নহে—বৎসরে প্রায় একশত কোটি টাকার বাণিজ্য। ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া দিলে লাঙ্কাশায়ারের তন্তুবায়কে মাসে পনের দিন উপবাস করিতে হয়, ওল্ড্‌হ্যামের তিন-চতুর্থাংশ কাজ বন্ধ হইয়া যায়। ডাণ্ডীর পাটের ব্যবসায়ীর একমাত্র নির্ভর বাঙ্গলার পাট—রপ্তানি একদিন বন্ধ থাকিলে পরদিন সেখানে একেবারে সর্ব্বনাশ।

লণ্ডন চেম্বার অফ কমার্সে বক্তৃতাকালে লর্ড ডফারিণ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে সামান্য গোলযোগ উপস্থিত হইলে বিলাতের প্রত্যেক সামান্যতম কুটীরবাসীকে পর্য্যন্ত তাহার দারুণ ফলভোগ করিতে হইবে। বিলাতী পণ্যসামগ্রীর রপ্তানি ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ১৮৮৮ সালে বিলাত হইতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৭২,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের তুলার বস্ত্রাদি রপ্তানি হয়। তাহার মধ্যে ভারতবর্ষে কাট্‌তি ২১,২৫০,০১০ পাউণ্ড মূল্যের সামগ্রী, কিন্তু চীনে ৬,৫০০,০০০ পাউণ্ড, জর্ম্মনিতে ২,৫০০,০০০ পাউণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাজ্যে ২,০০০,০০০ পাউণ্ডের অধিক নয়। ঐ বৎসরেই বিলাত হইতে নানান্ দেশে ৩৬,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ধাতুনির্ম্মিত সামগ্রী এবং বিবিধ যন্ত্রাদি রপ্তানি হয়—তন্মধ্যে ভারতবর্ষে কাট্‌তি ৫,৭৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য, কিন্তু ফ্রান্সে ৩,০০০,০০০ পাউণ্ড, রুষিয়াতে ১,৭৫০,০০০ পাউণ্ড এবং চীনে ৭৫০,০০০ পাউণ্ড বৈ

নয়। লর্ড ডফারিণ বলেন, ভারতের সহিত বিলাতের বাণিজ্য সমগ্র পৃথিবীতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের দশমাংশ।

শুধু আমদানি রপ্তানি নহে, ভারতবর্ষে রেলওয়ে প্রভৃতিতে ইংরাজের ৩৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড নিয়মিত খাটিতেছে। ইহা ভিন্ন ছোটখাট নানান্ ব্যবসায়ে বিস্তর বিলাতী মূলধন খাটে এবং ন্যায্য সুদ পোষাইয়াও ইংরাজ বণিকের যথেষ্ট লাভ থাকে।

ইহার উপর লক্ষাধিক ইংরাজ কর্ম্মচারীর বেতন ভারতবর্ষকে যোগাইতে হয়। এবং বাটাবিভ্রাটের কল্যাণে বিলাতে পেনশন যোগাইতেও সামান্য দণ্ড লাগে না।

আরও, পূর্ব্বাঞ্চলে ইংরাজের বাণিজ্যবিস্তারের সম্পূর্ণ নির্ভর ভারতবর্ষের উপর। ভারতবর্ষ হাতছাড়া হইলে প্রাচ্য ভূভাগে ইংরাজ বাণিজ্যশ্রী একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে।

ইংলণ্ড এই কামধেনুকে ছাড়িবে কি দুঃখে?

ইংলণ্ডের ত কথাই নাই, ইংরাজের উপনিবেশসমূহও ভারতবর্ষকে দোহন করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে।

এডেন ও অন্যান্য গুটিকতক বন্দরে ভারতবর্ষ ইংরাজসৈন্যের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া অষ্ট্রেলেসিয়ার বিস্তর সুবিধা করিয়া দেয়। এবং সম্প্রতি ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যসূত্রে অষ্ট্রেলেসিয়ার অবস্থাও অনেক ভাল হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষ ইংরাজের অধিকারচ্যুত হইলে এ আশার পথ একেবারে বন্ধ।

দক্ষিণ আফ্রিকার উন্নতির প্রধান কারণই ভারতবর্ষ এক সময়ে ভারতবর্ষে আসিবার পথে এইখানে জাহাজ থামিত। এবং এখনও ভারতবর্ষের সহিত সম্বন্ধেই ইহার বিশেষ গৌরব।

ইংরাজ উপনিবেশসমূহের মধ্যে একমাত্র কানাডারই ভারতবর্ষের সহিত দূর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরে

হংকং অবধি কানাডীর পোতের রীতিমত গতিবিধি আরম্ভ হইয়াছে। এবং ইংরাজের প্রাচ্য অধিকারসমূহে কানাডার অনেক ভবিষ্যৎ সুবিধার সূচনা দেখা যাইতেছে।

সুতরাং ইংরাজ উপনিবেশসমূহেরও ভারতবর্ষকে ছাড়িবার সাধ নাই।

তবে কি ভারতবর্ষকেও কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতির ন্যায় অধিকার দিয়া ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে? পার্কিন সাহেব ইহাতে নারাজ। ভারতবর্ষকে কোনও নূতন অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। তিনি বলেন, অধিকার কিছুই না দিয়া কেবল ভারতবর্ষের প্রভুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইবে। অর্থাৎ এখন যেমন ভারতবর্ষ একমাত্র ইংলণ্ডেরই অধীন তাহা না রাখিয়া তাহাকে ইংলণ্ড এবং নিউজিলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, আফ্রিকা প্রভৃতি যাবতীয় ইংরাজ উপনিবেশের অধীনে স্থাপিত করা হউক্। এখন বৃটিশ পার্লামেণ্ট যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে ফেডারেশন তাহাই করিবে। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের কথা পার্লামেণ্টে না উঠিয়া ফেডারেশনে আলোচিত হইবে। ভারত গবর্মেণ্ট এখন যেরূপ ভাবে সংগঠিত এইরূপই থাকিবে—কেবল তাহার কার্য্যাকার্য্য সমালোচনার ভার পার্লামেণ্টের পরিবর্ত্তে ফেডারেশনের উপর পড়িবে। এইরূপে ইংলণ্ড এবং উপনিবেশসমূহের সমবেত স্বার্থ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সংহত-বলে চিরদিন ভারতবর্ষকে মুঠার ভিতরে চাপিয়া রাখিবে—এবং এই বিপুল রাবণবংশের শাসনশোষণে ভারতবর্ষের পারলৌকিক মুক্তির পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিবে।

প্রাচীন শূন্যবাদ।

মায়ার হস্ত এড়াইবার উদ্দেশে কিরূপ তর্কের মায়াপাশ বিস্তার করিতে হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত পাঠকদের কৌতূহলজনক বোধ হইতে পারে।

গ্রন্থখানির নাম মধ্যমকবৃত্তি। ইহা "বিনয় সূত্র" নামক কোন এক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রাচীন ভাষ্য। ভাষ্যকারের নাম চন্দ্রকীর্ত্তি আচার্য্য।

ইনি একজন শূন্যবাদী। কিছুই যে নাই ইহা প্রমাণ করাই ইহাঁর উদ্দেশ্য। কি করিয়া প্রমাণ করিতেছেন দেখা যাউক।

প্রথমে প্রতিপক্ষ বলিলেন—দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ রসন স্পর্শন এবং মন এই ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রষ্টব্য প্রভৃতি বিষয় আমাদের গোচর হইয়া থাকে।

টীকাকার বলিতেছেন, দর্শন যে একটা স্বাভাবিক শক্তি উপরি-উক্ত বচনে এই কথা মানিয়া লওয়া হইল। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। দর্শনশক্তি যে আছে এ কথা কে বলিল?

কারণ,

স্বমাত্মানং দর্শনং হি তত্ত্বমেব ন পশ্যতি।
ন পশ্যতি যদাত্মানং কথং দ্রক্ষ্যতি তৎ পরান্।

অর্থাৎ চক্ষু আপনার তত্ত্ব আপনি দেখিতে পায় না, অতএব যে আপনাকে দেখিতে পায় না সে অন্যকে কি করিয়া দেখিবে?

প্রমাণ হইয়া গেল চক্ষু দেখিতে পায় না। "তস্মান্নাস্তি দর্শনং।"

কিন্তু প্রতিবাদী বলিতে পারেন—

"যদ্যপি স্বাত্মানং দর্শনং ন পশ্যতি, তথাপি অগ্নিবৎ পরান্ দ্রক্ষ্যতি। তথাহি

অগ্নিঃ পরাত্মানমেব দহতি ন স্বাত্মানং এবং দর্শনং পরানেব দ্রক্ষ্যতি ন স্বাত্মানং ইতি।

অর্থাৎ অগ্নি যেমন পরকে দহন করে কিন্তু আপনি দগ্ধ হয় না, তেমনি চক্ষু অন্যকে দেখে নিজেকে দেখিতে পায় না—ইহা অসম্ভব নহে।

উত্তরদাতা বলেন—এতদপ্যযুক্তং। ইহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ,

> ন পর্য্যাপ্তোঽগ্নিদৃষ্টান্তো দর্শনস্য প্রসিদ্ধয়ে।
> সদর্শনঃ স প্রত্যুক্তো গম্যমানগতাগতৈঃ।

অর্থাৎ অগ্নিদৃষ্টান্ত দর্শনপ্রমাণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। কারণ, গম্যমানগতাগতের দ্বারা দহনশক্তি এবং দর্শনশক্তি উভয়ই অপ্রমাণ হইতেছে।

"গম্যমানগতাগত" বলিতে কি বুঝায় সেটা একটু মনোযোগ করিয়া বুঝা আবশ্যক।

"গতং ন গম্যতে নাগতং ন গম্যমানং এবং অগ্নিনাপি দগ্ধং ন দহ্যতে নাদগ্ধং দহ্যতে ইত্যাদিনা সমং বাচ্যং। যথা চ ন গতং নাগতং ন গম্যমানং গম্যতে এবং ন দৃষ্টং দৃশ্যতে তাবদদৃষ্টং নৈব দৃশ্যতে। দৃষ্টাদৃষ্টবিনির্মুক্তং দৃশ্যমানং ন দৃশ্যতে।"

অর্থাৎ যাহা গত তাহা যাইতে পারে না, যাহা অগত তাহাও যাইতে পারে না এবং যাহা গতও নহে অগতও নহে কেবলমাত্র গম্যমান, তাহারই বা যাওয়া হইল কৈ? তেমনি, যাহা দগ্ধ তাহার দহন হয় না, যাহা অদগ্ধ তাহারও দহন হয় না, যাহা দহ্যমান তাহারই বা দাহ হইল কৈ? পুনশ্চ যাহা দৃষ্ট তাহা আর দেখা হয় না, যাহা অদৃষ্ট তাহাও দেখা হয় না, যাহা দৃষ্টও নহে অদৃষ্টও নহে কেবল দৃশ্যমান তাহাও দেখা হইতে পারে না। ভাবটা এই, যাহা হইয়া গেছে তাহা ত চুকিয়াই গেছে,

যাহা হয় নাই তাহার কথা ছাড়িয়াই দাও, যাহা হইতেছে মাত্র তাহাকে হইল এমন কথা কেহ বলিতে পারে না।

"এবং দর্শনং পশ্যতে তাবদিত্যাদিনা অগ্নিদৃষ্টান্তেন সহ গম্যমানগতাগতৈ-র্যস্মাৎ সমং দূষণং অতোঽগ্নিবদ্দর্শনসিদ্ধিরিতি ন যুজ্যতে।

তবেই ত এক "গম্যমানগতাগতে"র দ্বারা চক্ষুই বল অগ্নিই বল সমস্ত অসিদ্ধ হইয়া গেল।

সিদ্ধ হইল কি ?

"ততশ্চ সিদ্ধমেতৎ স্বাত্মবদ্দর্শনং পরানপি ন পশ্যতীতি।"

অর্থাৎ চক্ষু যেমন আপনাকে দেখিতে পায় না তেমনি পর-কেও দেখিতে পায় না।

বুদ্ধচরিত।

পঞ্চম অধ্যায়।

পূর্ব্বজন্ম।

পুনর্জন্মবাদ বৌদ্ধধর্ম্মের মূলমত। জগৎ সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির অন্তরে কর্ম্মফল বলিয়া একটি মূলনিয়ম নিহিত হইয়াছে। সেই নিয়মের অধীনস্থ হইয়া সমুদায় জীব-লোক জীবনচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। লোকেরা যে সকল কর্ম্ম করে তাহার ফল ভিন্ন ভিন্ন জন্ম। ভাল কর্ম্ম করিলে ভাল জন্ম হয়, মন্দ কর্ম্ম করিলে মন্দ জন্ম হয়। এই নিয়মের বলে কেহ মনুষ্যজন্ম হইতে পশুজন্ম, পশুজন্ম হইতে দেবজন্ম এবং দেবজন্ম হইতে পুনরায় পশুজন্ম ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জন্ম লাভ করে। এইরূপ চক্রে অসংখ্য বৎসর কাটিয়া যায়। যতদিন

না পূর্ব্বজন্মের ফলসকল পুণ্যকর্ম্মদ্বারা ধৌত হইয়া যায়, ততদিন এইরূপ জন্ম এবং পুনর্জ্জন্ম হইতে থাকে। মনুষ্যের শেষ অবস্থা নির্ব্বাণ। সে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে লোকে জন্ম হইতে চিরকালের জন্য নিষ্কৃতি পায়—আর তাহাকে জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

এই মতের গূঢ়তত্ত্ব আমরা পরে আলোচনা করিব। আমরা এই স্থানে পুনর্জ্জন্মের কথার উল্লেখ করিতেছি তাহার কারণ আছে। বুদ্ধ মনুষ্য ছিলেন এবং তিনিও সকল জীবের ন্যায় জীবনচক্রে ঘুরিয়াছিলেন। তিনি একবারে জন্মগ্রহণ করিয়া বুদ্ধ হন নাই। বৌদ্ধেরা বলে যে তাঁহাকে সর্ব্বশুদ্ধ ৫০৬ বার জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নানারূপে তাঁহাকে জন্মভার বহন করিতে হয়। কখন পশু হইয়া, কখন মানুষ হইয়া, কখন বা দেবতা হইয়া তিনি জীবনের সম্ভোগ এবং যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত তালিকাটি পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে কতবার কত আকারে বুদ্ধ পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছিলেন :—

সন্ন্যাসী	৮৩ বার
নৃপতি	৫৮ ,,
বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা	৪৩ ,,
ধর্ম্মগুরু	২৬ ,,
রাজপারিষদ	২৪ ,,
ব্রাহ্মণ পুরোহিত	২৪ ,,
রাজকুমার	২৪ ,,
সম্ভ্রান্ত লোক	২৩ ,,
পণ্ডিত	২২ ,,

ইন্দ্রদেব	২০ বার
বানর	* ১৮ „
বণিক	১৩ „
ধনাঢ্য লোক	১২ „
হরিণ	১০ „
সিংহ	১০ „
হংস	৮ „
কাদাখোঁচা	৬ „
হস্তী	৬ „
কুক্কুট	৬ „
ক্রীতদাস	৫ „
শিকারী পক্ষী	৫ „
অশ্ব	৪ „
বৃষ	৪ „
ব্রহ্মা	৪ „
ময়ূর	৪ „
সর্প	৪ „
কুম্ভকার	৩ „
চণ্ডাল	৩ „
টিকটিকি	৩ „
মৎস্য	২ „
মাহুত	২ „
মূষিক	২ „

* একবার তিনি বানররাজ হইয়াছিলেন। ৮০,০০০ বানর তাঁহার প্রজা ছিল।

শৃগাল	২ বার
কাক	২ "
কাঠঠোকরা	২ "
চোর	২ "
শূকরশাবক	২ "
কুকুর	১ "
সাপের ওঝা	১ "
দ্যূতক্রীড়ক	১ "
রাজমজুর	১ "
কর্ম্মকার	১ "
ওঝা	১ "
শিষ্য	১ "
স্বর্ণকার	১ "
সূত্রধর	১ "
জলপক্ষী	১ "
ভেক	১ "
খরগোশ	১ "
কুক্কুট	১ "
চীল	১ "
বন্যকুক্কুট	১ "
কিন্দুরা	১ "

এইরূপ ৫০৬ বার বিবিধ আকারে জন্মগ্রহণ করিয়া তবে তিনি বুদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন। নামগুলি পাঠ করিয়া আর একটি বিষয় জানিতে পারিতেছি। বুদ্ধ একবারও স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কেন তাহা বলিতে পারি না। বুদ্ধ স্ত্রীজাতিকে

অধিক অনুগ্রহ করিতেন না। তাঁহার ধর্ম্ম সুচারুরূপে পালন করিতে হইলে স্ত্রীজাতিকে এককালে বিসর্জ্জন দিতে হয়। বোধ হয়, সেই জন্য তাঁহাকে কখন স্ত্রীরূপ ধারণ করিতে হয় নাই। বৌদ্ধদিগের মতে স্ত্রীলোকেরা কখন বুদ্ধ হইতে পারে না; পুরুষই কেবল বুদ্ধ হইবার উপযুক্ত। সুতরাং স্ত্রী হইয়া জন্মিলে বুদ্ধ হইবার পক্ষে ব্যাঘাত হইতে পারে, এই জন্য বোধ হয় তিনি ঐরূপে কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই।

যখন পূর্ব্বজীবনের সঞ্চিত সমুদয় পাপ পুণ্যের দ্বারা ধৌত হইয়া গেল, তখন বুদ্ধ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া কোন একটি স্বর্গে বাস করিতে গেলেন। বৌদ্ধদিগের মতে এই বিশ্বসংসার একত্রিংশ লোকে বিভক্ত। একটি লোক আর একটি লোকের উপর স্থাপিত। তন্মধ্যে চারিটি দণ্ডলোক। সেখানে জীবেরা কুকর্ম্মফলহেতু নানাপ্রকার দণ্ড পায়; তাহাদিগের নাম নরক, আসুরিক, প্রেত, এবং পশুলোক। ইহাদিগের উপর নরলোক; নরলোকের উপর ছয় স্বর্গ। স্বর্গলোকে সম্ভোগকামনা পূর্ণমাত্রায় আছে। স্বর্গের উপর আর ষোড়শটি লোক আছে, তাহাদিগের নাম রূপ। রূপবাসীদিগকে ব্রহ্মলোকবাসী বলে। তাঁহারা নিষ্পাপ, কিন্তু তাঁহাদিগের এখনও জড়ের প্রতি অনুরাগ থাকে। ষোড়শ রূপের উপর চারিটি অরূপ লোক। এখানে সকলেই সিদ্ধ—জড়ের আধিপত্য নাই—আর একপদ অগ্রসর হইলেই নির্ব্বাণে উপস্থিত হওয়া যায়। যে ছয় স্বর্গ কথিত হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে চতুর্থের নাম তুষিত। বুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধদেব এই তুষিতস্বর্গে বাস করিতেছিলেন। সেখানে তিনি সকল প্রকার সুভোগ্য মনোরম পদার্থদ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া দেবজীবন ধারণ করিতেছিলেন। হঠাৎ চারিদিকে এক রব উঠিল

যে তুষিতস্বর্গ হইতে একজন শীঘ্র অবনীমণ্ডলে যাইয়া বুদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। আমাদিগের মধ্যে কে এত ভাগ্যবান যে তাহার ভাগ্যে এত বড় পদ হইবে—এই কথা পরস্পর সকলে বলিতে লাগিলেন। অবশেষে সকলে জানিতে পারিলেন যে বুদ্ধের ভাগ্যেই এত বড় গৌরব লিখিত আছে। বুদ্ধকে আসিয়া তাঁহারা বলিলেন—"দেব, ধন্য আপনি যে আপনার কৃপায় জীবলোক জীবন-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। পৃথিবীতে ধর্ম্মের আলোক নিবিয়া গিয়াছে; জীবাত্মা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে; মনুষ্যেরা রিপুগণের দাস হইয়া পড়িয়াছে—তাহাদিগের মধ্যে প্রেমের অভাব লক্ষিত হয়; সকলেই পরস্পরকে ঘৃণা করে—বিবাদ, বিতণ্ডা, সংগ্রাম ইহাতেই সদা মত্ত; কেহ কাহাকে দয়া করে না। আপনি তাহাদিগকে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্ত করিতে পারেন। অতএব দেব, শুভকার্য্যে সত্বর প্রবৃত্ত হউন।"

বুদ্ধ ভাবিলেন যে তাঁহার আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। অতএব তিনি সকলকে বলিলেন যে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে চারিটি বিষয়ের মীমাংসা করা উচিত। (১) তিনি কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিবেন (২) কোন্ স্থানে অবতীর্ণ হইবেন (৩) কোন্ জাতির মধ্যে প্রকাশিত হইবেন (৪) কোন্ মাতার গর্ভে তিনি জন্মলাভ করিবেন। অবশেষে প্রথম প্রশ্নসম্বন্ধে এই স্থিরীকৃত হইল যে, যখন মনুষ্যের পরমায়ু একশত বৎসরের অধিক কিম্বা কম থাকিবে, তখন বুদ্ধের জন্ম হওয়া উচিত নহে। যেহেতু অধিক থাকিলে মনুষ্যেরা ধর্ম্মের কথা শুনিতে আগ্রহ দেখাইবে না—অনেক দিন বাঁচিবার আছে জানিয়া তাহারা রিপুর হাত হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করিবে না; সুতরাং বুদ্ধ যাহা বলিবেন তাহার কোন ফল হইবে না। একশত বৎসরের কম পরমায়ু

হইলে মনুষ্যেরা অল্পকালের মধ্যে সকল বিলাসসম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিবে—তাহাদিগের রিপুসকল তাহাদিগকে দিনরাত্রি দগ্ধ করিবে; সুতরাং বুদ্ধের বচনসকল অরণ্যে রোদনমাত্র হইবে। অতএব, এই কলিযুগের প্রারম্ভেই বুদ্ধাগমনের উপযুক্ত সময়, যেহেতু এই সময় মনুষ্যের পরমায়ু ঠিক একশত বৎসর। তাহার পর বুদ্ধ চারিদিকে নেত্রবিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—আমার জম্বুদ্বীপে জন্মগ্রহণ করাই উচিত। কারণ, এই দেশ সকল দেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং পুরাকালে বুদ্ধেরা এই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি এই জম্বুদ্বীপের মধ্যদেশে জন্মলাভ করিব।

তাহার পর কথা হইল যে, তিনি কোন্ জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইবেন? বৈশ্য এবং শূদ্রজাতির মধ্যে কখন কোন ধর্ম্মসংস্থাপক জন্মগ্রহণ করেন না; যেহেতু নীচজাতির লোককে কেহ শ্রদ্ধা করে না। ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে সকলে তাঁহার কথা শুনিবে। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন না, কারণ, জম্বুদ্বীপে তখন ব্রাহ্মণদিগের প্রতি লোকের ততটা শ্রদ্ধা ছিল না। ক্ষত্রিয়েরাই মান্যগণ্য, এই জন্য তিনি ক্ষত্রিয়কুলে উদ্ভূত হইবেন। তাহার পর কথা হইল, ক্ষত্রিয়কুলের কোন্ বংশে তাঁহার আবির্ভাব হইবে? কেহ বলিলেন—বৈদেহীকুলে আপনার জন্ম হওয়া উচিত। তাহার প্রতিবাদে আর একজন বলিলেন—না, বৈদেহীকুলে আপনার জন্মগ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, এই বংশ মাতৃপিতৃশুদ্ধ হইলেও অপুত্রক, অতএব অনবস্থিত। এবং এই বিদেহরাজ্যে মনোহর উদ্যান সরোবর কিম্বা তড়াগাদি কিছুই নাই। ইহা ইতরজনের বাসযোগ্য।

কোশলকুলসম্বন্ধে একজন বলিলেন—কোশলকুলেও আপনার

জন্মগ্রহণ হইতে পারে না। কারণ, এই বংশ মাতৃপিতৃশুদ্ধ নহে এবং এ বংশোৎপন্ন রাজারা নির্ধন। ইহাদের মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ অতি অল্পই আছে এবং মণিমাণিক্যাদি কিছুই নাই।

অপরে বলিলেন—বংশরাজকুলেও আপনার জন্মগ্রহণ করা অনুচিত। কারণ, এই বংশের রাজারা অতি নীচ ও কোপন-স্বভাব, ইহাদের কিছুমাত্র খ্যাতি নাই এবং ইহারা নাস্তিক। এ পর্য্যন্ত কোনো শ্রেষ্ঠ পুরুষই এবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

অন্যান্য দেবতারা বলিলেন—বৈশালী মহানগরীতেও আপনার জন্মগ্রহণ করা হইতে পারে না। কারণ, এখানকার লোক-দিগের মধ্যে ন্যায়বাদিতা নাই এবং ইহারা অধার্ম্মিক। কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করে না; সকলেই স্বস্বপ্রধান, আপনাকে আপনি রাজা মনে করিয়া থাকে।

অপরে বলিলেন—প্রদ্যোতিনকুলেও জন্মগ্রহণ করা অনুচিত। কারণ, এই বংশের রাজারা কোপনস্বভাব, অনবস্থিতচিত্ত এবং অতিশয় নির্দ্দয়।

কেহ কেহ বলিলেন—কংসকুলোৎপন্ন সুবাহু রাজার রাজ-ধানী মথুরানগরীও জন্মগ্রহণের উপযুক্ত স্থান নহে। কারণ, সেই রাজা মিথ্যাদৃষ্টিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি দস্যু।

অপরে বলিলেন—হস্তিনাপুরে পাণ্ডবকুলেও জন্মগ্রহণ হইতে পারে না। কারণ, পাণ্ডবেরা জারজাত, যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের পুত্র, ভীমসেন বায়ুর, অর্জ্জুন ইন্দ্রের এবং নকুল ও সহদেব অশ্বিনের।

অন্যান্য দেবগণ বলিলেন—সুমিত্র রাজার নিবাসভূমি মিথিলানগরীও জন্মগ্রহণোপযুক্ত স্থান নহে। কারণ, ঐ রাজা অতিশয় গুণবান্ হইলেও বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত প্রজাদিগকে সমুৎসাহিত করিতে পারেন না এবং তিনি বহুপুত্র।

বুদ্ধ বলিলেন—আমি শাক্যবংশে জন্মগ্রহণ করিব, কারণ, সে বংশে কোনপ্রকার কলঙ্ক নাই এবং তাহাতে বিদ্যা, বল, বীর্য্য সকলই বর্ত্তমান।

চতুর্থ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তিনি বলিলেন—আমি মায়াদেবীর গর্ভে জন্মলাভ করিব।

এইরূপে সকল কথা স্থির হইলে তিনি তুষিতস্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া মায়াদেবীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যশোধরা নাম্নী এক কন্যা সিংহহনুর দুহিতা অমৃতার গর্ভে প্রবেশ করেন।

যখন এই ব্যাপারটি সম্পাদিত হইল তখন পৃথিবীতে নানা অনৈসর্গিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। হঠাৎ এক অপূর্ব্ব দীপ্তি বিশ্বকে আলোকিত করিল। অন্ধ দেখিতে পাইল, বধির শুনিতে লাগিল, কুব্জ উন্নত হইল, খঞ্জ হাঁটিতে লাগিল, কারাগারের বন্দীদিগের লৌহ-শৃঙ্খল সকল আপনাপনি খুলিয়া গেল; নরকাগ্নি নিবিয়া গেল, জীবদিগের সকল রোগ দূর হইল, লোকেরা কলহবাক্য পরিত্যাগ করিয়া শান্তিবচনে পরস্পরকে সম্ভাষণ করিতে লাগিল, সকলে নানারূপ আহ্লাদচিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল; হস্তীরা গম্ভীরস্বরে তাহাদিগের সুখের পরিচয় দিল, সঙ্গীতযন্ত্র হইতে আপনাপনি সুললিত ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল; স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কারসমূহ পরস্পরে আঘাত না লাগিয়াও ঝনঝনা রব করিতে লাগিল; আকাশ প্রখর জ্যোতিতে আবৃত হইল, সুস্নিগ্ধ পবন চারিদিকে প্রবাহিত হইল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, পৃথিবীর নানা স্থান হইতে জলপ্রপাত উদ্ভূত হইল, পক্ষীরা স্থিরভাবে চাহিল, নদীপ্রবাহ রুদ্ধ হইল, সমুদ্রের জল মিষ্ট হইল, পাঁচ প্রকার পদ্ম চারিদিকে প্রস্ফুটিত হইল, নানাবিধ পুষ্প নানা-

বর্ণে দিক্‌ আমোদিত করিতে লাগিল, আকাশে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিকে সৌরভ প্রেরণ করিল, দেবলোক হইতে সঙ্গীতধ্বনি মর্ত্তালোকে প্রতিধ্বনিত হইল। বুদ্ধের আগমনে সকলেই পুলকিত। চারিদিকে আনন্দের সীমা রহিল না।

সমালোচনা।

সংগ্রহ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। গ্রন্থখানি ছোট ছোট গল্পের সমষ্টি। ইহার অধিকাংশ গল্পই সুপাঠ্য। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহাই লেখকের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার বিষয় নহে। যিনি "শ্যামার কাহিনী" লিখিতে পারেন তাঁহার নিকট হইতে কেবলমাত্র কৌতূহল অথবা বিস্ময়জনক গল্প আমরা প্রত্যাশা করি না। "শ্যামার কাহিনী" গল্পটি আদ্যোপান্ত জীবন্ত এবং মূর্ত্তিমান, ইহার কোথাও বিচ্ছেদ নাই। অন্য গল্পগুলিতে লেখকের নৈপুণ্য থাকিতে পারে কিন্তু এই গল্পেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

লীলা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। লেখক এই গ্রন্থখানিকে "উপন্যাস" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ইহা লইয়াই তাঁহার সহিত আমাদের প্রধান বিরোধ। ইহাতে উপন্যাসের সুসংলগ্নতা নাই এবং গল্পের অংশ অতি যৎসামান্য ও অসম্পূর্ণ। মাঝে মাঝে অনেক অকারণ অনাবশ্যক পরিচ্ছেদ সংযোগ করা হইয়াছে, এবং লেখকের স্বগত-উক্তিও স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ এবং গায়েপড়া গোছের হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই বইখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। বাঙ্গলার গার্হস্থ্য চিত্র ইহাতে উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। গ্রন্থের নাম যদিও

"লীলা" কিন্তু কিরণ ও সুরেশচন্দ্রই ইহার প্রধান আলেখ্য। তাহাদের বাল্যদাম্পত্যের সুকুমার প্রেমাঙ্কুর-উদ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারক্ষেত্রে নানা উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে ঈষৎ মনোবিচ্ছেদের উপক্রম পর্য্যন্ত আমরা আগ্রহের সহিত অনুসরণ করিয়াছি—অন্যান্য আর সমস্ত কথাই যেন ইহার মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে। যাহা হউক্, বইখানি পড়িতে পড়িতে দুই একটি গৃহস্থ ঘর আমাদের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠে। কিরণ, কিরণের মা, দিদিমা, বিন্দুবাসিনী, দাসী, ব্রাহ্মণী, প্রফুল্ল ইহারা সকলেই বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই চেনা লোক, ইহারা বঙ্গগৃহের আত্মীয় কুটুম্ব। কেবল সুরেশচন্দ্রকে স্থানে স্থানে ভাল বুঝিতে পারি নাই এবং লীলা ও আনন্দময়ী তেমন জীবন্তবৎ জাগ্রত হইয়া উঠে নাই। মনোমোহিনী অল্পই দেখা দিয়াছেন কিন্তু কি আবশ্যক উপলক্ষে যে আমরা তাঁহার সাক্ষাৎকার-সৌভাগ্য লাভ করিলাম তাহা বলিতে পারি না; কেবল, পিতৃধন-গর্ব্বিতা রমণীর চিত্রাঙ্কনে প্রলুব্ধ হইয়া লেখক ইহাঁর অনাবশ্যক অবতারণা করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝা যায়।—যদিও গল্পের প্রত্যাশা উদ্রেক করিয়া গ্রন্থকার আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন তথাপি বঙ্গগৃহের উজ্জ্বল চিত্রদর্শনসুখলাভ করিয়া তাঁহাকে আনন্দান্তঃকরণে মার্জ্জনা করিলাম।

রায় মহাশয়। শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন এই গল্পটি খণ্ডশঃ "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইতেছিল তখনি আমরা "সাধনা"য় ইহার প্রশংসাবাদ করিয়াছিলাম। লেখকের ভাষা এবং রচনানৈপুণ্যে আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। তাঁহার লেখার বেশ একটি বাঁধুনি আছে, আবোল তাবোল নাই; লেখক যেন সমস্ত বিষয়টিকে সমস্ত ব্যাপারটিকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিতে পারিয়াছেন; যে একটি নিষ্ঠুর কাণ্ড বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কিছুই যেন তাঁহার হাত এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। জমিদারী সেরেস্তার গোমস্তা মুহুরি হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই যথাযথ পরিমাণে বাহুল্যবর্জ্জিত হইয়া আপন আপন কাজ দেখাইয়া গেছে। এরূপ বাস্তব চিত্র বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

প্রবাসের পত্র। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন। প্রকাশক বঙ্গি-

তেছেন "সাধারণের জন্য পত্রগুলি লিখিত হয় নাই। নবীন বাবু ভ্রমণ-উপলক্ষে যেখানে যাইতেন সেখান হইতে সহধর্ম্মিণীকে পত্র লিখিতেন। পত্রগুলিও তাড়াতাড়ি লেখা। হয়ত রেল্-ওয়ে ষ্টেশনে ট্রেণের অপেক্ষায় বিশ্রামগৃহে বসিয়া আছেন এবং পত্র লিখিতেছেন।"—এই গ্রন্থখানির সমালোচনা অতিশয় কঠিন কার্য্য। কারণ, ইহাকে প্রকাশ্য গ্রন্থ হিসাবে দেখিব, না, পত্র হিসাবে দেখিব ভাবিয়া পাই না। পড়িয়া মনে হয় যেন গোপন পত্র ভ্রমক্রমে প্রকাশ হইয়া গেছে। এ সকল পত্র কবির জীবনচরিতের উপাদানস্বরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে বাহির হইতে পারে ইহাতে এমন কোন বিশেষত্ব নাই। যখন একান্তই গ্রন্থ-আকারে বাহির হইল তখন স্থানে স্থানে বন্ধুবান্ধব ও আত্মসম্বন্ধীয় যে সকল বিশ্রব্ধ কথা আছে সেগুলি বাদ দিলেই ভাল হইত। প্রথম পত্রেই উমেশ বাবু ও মধু বাবুর স্ত্রীর তুলনা আমাদের নিকট সঙ্কোচজনক বোধ হইয়াছে—এমন আরও দৃষ্টান্ত আছে। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজকালকার উচ্ছ্বাসময় লেখামাত্রেই স্থানে অস্থানে "হরি হরি" "মরি মরি" এবং "বুঝি" শব্দ-প্রয়োগের কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায়। উহা আমাদের কাছে কেমন একটা ভঙ্গিমা বলিয়া ঠেকে—প্রথম যে লেখক এই ভঙ্গীটি বাহির করিয়াছিলেন তাঁহাকে কথঞ্চিৎ মার্জ্জনা করা যায়—কিন্তু যখন দেখা যায় আজকাল অনেক লেখকই এই সকল সুলভ উচ্ছ্বাসোক্তির ছড়াছড়ি করিয়া হৃদয়বাহুল্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তখন অসহ্য হইয়া উঠে। নবীন বাবুও যে এই সকল সামান্য বাক্য-কৌশল অবলম্বন করিবেন ইহা আমাদের নিকট নিতান্ত পরিতাপের বিষয় বলিয়া মনে হয়।

অপরিচিতের পত্র। জগতের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া জ-রি নামক প্রচ্ছন্ননামা কোন ব্যক্তি এই পুস্তক ছাপাইয়াছেন। জগৎ ক্ষমা করিবে কি না জানি না কিন্তু আমরা এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিতে পারি না। ইহাতে নির্লজ্জ এবং ঝুঁটা সেণ্টি-মেণ্টালিটির চূড়ান্ত দেখান হইয়াছে। এবং সর্ব্বশেষে আড়-

য়ের-পূর্ব্বক জগতের নিকট ক্ষমাভিক্ষার অভিনয়টি সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য।

প্রকৃতির শিক্ষা। গদ্যে অবিশ্রাম হৃদয়োচ্ছ্বাস বড় অসঙ্গত শুনিতে হয়। গদ্যে যেমন ছন্দের সংযম নাই তেমনি ভাবের সংযম অত্যাবশ্যক—নতুবা তাহার কোন বন্ধন থাকে না, সমস্ত অশোভনভাবে আলুলায়িত হইয়া যায়। গদ্যে যদি হৃদয়-ভাব প্রকাশ করিতেই হয় তবে তাহা পরিমিত, সংযত এবং দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। সমালোচ্য গ্রন্থের আরম্ভ দেখিয়াই ভয় হয়।

"আর পারি না! সংসারের উত্তপ্ত মরুভূমিতে শান্তির পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া আর ঘুরিতে পারি না। প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিতেছে। শুষ্কতার উষ্ণ নিশ্বাসে হৃদয়ের সদ্ভাবকুল শুকাইয়া যাইতেছে, চারিদিকে কঠোরতা, কেবল কঠোরতাই দেখিতেছি। কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না। জীবনটা অত্যন্ত নীরস বোধ হইতেছে। যেন কি হৃদয়হীন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছি, যেন ভাল করিয়া, বুক ভরিয়া নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেছি না। কি যে ভার বুকের উপর চাপিয়া ধরিতেছে, বুঝিতে পারিতেছি না। ... ... আর ভাল লাগে না ছাই সংসার!"

যদি সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে না পারা যায় তবে সাহিত্যে হৃদয়ের ভাব প্রকাশের কোন অর্থ নাই। কারণ, হৃদয়-ভাব চিরপুরাতন, তাহা নূতন সংবাদও নহে এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালকও নহে। তাহা সহস্রবার শুনিয়া কাহারো কোন লাভ নাই। তবে যদি ভাবটিকে অপরূপ নূতন সৌন্দর্য্য দিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায় তবেই তাহা মানবের চিরসম্পত্তিস্বরূপ সাহিত্যে স্থান পায়। এই জন্য ছন্দোময় পদ্য হৃদয়-ভাব প্রকাশের অধিক উপযোগী। ভাবের সহিত একটি সঙ্গীত যোগ করিয়া তাহার অন্তরের চিরনূতন সৌন্দর্য্যটি বাহির করিয়া আনে। কিন্তু সাধারণ গদ্যে হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে গেলে তাহা প্রায়ই নিতান্ত মূল্যহীন প্রগল্‌ভতা হইয়া পড়ে এবং তাহার মধ্যে যদি বা কোন চিন্তাসাধ্য জ্ঞানের কথা থাকে তবে তাহাও উচ্ছ্বাসের ফেণরাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়।

দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী। শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

এ গ্রন্থখানি লিখিবার ভার যোগ্যতর হস্তে সমর্পিত হইলে আমরা সুখী হইতাম। গ্রন্থকার যদি নিজের বক্তৃতা কিঞ্চিৎ ক্ষান্ত রাখিয়া কেবলমাত্র দ্বারকানাথের জীবনীর প্রতি মনোযোগ করিতেন তবে আমরা তাঁহার নিকট অধিকতর কৃতজ্ঞ হইতাম। আমরা মহৎ ব্যক্তির জীবনচরিত পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিব এই আশ্বাসে গ্রন্থখানি পড়িতে বসি, কিন্তু মাঝের হইতে সমাজ ও লোকব্যবহার সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন বাবুর মতামত শুনিবার জন্য আমাদের কি এমন মাথাব্যথা পড়িয়াছে! তিনি যেন পাঠকসাধারণের একটি জ্যেষ্ঠতাত অভিভাবক—একটি ভাল ছেলেকে দাঁড় করাইয়া ক্রমাগত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন "দেখ্ দেখি এ ছেলেটি কেমন! আর তোরা এমন লক্ষ্মীছাড়া হলি কেন!" আমরা দ্বারকানাথ মিত্রকে অন্তরের সহিত ভক্তি করি এই জন্য কালীপ্রসন্ন বাবুর মতামত ও সুমহৎ উপদেশ বাক্যাবলি হইতে পৃথক করিয়া আমরা স্বরূপতঃ তাঁহাকেই দেখিতে ইচ্ছা করি। যাঁহারা বড়লোকের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সসম্ভ্রম বিনয়ের সহিত আপনাকে অন্তরালে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যত্র তাঁহাদের মতের মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু যেখানে বড়লোকের কথা হইতেছে সেখানে থাকিয়া থাকিয়া নিজের কথার প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলে বিরক্তিভাজন হইতে হয়।

সাধনা।

শিক্ষার হের-ফের।*

আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যে নানা অভাব আছে সন্দেহ নাই; দর্শন বিজ্ঞান এবং বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় নাই; এবং সেই কারণে রীতিমত শিক্ষা-লাভ করিতে হইলে বিদেশীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখা যায় না। কিন্তু আমার অনেক সময় মনে হয় সে জন্য আক্ষেপ পরে করিলেও চলে, আপাততঃ শিশুদের পাঠ্য পুস্তক দুই চারিখানি না পাইলে নিতান্ত অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ণবোধ, শিশুশিক্ষা এবং নীতিপুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তাহাকে আমি শিশুদিগের পাঠ্যপুস্তক বলি না।

পৃথিবীর পুস্তকসাধারণকে পাঠ্যপুস্তক এবং অপাঠ্যপুস্তক, প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। টেক্‌ষ্ট্‌বুক-কমিটি হইতে যে সকল গ্রন্থ নির্ব্বাচিত হয় তাহাকে শেষোক্ত শ্রেণীতে গণ্য করিলে অন্যায় বিচার করা হয় না!

কেহ না মনে করেন আমি শুদ্ধমাত্র পরিহাস করিতেছি। কমিটিদ্বারা দেশের অনেক ভাল হইতে পারে; তেলের কল, সুর্‌কির কল, রাজনীতি এবং বারোয়ারি পূজা কমিটির দ্বারা চালিত হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ দেশে সাহিত্য-সম্পর্কীয় কোন কাজ কমিটির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে দেখা যায় নাই। মা সরস্বতী

* রাজসাহী আসোসিয়েশনে পঠিত।

যখন ভাগের মা হইয়া দাঁড়ান তখন তাঁহার সদ্গতি হয় না। অতএব কমিটি-নির্ব্বাচিত গ্রন্থগুলি যখন সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য-রস-বর্জ্জিত হইয়া দেখা দেয় তখন কাহার দোষ দিব? আখ-মাড়া কলের মধ্য দিয়া যে সকল ইক্ষুদণ্ড বাহির হইয়া আসে তাহাতে কেহ রসের প্রত্যাশা করে না; "সুকুমারমতি" হীনবুদ্ধি শিশুরাও নহে।

অতএব, কমিটিকে একটি অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট-বিড়ম্বনাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তৎসম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলেও সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে ব্যবহার্য্য পুস্তকগুলিকে পাঠ্যপুস্তক-শ্রেণী হইতে বহির্ভূত করা যাইতে পারে। ব্যাকরণ, অভিধান, ভূগোল-বিবরণ এবং নীতিপাঠ পৃথিবীর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, তাহারা কেবলমাত্র শিক্ষাপুস্তক।

যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্ম্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভাল করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া পাশ দিয়া কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশুকাল হইতে উর্দ্ধশ্বাসে দ্রুতবেগে, দক্ষিণে বামে দৃক্‌পাত না করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন কিছুর সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলেদের হাতে কোন সখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।

সখের বই জুটিবেই বা কোথা হইতে? বাঙ্গলায় সেরূপ গ্রন্থ নাই। এক রামায়ণ মহাভারত আছে, কিন্তু ছেলেদের এমন করিয়া বাঙ্গলা শেখান হয় না যাহাতে তাহারা আপন ইচ্ছায় ঘরে বসিয়া কোন বাঙ্গলা কাব্যের যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। আবার দুর্ভাগারা ইংরাজিও এতটা জানে না যাহাতে ইংরাজি বাল্যগ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। বিশেষতঃ শিশুপাঠ্য ইংরাজি গ্রন্থ এরূপ খাস্ ইংরাজি, তাহাতে এত ঘরের গল্প ঘরের কথা যে বড় বড় বি-এ এম্-এদের পক্ষেও তাহা সকল সময় সম্পূর্ণরূপ আয়ত্তগম্য হয় না।

কাজেই বিধির বিপাকে বাঙ্গালীর ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ, অভিধান এবং ভূগোলবিবরণ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বাঙ্গালীর ছেলের মত এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই! অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্ব্বন করিতেছে বাঙ্গালীর ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচাসমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাষ্টারের কটুগালি ছাড়া তাহাতে আর কোনরূপ মসলা মিশাল নাই।

তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই

হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধূলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি-এ এম্-এ পাশ করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না। তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত, কথাবার্ত্তা এবং আচার অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মত নহে। সেই জন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।

ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোন মতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।

কিন্তু এই মানসিকশক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙ্গালী কি করিয়া এড়াইবে কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

এক ত, ইংরাজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোন-

প্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়-প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্ব্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়। হয় ত কোন একটা শিশুপাঠ্য reader-এ hay-making সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে, ইংরাজ ছেলের নিকট সে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত, এই জন্য বিশেষ আনন্দদায়ক; অথবা snowball খেলায় Charlie এবং Katieর মধ্যে যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরাজ-সন্তানের নিকট অতিশয় কৌতুকজনক কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগুলা পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনরূপ স্মৃতির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মত করিয়া কিছু দেখিতে পায় না, আগাগোড়া অন্ধভাবে হাতড়াইয়া চলিতে হয়।

আবার নীচের ক্লাসে যে সকল মাষ্টার পড়ায় তাহারা কেহ এণ্ট্রেন্স্ পাস কেহ বা এণ্ট্রেন্স্ ফেল, ইংরাজি ভাষা,ভাব,আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরাজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভাল বাঙ্গলা, না জানে ভাল ইংরাজি; কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে, শিশুদিগকে শিখানো অপেক্ষা ভুলানো ঢের সহজ কাজ, এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করে।

বেচারাদের দোষ দেওয়া যায় না। Horse is a noble animal বাঙ্গলায় তর্জ্জমা করিতে গেলে বাঙ্গলারও ঠিক থাকে না ইংরাজিও ঘোলাইয়া যায়। কথাটা কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায়? ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু, ঘোড়া অতি উঁচুদরের জানোয়ার, ঘোড়া জন্তুটা খুব ভাল—কথাটা কিছুতেই তেমন

মনঃপুত রকম হয় না, এমন স্থলে গোঁজামিলন দেওয়াই সুবিধা। আমাদের প্রথম ইংরাজি শিক্ষায় এইরূপ কত গোঁজামিলন চলে তাহার আর সীমা নাই। ফলতঃ অল্পবয়সে আমরা যে ইংরাজিটুকু শিখি তাহা এত যৎসামান্য এবং এত ভুল যে, তাহার ভিতর হইতে কোনপ্রকারের রস আকর্ষণ করিয়া লওয়া বালকদের পক্ষে অসম্ভব হয়—কেহ তাহা প্রত্যাশাও করে না—মাষ্টারও বলে ছাত্রও বলে, আমার রসে কাজ নাই, টানিয়া বুনিয়া কোন মতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই, পরীক্ষায় পাস হই, আপিসে চাক্‌রি জোটে। সচরাচর যে অর্থটা বাহির হয় তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের এই বচনটি খাটে

"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।"

অর্থকে অনর্থ বলিয়া জানিও, তাহাতে সুখও নাই এবং সত্যও নাই।

তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাকি রহিল কি? যদি কেবল বাঙ্গলা শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত; যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত, গাছে চড়িয়া জলে ঝাঁপাইয়া ফুল ছিঁড়িয়া প্রকৃতি-জননীর উপর সহস্র দৌরাত্ম্য করিয়া শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত। আর ইংরাজি শিখিতে গিয়া না হইল শেখা, না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল। অন্তরে এবং বাহিরে যে দুইটি উদার এবং উন্মুক্ত বিহারক্ষেত্র আছে, মনুষ্য যেখান হইতে জীবন,

বল এবং স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে, যেখানে নানা বর্ণ, নানা রূপ, নানা গন্ধ, বিচিত্র গতি এবং গীতি, প্রীতি ও প্রফুল্লতা সর্ব্বদা হিল্লোলিত হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গসচেতন এবং সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই দুই মাতৃভূমি হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া হতভাগ্য শিশুদিগকে কোন্ বিদেশী কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়? ঈশ্বর যাহাদের জন্য পিতা-মাতার হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চার করিয়াছেন, জননীর কোল কোমল করিয়া দিয়াছেন, যাহারা আকারে ক্ষুদ্র তবু সমস্ত গৃহের সমস্ত শূন্য অধিকার করিয়াও তাহাদের খেলার জন্য যথেষ্ট স্থান পায় না, তাহাদিগকে কোথায় বাল্য যাপন করিতে হয়? বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধানের মধ্যে। যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার এক তিল স্থান নাই তাহারই অতি শুষ্ক কঠিন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে। ইহাতে কি সে ছেলের কথনো মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে? সে কি একপ্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না? সে কি বয়ঃপ্রাপ্তিকালে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে? সে কি কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামী করিতে শেখে না?

এক বয়স হইতে আর এক বয়স পর্য্যন্ত একটা যোগ আছে। যৌবন যে বাল্যকাল হইতে ক্রমশঃ পরিণত হইয়া উঠে এ কথা নূতন করিয়া বলাই বাহুল্য। যৌবনে সহসা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই যখন যাহা আবশ্যক অমনি যে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহা নহে—জীবনের যথার্থ নির্ভর-

যোগ্য এবং একান্ত আবশ্যকীয় জিনিষ হস্তপদের মত আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহারা কোন প্রস্তুত সামগ্রার মত নহে যে, প্রয়োজনের সময়ে অখণ্ড আকারে বাজার হইতে কিনিতে পারা যাইবে।

চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, যদি মানুষের মত মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চ্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না এ কথা অতি পুরাতন।

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধমাত্র ভাষাশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংরাজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণতঃ এত অল্পশিক্ষিত যে ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য ইংরাজি ভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোন কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। এণ্ট্রেন্স্ এবং ফার্ষ্ট-আর্ট্স্ পর্য্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরাজি শিখিতেই যায়; তার পরেই সহসা বি-এ ক্লাসে বড় বড় পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়—তখন সেগুলা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই শক্তিও নাই—সবগুলা মিলাইয়া এক একটা বড় বড় তাল পাকাইয়া একেবারে এক এক গ্রাসে গিলিয়া ফেলিতে হয়।

যেমন যেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছি না, ইহার অর্থ এই যে, স্তূপ উঁচা করিতেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মাণ করিতেছি না। ইঁট, সুরকি, কড়ি বরগা বালি চূণ যখন পর্ব্বত-প্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হুকুম আসিল একটা তেতালার ছাদ প্রস্তুত কর। অমনি আমরা সেই উপকরণস্তূপের শিখরে চড়িয়া দুই বৎসর ধরিয়া পিটা-ইয়া তাহার উপরিভাগ কোনমতে সমতল করিয়া দিলাম, কতকটা ছাদের মত দেখিতে হইল। কিন্তু ইহাকে কি অট্টালিকা বলে? ইহার মধ্যে বায়ু এবং আলোক প্রবেশ করিবার কি কোন পথ আছে, ইহার মধ্যে মনুষ্যের চিরজীবনের বাসযোগ্য কি কোন আশ্রয় আছে, ইহা কি আমাদিগকে বহিঃসংসারের প্রখর উত্তাপ এবং অনাবরণ হইতে রীতিমত রক্ষা করিতে পারে, ইহার মধ্যে কি কোন একটা শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য এবং সুষমা দেখিতে পাওয়া যায়?

মালমস্‌লা যাহা জড় হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালিকা নির্ম্মাণের উপযুক্ত এত ইঁট-পাট্‌কেল পূর্ব্বে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সং-গ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্ম্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয় সেইটেই একটা মস্ত ভুল। সংগ্রহ এবং নির্ম্মাণ যখন একই সঙ্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে তখনি কাজটা পাকা রকমের হয়।

অর্থাৎ সংগ্রহযোগ্য জিনিষটা যখনি হাতে আসে তখনি তাহার ব্যবহারটি জানা, তাহার প্রকৃত পরিচয়টি পাওয়া, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থলটি গড়িয়া তোলাই রীতিমত শিক্ষা। মানুষ একদিকে বাড়িতেছে আর তাহার বিদ্যা আর একদিকে জমা হই-

তেছে, খাদ্য একদিকে ভাণ্ডারকে ভারাক্রান্ত করিতেছে, পাকযন্ত্র আর একদিকে আপনার জারক-রসে আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে—আমাদের দেশে এই একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড চলিতেছে।

অতএব ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে, নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতেই, কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবলি লাঙ্গল দিয়া চাষ এবং মই দিয়া ঢেলাভাঙ্গা, কেবলি ঠেঙ্গা, লাথি, মুখস্থ এবং এক্‌জামিন আমাদের এই "মানব-জনম"-আবাদের পক্ষে আমাদের এই দুর্লভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই শুষ্ক ধূলির সঙ্গে, এই অবিশ্রাম কর্ষণ পীড়নের সঙ্গে রস থাকা চাই। কারণ, মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভাল হয়। তাহার উপর আবার এক একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বৃষ্টি বিশেষরূপে আবশ্যক। সে সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না। বয়োবিকাশেরও তেমনি একটা বিশেষ সময় আছে যখন জীবন্ত ভাব এবং নবীন কল্পনাসকল জীবনের পরিণতি এবং সরসতা সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ঠিক সেই সময়টিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খুব একপসলা বর্ষণ হইয়া যায় তবে "ধন্য রাজা পুণ্য দেশ।" নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের

সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে, যখন নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চারিদিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে, তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্ব্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল সরস এবং পরিণত হইতে পারে—কিন্তু সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধূলি এবং তপ্ত বালুকা, কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও, য়ুরোপীয় সাহিত্যের নব নব জীবন্ত সত্য, বিচিত্র কল্পনা এবং উন্নত ভাবসকল লইয়া দক্ষিণে বামে ফেলাছড়া করিলেও সে আর তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে না, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না।

আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলা কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরী করিয়া মরি, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না। যখন ইংরাজি ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মত বিহার করিতে পারি না। যদি বা ভাবগুলা একরূপ বুঝিতে পারি কিন্তু সেগুলাকে মর্ম্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না; বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না।

এইরূপে বিশ বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা যে সকল ভাব শিক্ষা

করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারি একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আটা দিয়া জোড়া থাকে কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রং মাখিয়া উল্কি পরিয়া পরম গর্ব্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতী বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই, আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে। অসভ্য রাজারা যেমন কতকগুলা শস্তা বিলাতী কাচখণ্ড পুঁথি প্রভৃতি লইয়া শরীরের যেখানে সেখানে ঝুলাইয়া রাখে এবং বিলাতী সাজসজ্জা অযথাস্থানে বিন্যাস করে, বুঝিতেও পারে না কাজটা কিরূপ অদ্ভুত এবং হাস্যজনক হইতেছে, আমরাও সেইরূপ কতকগুলা শস্তা চক্‌চকে বিলিতী কথা লইয়া ঝল্‌মল্ করিয়া বেড়াই এবং বিলাতী বড় বড় ভাবগুলি লইয়া হয়ত সম্পূর্ণ অযথাস্থানে অসঙ্গত প্রয়োগ করি, আমরা নিজেও বুঝিতে পারি না অজ্ঞাতসারে কি একটা অপূর্ব্ব প্রহসন অভিনয় করিতেছি এবং কাহাকেও হাসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ য়ুরোপীয় ইতিহাস হইতে বড় বড় নজীর প্রয়োগ করিয়া থাকি।

বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মত হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।

যখন আমরা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা

যে ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে; আমরা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই; যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্মযাপন করিতেই হইবে সেই সমাজের কোন উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না; আমাদের পিতামাতা, আমাদের সুহৃৎ বন্ধু, আমাদের ভ্রাতাভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না; আমাদের দৈনিক জীবনের কার্য্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোন স্থান পায় না; আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্ম্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোন সঙ্গীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না; তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোন স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যকীয় অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখানে হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে, বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরাণীগিরি অথবা কোন একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্ধুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্ধুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোন ব্যবহার নাই, ইহা বর্ত্ত-

মান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। এ জন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থ-জগৎ এক প্রান্তে, আর তাহাদের বসতিজগৎ অন্য প্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ অভিধানের সেতু। এই জন্য, যখন দেখা যায় একই লোক একদিকে যুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যদিকে চিরকুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন, একদিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্যদিকে অধীনতার শতসহস্র লূতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতিমুহূর্ত্তে আচ্ছন্ন ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছেন, একদিকে বিচিত্র-ভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্যদিকে জীবনকে ভাবের উচ্চশিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না, কেবল ধনোপার্জ্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি-সাধনেই ব্যস্ত, তখন আর আশ্চর্য্য বোধ হয় না। কারণ, তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনো সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।

তাহার ফল হয় এই, উভয়ে উভয়ের প্রতি উত্তরোত্তর বাম হইতে থাকে। যেটা আমাদের শিক্ষিত বিদ্যা, আমাদের জীবন ক্রমাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া চলাতে সেই বিদ্যাটার প্রতিই আগাগোড়া অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে। মনে হয়, ও জিনিষটা কেবল ভুয়া এবং সমস্ত যুরোপীয় সভ্যতা ঐ ভুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যাহা আছে তাহা সমস্তই সত্য এবং আমাদের শিক্ষা যে দিকে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে সে দিকে সভ্যতা নামক একটি মায়াবিনী মহামিথ্যার সাম্রাজ্য। আমাদের অদৃষ্টক্রমে বিশেষ কারণবশতই যে আমাদের শিক্ষা

আমাদের নিকট নিষ্ফল হইয়া উঠিয়াছে তাহা না মনে করিয়া আমরা স্থির করি, উহার নিজের মধ্যে স্বভাবতই একটা বৃহৎ নিষ্ফলতার কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপে আমাদের শিক্ষাকে আমরা যতই অশ্রদ্ধা করিতে থাকি আমাদের শিক্ষাও আমাদের জীবনের প্রতি ততই বিমুখ হইতে থাকে, আমাদের চরিত্রের উপর তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না—এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে, প্রতি মুহূর্ত্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙ্গালীর সংসার-যাত্রা দুই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপে জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কাল যে শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরকাল আমাদের জীবনের সহিত অসংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষালাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যাথার্থ্য লাভ করিতে পারিব!

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্ব্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাঙ্গলা ভাষা, বাঙ্গলা সাহিত্য। যখন প্রথম বঙ্কিম বাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মত আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? য়ুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোন নূতন তত্ত্ব নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজি শিক্ষা ও আমাদের

অন্তঃকরণের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল—বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দসম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল। প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার সুদূর সাক্ষাৎলাভ হইত, বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্য্যমুখী কমলমণিরূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙ্গালী পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমারশ্মি নিপতিত হইল।

বঙ্গদর্শন সেই যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাঙ্গলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরাজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে যে, যদিও আমরা শৈশবাবধি এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্ত্তমান স্থায়ী সাহিত্য যাহা কিছু তাহা বাঙ্গলা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, বাঙ্গালী কখনই ইংরাজি ভাষার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ভাবে পরিচিত হইতে পারে না যাহাতে সাহিত্যের স্বাধীন ভাবোচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে সহজে প্রকাশ করিতে পারে। যদি বা ভাষার সহিত তাহার তেমন পরিচয় হয় তথাপি বাঙ্গালীর

ভাব ইংরাজের ভাষায় তেমন জীবন্তরূপে প্রকাশিত হয় না। যে সকল বিশেষ মাধুর্য্য, বিশেষ স্মৃতি আমাদিগকে প্রকাশচেষ্টায় উত্তেজিত করে, যে সকল সংস্কার পুরুষানুক্রমে আমাদের সমস্ত মনকে একটা বিশেষ গঠন দান করিয়াছে, তাহা কখনই বিদেশী ভাষার মধ্যে যথার্থ মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

অতএব আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখনি ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তখনি বাঙ্গলা ভাষা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের একটা কাতরতা জন্মে। কিন্তু হায়, অভিমানিনী ভাষা, সে কোথায়! সে কি এত দীর্ঘকাল অবহেলার পর মুহূর্ত্তের আহ্বানে অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য, তাহার সমস্ত গৌরব লইয়া একজন শিক্ষাভিমানী গর্ব্বোদ্ধত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে? হে সুশিক্ষিত, হে আর্য্য, তুমি কি আমাদের এই সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার যথার্থ মর্য্যাদা জান! ইহার কটাক্ষে যে উজ্জ্বল হাস্য,যে অশ্রুম্লান করুণা,যে প্রখর তেজ-স্ফুলিঙ্গ, যে স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি স্ফূরিত হয় তাহার গভীর মর্ম্ম কি কখনো বুঝিয়াছ, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছ? তুমি মনে কর, আমি যখন মিল, স্পেন্সার পড়িয়াছি, সব কটা পাশ করিয়াছি, আমি যখন এমন একজন স্বাধীন চিন্তাশীল মেধাবী যুবাপুরুষ, যখন হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ আপন কুমারী কন্যা এবং যথাসর্ব্বস্ব লইয়া আমার দ্বারে আসিয়া সাধ্যসাধনা করিতেছে, তখন ঐ অশিক্ষিত সামান্য গ্রাম্য লোকদিগের ঘরের তুচ্ছ ভাষা-টার উচিত ছিল আমার ইঙ্গিতমাত্রে আমার শরণাপন্ন হইয়া কৃতকৃতার্থ হওয়া। আমি যে ইংরাজি পড়িয়া বাঙ্গলা লিখি ইহা অপেক্ষা বাঙ্গলার সৌভাগ্য কি হইতে পারে! আমি যখন ইংরাজি ভাষায় আমার অনায়াসপ্রাপ্য যশ পরিহার করিয়া

আমার এত বড় বড় ভাব এই দরিদ্র দেশে হেলায় বিসর্জ্জন দিতেছি, তখন, জীর্ণবস্ত্র দীন পান্থগণ রাজাকে দেখিলে যেমন সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়, তেমনি আমার সম্মুখ হইতে সমস্ত তুচ্ছ বাধাবিপত্তির শশব্যস্ত হইয়া সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। একবার ভাবিয়া দেখ আমি তোমাদের কত উপকার করিতে আসিয়াছি, আমি তোমাদিগকে পোলিটিক্যাল ইকনমি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিতে পারিব, জীবরাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ পর্য্যন্ত এভোল্যুশনের নিয়ম কিরূপে কার্য্য করিতেছে তৎসম্বন্ধে আমি যাহা শিখিয়াছি তাহা তোমাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ গোপন করিব না, আমার ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধের ফুটনোটে নানা ভাষার দুরূহ গ্রন্থ হইতে নানা বচন ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে পারিব, এবং বিলাতী সাহিত্যের কোন্ পুস্তক সম্বন্ধে কোন্ সমালোচক কি কথা বলেন তাহাও বাঙ্গালীর অগোচর থাকিবে না। কিন্তু যদি তোমাদের এই জীর্ণচীর অসম্পূর্ণ ভাষা আদেশমাত্র অগ্রসর হইয়া আমাকে সমাদর করিয়া না লয় তবে আমি বাঙ্গলায় লিখিব না, আমি ওকালতী করিব, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইব, ইংরাজী খবরের কাগজে লীডার লিখিব, তোমাদের যে কত ক্ষতি হইবে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

বঙ্গদেশের পরম দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার এই লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া এমন সকল ভাল ভাল ছেলের সমাদর করে না এবং ভাল ছেলেরাও রাগ করিয়া বাঙ্গলা ভাষার সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না। এমন কি, বাঙ্গলায় চিঠিও লেখে না, বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যতটা পারে বাঙ্গলা হাতে রাখিয়া ব্যবহার করে এবং বাঙ্গলা গ্রন্থ

অবজ্ঞাভরে অন্তঃপুরে নির্ব্বাসিত করিয়া দেয়। ইহাকে বলে লঘু পাপে গুরুদণ্ড।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। একথাও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকট-সংসর্গ আমরা লাভ করিনা এবং সেই জন্যই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকে য়ুরোপীয় ভাবসকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যদিকেও তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ়-সম্বন্ধরূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে। বাঙ্গলা তাঁহারা জানেন না সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকার না করিয়া তাঁহারা বলেন "বাঙ্গলায় কি কোন ভাব প্রকাশ করা যায়! এ ভাষা আমাদের মত শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে!" প্রকৃত কথা, আঙুর আয়ত্তের অতীত হইলে তাহাকে টক বলিয়া উপেক্ষা, আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি।

যে দিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায়, আমাদের ভাব, ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে। মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্ফল হইতেছে, আপনার মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্যলাভ করিয়া বলিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যখন যেটি আবশ্যক তখন সেটি হাতের কাছে পাইতেছে না। একটি গল্প আছে, একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অল্প অল্প ভিক্ষা সঞ্চয়

করিয়া যখন শীতবস্ত্র কিনিতে সক্ষম হইত তখন গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িত, আবার সমস্ত গ্রীষ্মকাল চেষ্টা করিয়া যখন লঘুবস্ত্র লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি—দেবতা যখন তাহার দৈন্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন সে কহিল— আমি আর কিছু চাহি না, আমার এই হের-ফের ঘুচাইয়া দাও! আমি যে সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীষ্মের সময় শীতবস্ত্র এবং শীতের সময় গ্রীষ্মবস্ত্র লাভ করি এইটে যদি একটু সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হয়।

আমাদেরও সেই প্রার্থনা। আমাদের হের-ফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবস্ত্র কেবল একত্র করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈন্য, নহিলে আছে সকলি। এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও। আমরা আছি যেন—

পানীমে মীন পিয়াসী
শুনত শুনত লাগে হাসি।

আমাদের পানীও আছে পিয়াসও আছে, দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।

লোক-চেনা।

বাৎসল্য।

কেহ কেহ মনে করেন, বাৎসল্য দয়া-বৃত্তিরই প্রকার-ভেদ মাত্র। কিন্তু এ কথা ঠিক্ নহে। ইহা একটি স্বতন্ত্র অনন্যোৎপন্ন বৃত্তি। এই বৃত্তিটিও মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। কানের উপর দিয়া একটা রেখা যদি মাথার পশ্চাদ্ভাগের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত টানা যায়, তাহা হইলে এই বৃত্তি-স্থানে উপনীত হওয়া যায়। ডাক্তার গল্ দেখিলেন যে, মস্তকের এই অংশটি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অধিক দীর্ঘ; তিনি অনুমান করিলেন, ঐ স্থানে এমন কোন বৃত্তি অবশ্য থাকিবে যাহা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের স্বভাবতঃ বলবতী—সে বৃত্তিটি কি? অনেক চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে, একদিন বানরের মস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিলেন, মাথার ঐ অংশে বানর-জাতির সহিত স্ত্রীলোকদিগের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। বানর-জাতির ন্যায় কোন্ বৃত্তি স্ত্রীলোকদিগের বলবতী এই কথা মনে মনে ক্রমাগত আন্দোলন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একদিন তাঁহার মনে উদয় হইল বাৎসল্যের আধিক্য সম্বন্ধে উহাদের উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। বানরজাতির শিশু-স্নেহ যে অত্যন্ত প্রবল তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বানরেরা কুকুর বিড়াল প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় পশুর বাচ্চাকেও নিজের বাচ্চার ন্যায় লালনপালন করে। ডাক্তার গল্ তাহার পর বিভিন্ন জাতীয় পশুদিগের মাথা মিলাইয়া দেখিলেন যে, তাহাদের মধ্যেও পুরুষজাতি অপেক্ষা

স্ত্রীজাতির মাথার ঐ অংশটি অধিক পরিপুষ্ট। এইরূপে অনেক পরীক্ষা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন মস্তকের ঐ অংশই বাৎসল্য-বৃত্তির স্থান।

যাহাদের বাৎসল্য-বৃত্তি বলবতী, শিশুরা তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই কেমন চিনিতে পারে—তাহাদেরই প্রতি তাহারা অধিক অনুরক্ত হয়। কেহ কেহ শিশুর পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে শিশুকে আদর করে—কিন্তু তাহার কৃত্রিমতা সহজেই উপলব্ধি হয়। বাস্তবিক যাহার বাৎসল্য আছে তাহার চোখে মুখে কথাবার্ত্তায় তাহা ফুটিয়া বাহির হয়। দয়াবৃত্তি-সহযোগে যাহার বাৎসল্য প্রবল, সে রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ভালরকম করিতে পারে। যাহার বাৎসল্য প্রবল এইরূপ লোক দেখিয়াই শিশুদিগের শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত। যাহাদের এই বৃত্তি অতীব বলবতী অথচ বুদ্ধি বিবেচনা কম, তাহারা নিজের ছেলেদিগকে বেশী মাত্রায় আদর দিয়া খারাপ করে, তাহাদের জন্য অকারণ নানাপ্রকার উদ্বেগ মনে স্থান দেয় এবং তাহাদের বিবিধ কল্পিত গুণের জন্য তাহাদের মনে অপরিসীম গর্ব্ব উৎপন্ন হয়। আবার, যাহাদের এই বৃত্তি নিতান্ত কম, তাহারা আপনার ছেলেদের বড় দেখে শোনে না—অন্যের হাতে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। এই সঙ্গে যাহাদের দয়া ও অন্যান্য ধর্ম্মবৃত্তি কম এবং জিঘাংসা প্রভৃতি পাশববৃত্তি প্রবল তাহারা নিজ সন্তানের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ডাক্তার গল্ ও স্পুর্জ্জেম উনত্রিশ জন শিশুঘাতিনীর মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে তাহার মধ্যে পঁচিশ জনের বাৎসল্য-বৃত্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। ডাক্তার গল্ বলেন যে এই বৃত্তির ক্ষীণতা হইতেই যে শিশুহত্যার প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় এরূপ নহে—

কিন্তু এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে,যাহার এই বৃত্তি ক্ষীণভাবাপন্ন সে প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারে না। যে জননীর এই বৃত্তি বলবতী,হাজার প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলেও—হাজার প্রলোভনে পড়িলেও—তাহার অপরাজিত স্নেহ অবশেষে জয়ী হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষের মাথা অপেক্ষাকৃত চওড়া ও গোল দেখায়, স্ত্রীলোকের মাথার গঠন একটু সরু ও লম্বাটে; কতকটা তার কারণ, বাৎসল্য-বৃত্তি-স্থান স্ত্রীলোকের বেশী বাহির-করা বলিয়া মস্তক ঈষৎ দীর্ঘ মনে হয়। স্ত্রীপুরুষের ভ্রূণাবস্থাতেও এই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বালকবালিকাদের স্বভাবেও এই বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি হয়। অতি শিশুকাল হইতেই বালিকাদের পুতুল ও শিশু-সন্তানের উপর টান এবং বালকদিগের ঘোড়-দৌড় প্রভৃতি ক্রীড়ার প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। ইহার ব্যতিক্রমস্থলও আছে। কোন কোন পুরুষের বাৎসল্য স্ত্রীজাতির ন্যায় প্রবল এবং কোন কোন স্ত্রীলোকের বাৎসল্য অত্যন্ত ক্ষীণভাবাপন্ন। যে সকল পুরুষের বাৎসল্য এইরূপ প্রবল, তাহাদিগের সন্তানাদি না হইলে তাহারা অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয় এবং নিজ বন্ধ্যা স্ত্রীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

কোন কোন জাতির মধ্যে বাৎসল্য অত্যন্ত প্রবল—যেমন, কাফ্রিজাতি। তাহাদের মধ্যে শিশুহত্যা অতি বিরল। এই বৃত্তিটি তাহাদের পুরুষদের মধ্যেও প্রবল। প্রায় দেখা যায়, কাফ্রি পুরুষেরা শিশুসন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ভার লইতে অগ্রসর। ডাক্তার প্যাটর্সন্ বলেন, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, হিন্দুদিগের মধ্যেও এই ভাবটি খুব বলবৎ। বারোটি হিন্দুর মাথার খুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল, উহার মধ্যে এগারটির বাৎসল্য-

বৃত্তি বলবতী। উন্মাদ-রোগ মস্তিষ্কের এই স্থানটি অধিকার করিলে বাৎসল্যের বিকৃত আবির্ভাব কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। ডাক্তার আন্‌ক্রু কোম্‌ব্‌ একজন উন্মাদগ্রস্তা স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করিতেছিলেন, সেই স্ত্রীলোকটি ক্রমাগত নিজ সন্তানদের কথা বলিত—তাহার মনে হইত যেন তাহার সন্তানদিগকে হত্যা করা হইয়াছে, তাহাদের যৎপরোনাস্তি কষ্ট দেওয়া হইতেছে ইত্যাদি। যখন সে আরোগ্যলাভ করিল তখন সে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, কেবল মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে যে স্থানটিতে বেদনা উপস্থিত হইত তাহা অঙ্গুলী-নির্দর্শনে দেখাইয়া দিল। ডাক্তার দেখিলেন, সেই স্থানটি বাৎসল্য-বৃত্তির স্থান। ডাক্তার গল্‌ একজন উন্মাদগ্রস্তা রোগীর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সে ক্রমাগত বলিত, তাহার ছয়টি সন্তান শীঘ্র এককালে প্রসূত হইবে। তাহার মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, বাৎসল্য-বৃত্তির স্থানটি তাহার অত্যন্ত বৃহৎ। আর এক হাসপাতালে একজন উন্মাদগ্রস্ত পুরুষ দেখিয়াছিলেন, সে বলিত তাহার পেটে যমক ছেলে আছে। তাহার মস্তকেও বাৎসল্যবৃত্তির স্থানটি অত্যন্ত পরিপুষ্ট ছিল।

যাহার বাৎসল্য প্রবল, সে শিশুদের সঙ্গে থাকিতে ভালবাসে, তাহাদের সহিত খেলাধূলা করে—নিজ সন্তানের শিক্ষার জন্য সকলপ্রকার কষ্ট সহ্য করে। তাহার যদি সেই সঙ্গে আসঙ্গ-লিপ্সা প্রবল হয় তবে নিজ সন্তানবিয়োগে অসহ্য কষ্ট অনুভব করে। এবং যদি তাহার মগ্নচিত্ততা বেশি থাকে তবে সে শোক শীঘ্র ভুলিতে পারে না। যদি মগ্নচিত্ততা কম হয় তবে কিছু কালের জন্য কষ্ট পায়, পরে অন্য ভাব মনকে অধিকার করে। যদি প্রীতি বিধিৎসা ও জিঘাংসা মাঝামাঝি হয় এবং

আসঙ্গলিপ্সা, দয়া, সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ বলবতী হয়, তবে সে ব্যক্তি সন্তানের মঙ্গলার্থেই তাহাদিগকে শাসন করিবে—দয়ালু অথচ কড়াক্কড়; মৃদুতা ও স্নেহ-সহযোগে দৃঢ়তার সহিত নিজ সন্তানগণকে সে শাসন করিয়া থাকে। আত্ম-মর্য্যাদা প্রবল হইলে সে প্রভুত্বসহকারে এমন করিয়া তাহাদিগের সহিত কথা কহে যে, সন্তানেরা তাহার কথা পালন না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু যাহার এই আত্মমর্য্যাদা কম, সে আপনার প্রভুত্ব সন্তানদিগের নিকট বজায় রাখিতে পারে না। যাহার বাৎসল্যের সঙ্গে প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসাও প্রবল, সে পর্য্যায়ক্রমে কখন সন্তানদিগকে বেশী মাত্রায় আদর দিয়া থাকে এবং কখনও বা অতিমাত্রায় কঠোর ভাব ধারণ করে। যাহাদিগের প্রশংসা-লালসা ও ভাবুকতা অত্যন্ত প্রবল, তাহারা সন্তানদিগকে এইরূপ ভাবে শিক্ষা দেয় যাহাতে লোকের কাছে চটক্ লাগিতে পারে। কিন্তু যাহাদের ধর্ম্মবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, দৃঢ়তা প্রভৃতি সমধিক, তাহারা সারবান ও তেজো শিক্ষার পক্ষপাতী।

ছুটি।

বালকদিগের সর্দ্দার ফটিক চক্রবর্ত্তীর মাথায় চট্ করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল, স্থির হইল সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে। যে ব্যক্তির কাঠ, আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল। কোমর বাঁধিয়া সকলেই

যখন মনোযোগের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করি-তেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল। একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল "দেখ্, মার খাবি! এই বেলা ওঠ্!" সে তাহাতে আরও একটু নড়িয়া চড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল। এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কসাইয়া দেওয়া ফটি-কের কর্ত্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল যেন ইচ্ছা করিলেই এখনি উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে; কিন্তু করিল না, কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা আর একটা ভাল খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর একটু বেশী মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে শুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক্। মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনু-ষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিম্বা আর কাহারও মনে উদয় হয় নাই। ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল—মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো। গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে না ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য্য, গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞানসমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল। খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা

বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল— মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্দ্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপ্‌চাপ্ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল। এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্দ্ধ-বয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "চক্রবর্ত্তীদের বাড়ি কোথায়?" বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল "ওই হোথা।" কিন্তু কোন্ দিকে যে নির্দ্দেশ করিল কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না। ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথা?" সে বলিল "জানিনে।" বলিয়া পূর্ব্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্ত্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগ্‌দি আসিয়া কহিল "ফটিক দাদা, মা ডাক্‌চে।" ফটিক কহিল "যাব না।" বাঘা তাহাকে বলপূর্ব্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কহিলেন "আবার তুই মাখনকে মেরেচিস্!" ফটিক কহিল "না মারিনি!" "ফের মিথ্যে কথা বল্‌চিস্!" "কখ্‌খনো মারিনি! মাখনকে জিজ্ঞাসা কর।" মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল "হাঁ মেরেচে।" তখন আর

ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় বসাইয়া দিয়া কহিল "ফের মিথ্যে কথা!" মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল। মা চীৎকার করিয়া কহিলেন "অঁ্যা, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস্!" এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন "কি হ'চ্চে তোমাদের!"

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন "ওমা, এ যে দাদা! তুমি কবে এলে!" বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন। বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে; তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। যাহা হৌক্, বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভর বাবু তাঁহার ভগ্নীকে দেখিতে আসিয়াছেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই এক দিন পূর্ব্বে বিশ্বম্ভর বাবু তাঁহার ভগ্নীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন। তাঁহার ভগ্নী কহিলেন "ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।" শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন। ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?" ফটিক লাফা-

ইয়া উঠিল, বলিল "যাব।" যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে সর্ব্বদাই আশঙ্কা ছিল কোন্ দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয়, কি মাথাই ফাটায়, কি, কি একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন। "কবে যাবে" "কখন্ যাবে" করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্য্যবশতঃ তাহার ছিপ ঘুড়ি লাঠাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পূরা অধিকার দিয়া গেল।

কালকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমতঃ মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়! বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল কিন্তু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে!

বিশেষতঃ তেরো চোদ্দ বৎসরের ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোন কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধ-আধ কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি, এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা

তাহার একটা কুশ্রী স্পর্দ্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সে জন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের একটা স্বাভাবিক অনিবার্য্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়। সেও সর্ব্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এই জন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিম্বা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ, সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মত হইয়া যায়।

অতএব এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোন অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মত বিঁধে। এই বয়সে সাধারণতঃ নারীজাতিকে কোন এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়। মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মত প্রতিভাত হইতেছে এইটে তাহাকে সবচেয়ে বাজিত। মামী যদি দৈবাৎ তাহাকে কোন একটা কাজ করিতে বলিত, তাহা হইলে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশী কাজ করিয়া ফেলিত, অবশেষে মামী যখন

তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন "ঢের হয়েচে, ঢের হয়েচে! ওতে আর তোমার হাত দিতে হবে না! এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে! একটু পড়গে যাও!" তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামীর এতটা যত্ন অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আট্‌কা পড়িয়া কেবলি তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত। প্রকাণ্ড একটা ধাউস্ ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, "তাইরে নাইরে নাইরে না" করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্ম্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সঙ্কীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত। জন্তুর মত একপ্রকার অবুঝ ভালবাসা—কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলি সময়ের মাতৃহীন বৎসরে মত কেবল একটা আন্তরিক মা মা ক্রন্দন—সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলি আলোড়িত হইত। স্কুলে এত বড় নির্ব্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত, মাষ্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারক্লান্ত গর্দ্দভের মত নীরবে সহ্য করিত, ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত তখন জানলার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কোন একটা ছাদে দুটি একটি

ছেলে মেয়ে কি-একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত। একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল— "মামা, মার কাছে কবে যাব?" মামা বলিয়াছিলেন "স্কুলের ছুটি হোক।" কার্ত্তিক মাসে পূজার ছুটি সে এখনো ঢের দেরী।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একেত সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাষ্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোন অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্ব্বক বেশী করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত। অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মত গিয়া কহিল "বই হারিয়ে ফেলেচি," মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "বেশ করেচ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে' বই কিনে দিতে পারিনে!" ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল, নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেইরাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সির্‌সির্ করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী

এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের স্বরূপ দেখিবে তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্ম্মণ্য অদ্ভুত নির্ব্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দ্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভর বাবু পুলিষে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভর বাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনও ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দুইজন পুলিষের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভর বাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদমস্তক ভিজা, সর্ব্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভর বাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মামী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্ম্মভোগ! দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও!" বাস্তবিক, সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালরূপ আহারাদি হয় নাই, এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিট্‌খিট্‌ করিয়াছেন। ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল "আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেচে।"

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর বাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন। ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়ি-কাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল "মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি?" বিশ্বম্ভর বাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন, ফটিক আবার বিড়বিড় করিয়া বকিতে লাগিল—বলিল "মা, আমাকে মারিস্‌নে মা। সত্যি বল্‌চি আমি কোন দোষ করিনি।"

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাঁহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। বিশ্বম্ভর বাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "ফটিক, তোর মাকে আন্‌তে পাঠিয়েচি।"

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন অবস্থা বড়ই খারাপ। "আজ রাতটা যদি কেটে যায় ত কালকের দিনটা আবার একটু ভাল হতে পারে" বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। বিশ্বম্ভর বাবু স্তিমিত প্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাষীদের মত সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল "এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে—এ-এ না।" কলি-কাতায় আসিবার সময় খানিকটা রাস্তা ষ্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাষীরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া করিয়া জল মাপিত;

ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উচ্চ কলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহু-কষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন "ফটিক, সোনার মাণিক আমার!" ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল "অ্যাঁ।" মা আবার ডাকিলেন "ওরে ফটিক্, বাপধনরে!"

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

বুদ্ধচরিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বুদ্ধের অলৌকিক জন্ম।

পাঠকদের স্মরণ থাকিবে যে জয়সেনের এক পুত্র এবং এক কন্যা ছিল। পুত্রের নাম সিংহহনু এবং কন্যার নাম যশোধরা। সিংহহনুর পুত্র শুদ্ধোদন এবং যশোধরার দুই কন্যা মায়াদেবী এবং মহাপ্রজাপতি। এই দুই কন্যার সহিত শুদ্ধোদনের বিবাহ হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শাক্যবংশের বিবাহ কোলি

বা ব্যাঘ্রপুর-বংশের সহিত হইত। সুতরাং শুদ্ধোদন আপনার পিসির দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

কিছুকাল গত হইলে অবশেষে যখন প্রসবের সময় নিকটবর্ত্তী হইল তখন মায়াদেবী আপনার স্বামীকে বলিলেন—আমি পিত্রালয়ে যাইব; সেখানে জননী ও বন্ধুবান্ধবদিগের মুখ দেখিয়া ভাল থাকিব। শুদ্ধোদন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ব্যাঘ্রপুরে পাঠাইবার সমুদায় আয়োজন করিলেন। ব্যাঘ্রপুর কপিলবস্তু হইতে চারি ক্রোশ পূর্ব্বদিকে। মধ্যবর্ত্তী পথসকল পরিষ্কার করিয়া সমতল করিয়া দেওয়া হইল; পথের দুই পার্শ্বে কদলীবৃক্ষ রোপিত হইল; নির্ম্মল জলপূর্ণ কলসসকল মধ্যে মধ্যে স্থাপিত হইল। মায়াদেবী এক স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়া পিত্রালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সহস্র ভদ্রবংশোদ্ভূত কর্ম্মচারী তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন।

ব্যাঘ্রপুর এবং কপিলবস্তুর মধ্যে এক প্রকাণ্ড শালবন ছিল তাহাকে লুম্বিনীর উদ্যান বলিত। কার্লাইল সাহেব এই স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে এখনও অসংখ্য শালবৃক্ষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। পথিমধ্যে মায়াদেবী বৃক্ষদিগের সৌন্দর্য্য দেখিয়া রথ থামাইতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি বলিলেন—আমাকে একটি বৃক্ষের নিকটে লইয়া যাও, আমি উহার একটি শাখা লইব। তৎপরে রথ হইতে নামিয়া নিজ ভগ্নী প্রজাপতিকে সঙ্গে লইয়া তিনি একটি পাকীর উপর বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলে পর তিনি ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইয়া বৃক্ষ হইতে একটি শাখা ভাঙ্গিয়া লইলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়। অনুচরবর্গ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের চতুর্দ্দিক আবরণ করিয়া দিল এবং কথিত আছে যে সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার দক্ষিণ দিক

ভেদ করিয়া একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। এই সময়ে মায়াদেবীর বয়স ছাপ্পান্ন বৎসর ছিল।

বুদ্ধের এইরূপে জন্ম হয় একথা সকল বৌদ্ধ পুস্তকেই লিখিত আছে। পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ কথার অর্থ কি? বাস্তবিক কি এইপ্রকার জন্ম হইয়াছিল? তবে কি অনৈসর্গিক ঘটনাসকল আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে? বুদ্ধের জন্মবর্ণনা কি কল্পনা নহে? ইহা কি সর্ব্বৈব মিথ্যা নহে? পাঠক কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। কেহ কেহ বলেন যে, ধর্ম্ম-ইতিহাসের সমুদায় কথা বিশ্বাস করিতে হইলে শৈশবাবস্থায় পিতামহীর নিকট যে সকল উপকথা শুনা যায় তাহাও বিশ্বাস করিতে হয়। অতএব অনেক প্রসিদ্ধ লেখক এই সকল ইতিহাস পাঠকালে অনৈসর্গিক অংশ সমুদায় বাদ দিয়া লন। আমাদিগের মতে এরূপ করিলে ইতিহাসের সমুদায় মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। বাস্তবিক কি এই সকল অনৈসর্গিকতার কোন অর্থ নাই? আমরা নিজে অলৌকিক ঘটনা কিছুমাত্র মানি না। ভগবান যে তাঁহার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পৃথিবীকে আপনার সর্ব্বশক্তিমত্তা দেখান তাহা আমরা স্বীকার করি না। বিশ্বমণ্ডলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শক্তি-সমূহ সঞ্চিত আছে। সেই শক্তিসকল নিজ নিজ কার্য্য করিবেই করিবে। উত্তাপশক্তি উত্তাপ দিবেই দিবে, মাধ্যাকর্ষণশক্তি আকর্ষণ করিবেই করিবে, তাড়িৎশক্তি চমকিত করিবেই করিবে। কিন্তু এই সমুদায় শক্তি ভগবানের হাতে। তিনি এক শক্তি দিয়া আর এক শক্তিকে নিবৃত্ত করেন। এক অভিপ্রায় সাধনে নানা শক্তি নিযুক্ত করিয়া একটাকে আর একটা দিয়া কার্য্য করাইয়া লয়েন। আমরা গৃহোপরি ছাদ নির্ম্মাণ করিতে গেলে ছাদটি পড়িয়া যাইবে না বলিয়া দেয়ালের উপর বড় বড়

কড়িকাঠ বসাইয়া দিই, তাহাতে মাধ্যাকর্ষণশক্তির নিবৃত্তি হয়। ভগবান সেইরূপ শক্তিসমূহকে পরস্পর পরস্পরের বিরোধী করিয়া একটি উদ্দেশ্য সাধন করাইয়া লন। যদি তাঁহার এমন ইচ্ছা হয় যে অগ্নির দাহিকা-শক্তি থাকিবে না, একজন লোককে অগ্নিতে ফেলিয়া দিলেও সে অগ্নিতে পুড়িবে না, ভগবান এমন একটি বিপরীত শক্তি সেই লোকের ভিতর আনিয়া দিতে পারেন যাহার বলে অগ্নির দাহিকা-শক্তির নিবৃত্তি হইবে। এইরূপ হইতে পারে, কিন্তু ইহা অনৈসর্গিক হইল না। স্বাভাবিক শক্তিসমূহ দিয়া ভগবান নিজ অভিপ্রায়সকল সিদ্ধ করিয়া লন। আমরা সেই জন্য বলি যে অনৈসর্গিক ঘটনা পৃথিবীতে কখনও হইতে পারে না। কেননা অনৈসর্গিক কথার অর্থ স্বভাবের নিয়মভঙ্গ। ভগবান যেমন পাপ করিতে পারেন না, তেমনি তিনি নিজের নিয়মভঙ্গ করিতেও পারেন না। তিনি সূর্য্যকে বলিতে পারেন না তোমার গতি স্থগিত কর। তেমনি তিনি স্বাভাবিক নিয়ম অতিক্রম করিয়া ইহা বলিতে পারেন না যে, একজন শিশু জননীর দক্ষিণ দিক হইতে নির্গত হইয়া জন্মগ্রহণ করুক। ভগবানের যদি কোন বিশেষ অভিপ্রায় থাকে তিনি তাঁহার নিজ নিয়ম-দ্বারা, প্রাকৃতিক শক্তির পরস্পর নিবৃত্তিদ্বারা তাহা সিদ্ধ করিয়া লইবেন। কিন্তু যাহা চিরকাল হইয়া আসিতেছে, যে নিয়ম প্রকৃতিতে সন্নিহিত আছে, তাহার ব্যতিক্রম কখন হয় নাই, এখন হইতেছে না এবং কখন হইবে না। বুদ্ধের জন্মকাহিনী সেই জন্য মিথ্যা—ইহা স্থির হইল। অথচ সকল বৌদ্ধেরাই মিথ্যা হইলেও ইহা মানিয়া লইয়াছেন ইহার অর্থ কি?

মায়াদেবীর প্রসব সঞ্চার হইবার সময়ে আমরা বলিয়াছি যে তখন নানাপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার

মধ্যে একটি ব্যাপার এই যে আকাশে পদ্মফুল ফুটিয়াছিল। এখন পাঠকেরা বলুন দেখি যে বাস্তবিক পদ্মফুল ফুটিয়াছিল কি না? আমরা বলি ফুটিয়াছিল। কোথায়? আমরা বলিব ভক্তের হৃদয়-আকাশে। প্রতি পদার্থকে আমরা দুই ভাবে ভাবিতে পারি। একটি সেই পদার্থের দিক হইতে, আর একটি ভাবের দিক হইতে। একজন লোক প্রফুল্লভাবে সদা বিচরণ করে, সে তাহার বন্ধুর মুখকেও প্রফুল্ল দেখে। অন্য একজন লোক সদা বিমর্ষ থাকে, সে সেই বন্ধুকেই বিমর্ষ দেখে। বলুন দেখি, সেই প্রফুল্ল ভাব এবং সেই বিমর্ষ ভাব কি সেই বন্ধুতে আছে? একই সময়ে বন্ধু বিমর্ষ এবং প্রফুল্ল কিরূপে হইতে পারেন? আমরা বলিব যে প্রফুল্ল ভাব সেই প্রফুল্ল-হৃদয় ব্যক্তির মনে, আর বিমর্ষ ভাব বিমর্ষ ব্যক্তির মনে। তেমনি একটি গোলাপ ফুলেরও দুই দিক আছে। যখন গোলাপের দিক হইতে দেখি, তখন গোলাপটির ভিতর পাপড়ি আছে, তাহাতে রঙ আছে, তাহার আয়তন আছে এই দেখিব। কিন্তু দর্শকের দিক হইতে দেখিলে বলিব যে গোলাপ হাসিতেছে। এখন এই হাসিটি গোলাপে, না দর্শকে? দর্শকের হৃদয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপে সকল পদার্থকে দুই দিক হইতে দেখা যায়। বস্তুর দিক হইতে বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের সৃষ্টি, ভাবের দিক হইতে কবিতা, ভক্তি এবং ধর্ম্মের সৃষ্টি। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিলেন, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন, তাঁহার পর গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন ইত্যাদি ব্যাপার বুদ্ধের দিক হইতে দেখি এবং সেই সকল ব্যাপার লইয়া বুদ্ধের ইতিহাস রচিত হয়। আবার বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিলে সমুদায় জগৎ উৎফুল্ল ভাব দেখাইয়াছিল, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহার সিদ্ধি হইবার সময় পাপপুরু-

যেরা বিকটাকার ধরিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল; ইত্যাদি ব্যাপার ভাবের দিক হইতে দেখিতে হইবে এবং এই সকল লইয়া বৌদ্ধ ভক্তিশাস্ত্র, বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ কবিতা। কোন মহাপুরুষের ইতিহাস ধরিলে দুইয়েরই সামঞ্জস্য আবশ্যক। কেবল ঘটনাগুলি সন্নিবিষ্ট থাকিলে ইতিহাসের মাধুর্য্য থাকে না, এবং কেবলমাত্র ভাব লইলে তাহার ইতিহাসত্ব চলিয়া যায়। প্রকৃত ইতিহাসে দুইটি থাকাই আবশ্যক। এই জন্য আমরা কোনটিকে পরিত্যাগ করিলাম না। অনেক সময় ভক্তের উচ্ছ্বাস এত অধিক দূর গড়াইয়া যায় যে তাহা উপহাসাস্পদ হইয়া পড়ে। সেগুলির উল্লেখ না করাই ভাল। কিন্তু উচ্ছ্বাস যখন কবিতার নিয়মকে অতিক্রম না করে, ভাব যখন অক্লেশে বুঝিতে পারা যায়, তখন তাহা আমাদিগকে লইতে হইবে—ছাড়িলে চলিবে না। পাঠকেরা এই ভাবে যদি বুদ্ধ এবং অন্যান্য মহাপুরুষের জীবনীসকল পাঠ করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের পক্ষে কেবল যে বিশেষ উপকার হইবে তাহা নহে, তাঁহারা ভাবসাগরে সন্তরণ দিয়া জীবনের কবিত্ব, মাধুর্য্য এবং নিগূঢ় তাৎপর্য্যসকল ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

তবে বুদ্ধ মাতার দক্ষিণ দিক হইতে উৎপন্ন হইলেন একথার অর্থ কি? তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন এইটি ঐতিহাসিক ব্যাপার, কিন্তু দক্ষিণ পার্শ্বের কথাটি ভাবুকের ভাব। আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি যে, যেখানে কোন মহাপুরুষ, দেব কিম্বা দেবী পবিত্রতার আধার হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, মনুষ্যেরা তাঁহাদিগকে সকলপ্রকার জড়পদার্থের ভাব হইতে পৃথক রাখিতে যত্নবান হয়। তাহারা তাঁহাদিগের আত্মা এবং শরীরকে পৃথক করিয়া দেখে। আত্মা দেবপদার্থ। ইহা বিশুদ্ধ চিন্তার আকাশে উড্ডীয়-

স্থান থাকে—পৃথিবীর অতীত। কামনা ইহাকে কলঙ্কিত করেনা; মাংসপিণ্ড ইহাকে বদ্ধ রাখিতে পারে না। বিশুদ্ধ চিন্তা কেবল ভাব লইয়া থাকে—ইহাতে জড়ের সংস্পর্শ থাকে না। ইহা নিষ্পাপ, নির্ম্মল এবং নিষ্কলঙ্ক। আমরা যখন সংসার ছাড়িয়া বিশুদ্ধ চিন্তার রাজ্যে ভ্রমণ করি, তখন আমরা ততটা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাই। আত্মার নিবাস সত্য, শিব সুন্দরে। এখানে পৃথিবীর দুর্গন্ধ পৌঁছে না, ইন্দ্রিয়েরা অধিকার পায় না। মহাপুরুষেরা সাধারণ লোক হইতে ভিন্ন জীব। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা কেবল বিশুদ্ধ চিন্তা লইয়া থাকেন। পৃথিবী তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে নির্যাতন করুক, তাঁহারা এখানকার সম্ভোগ এবং কষ্টের অতীত। তাঁহাদিগের নাম করিলে তাঁহাদিগের শরীরের কথা মনে উদয় হয় না; যে ভাব লইয়া তাঁহারা বিখ্যাত সেই ভাবটি কেবল মনে হয়। যখন ঈশার কথা বলি, তখন কি আমরা তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা বা রূপ মনে করি, না তাঁহার স্বার্থত্যাগ, তাঁহার ক্ষমা, তাঁহার বৈরাগ্য, তাঁহার ক্রুশে মৃত্যু এই সকল কথা মনে পড়ে? শরীরী ঈশা—আমাদের কাছে একথার কোন অর্থ নাই। তিনি কিরূপ দেখিতে ছিলেন তাহা জানি না। যখন তাঁহার নাম করি তখন ভাবময় ঈশাই আমাদিগের প্রত্যক্ষগোচর হন। প্রসিদ্ধ দার্শনিকেরা বলেন যে, এই ভাব কখন পৃথিবীর হইতে পারে না—ইহা ঈশ্বর হইতে আগমন করে, ইহার জন্ম স্বর্গে। ইহা কামসম্ভূত বা শরীরসম্ভূত নহে। ইহার জন্ম শরীরের জন্মের মত হইতে পারে না। বিশুদ্ধ চিন্তা ঈশ্বরের সন্তান; মনুষ্যের, নরনারীর সন্তান নহে। সুতরাং খ্রীষ্টানেরা যখন ঈশার জন্ম ব্যাখ্যা করেন তখন তাঁহারা ভাবময় ঈশাকে ভাবেন; শরীরী ঈশাকে তাঁহারা কোন-

প্রকারে লক্ষ্য করেন না। সেই জন্য ভাবময় ঈশাকে তাঁহারা ঈশ্বরসন্তান বলিয়া বর্ণনা করেন। তাঁহার জন্ম কখন মনুষ্য-শরীরে হইয়াছে ইহা তাঁহারা বলেন না। তিনি কামসম্ভূত নহেন এবং যখন তাঁহার জননীর গর্ভসঞ্চার হয় সে গর্ভসঞ্চার নিষ্পাপ এবং নির্দ্দোষ বলিয়া বর্ণিত হয়।

গ্রীস দেশে প্যালাস (মিনার্ভা) বলিয়া এক দেবী ছিলেন। তিনি সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া প্রসিদ্ধা এবং তিনি জ্ঞানদেবী হইয়া ক্ষিতিমণ্ডলে দেখা দিতেন। বিখ্যাত আথেন্স নগরের তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। তিনি যেমন পরমা সুন্দরী ছিলেন তেম্‌নি আবার তিনি জ্ঞানে সম্পূর্ণা। গ্রীক দার্শনিক-দিগের মতে জ্ঞান পবিত্র পদার্থ, বিশুদ্ধ চিন্তারাজ্যের পদার্থ। ইহা নিষ্পাপ, সুতরাং ইহার জন্ম মানুষিক নহে। গ্রীকেরা বলে যে, ইহাঁর পিতা পরম দেব জি.উস অর্থাৎ জুপিটার ছিলেন এবং ইনি মাতৃগর্ভ হইতে উৎপন্ন হন নাই। পিতার মস্তক হইতে ইহাঁর জন্ম। যে চিন্তা বিশুদ্ধ, নিষ্পাপ তাহার জন্ম শরীরে হইতে পারে না। অতএব প্যালাস দেবীর জন্ম পিতার মস্তক হইতে হইয়াছিল। বোধ হয় আমাদের সীতার জন্মবিবরণ এইপ্রকার বুঝিলে ক্ষতি হয় না।

বুদ্ধের জন্মবৃত্তান্ত এই ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিলে সম্পূর্ণ-রূপে পরিষ্কার হইয়া যায়। তিনি নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। একেবারে কামনার নির্ব্বাণ না হইলে মানুষ মুক্তির অধিকারী হয় না। সুতরাং তাঁহার ধর্ম্ম পুণ্যের ধর্ম্ম। তিনি নিজে ষড়-রিপুর দাসত্ব হইতে মুক্তশৃঙ্খল হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সংসারের কোন যোগ ছিল না। পিতা, ভার্য্যা, পরিবার, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বল, প্রভুত্ব সকলই জলাঞ্জলি দিয়া তিনি

সর্ব্বভূতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি পুণ্য প্রচার করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার উপাসকেরা সেই জন্য তাঁহাকে জড়জগৎ হইতে একেবারে পৃথক রাখিতে যত্ন করিতেন। তিনি জীবনে ও মরণে জড়ের উপর আধিপত্য দেখাইয়া গিয়াছিলেন। কেবল জন্মবিষয়ে এক সন্দেহ রহিল। কিন্তু এইখানে তাঁহারা আধ্যাত্মিক জন্মতত্ত্ব আনিয়া সকল সন্দেহ মিটাইয়া দিলেন। যিনি শরীর নহেন, জড় নহেন, সুতরাং শরীর ও জড়ের কামনাসকলের অতীত, যিনি আত্মা, একটি পরম ভাব, তিনি বিশুদ্ধ চিন্তারাজ্যের লোক। তিনি ভগবানের চিন্তা হইতে উদ্ভূত। তাঁহার শরীরী জন্ম হইতে পারে না, তিনি কামোদ্ভূত নহেন। অন্যান্য লোকের জন্মের ন্যায় তাঁহার জন্ম হয় নাই। তিনি তাঁহার জননীর দক্ষিণ দিক হইতে নির্গত হইয়াছিলেন। অতএব তিনি কামনার বাহিরে জন্মলাভ করিয়াছিলেন এবং কামনার অতীত হইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ শরীরী মনুষ্য ছিলেন না। তিনি একটি ভাব; ভাব দেবসম্ভূত এবং ইহার জন্ম পবিত্র, নির্দ্দোষ এবং আধ্যাত্মিক।

আমরা যেরূপ অর্থ করিতে চেষ্টা করিলাম ইহা ইতিহাসের— আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাসের কথা। ঈশা সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা খাটে, গ্রীক প্যালাস সম্বন্ধেও এই ব্যাখ্যা খাটে। তুলনার পদ্ধতি অনুসারে এই ব্যাখ্যা আমরা বুদ্ধের সম্বন্ধেও স্থির করিলাম। মনের কতকগুলি অবস্থা হইলে কতকগুলি ঘটনা হইবেই হইবে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। যেখানে কোন মহাপুরুষ পুণ্যপ্রচারের জন্য জীবন দিয়াছেন, তাঁহার জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু শরীরী নিয়মের অতীত বলিয়া স্থিরীকৃত হইবেই হইবে। যতদিন ভাবজগৎ

থাকিবে ততদিন সেই মহাপুরুষ অশরীরী বলিয়া গণ্য হই-বেন এবং তাঁহার জন্মও ভাবের জন্ম, অশরীরী জন্ম বলিয়া গণ্য হইবে। আমরা অনেক স্থলে ঈশার জন্ম লইয়া এবং বুদ্ধের জন্ম লইয়া উপহাসের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা ভাবুক তাঁহারা এই উপহাসকে তুচ্ছ করেন। ইতিহাসের খাতিরে যেমন প্রাকৃতিক ঘটনাকে বিশ্বাস করি তেমনি এই ভাবের ঘট-নাকেও বিশ্বাস করিতে হইবে। যেমন জড়জগতের নিয়ম-প্রণালী আছে, এবং সেই সকল নিয়মের অর্থ করিবার প্রণালী আছে, তেমনি অন্তর্জগতের, আধ্যাত্মিক জগতেরও নিয়ম-প্রণালী আছে এবং তাহার অর্থ করিবার পৃথক প্রণালীও আছে। বুদ্ধের অশরীরী অকামসম্ভূত জন্ম প্রাকৃতিক ঘটনা নহে। ইহা ভাবের কথা, ভক্তির কথা এবং শাস্ত্রের কথা।

তোমরা এবং আমরা।

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মত।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমল চরণ পড়িছে ধরণী-মাঝে,
কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা,
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।
আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,
কি কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা!

চকিতে পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও!
যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে!

আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা,
কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলি!
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি!
তোমরা দেখিয়া চুপিচুপি কথা কও,
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও!
বসন-আঁচল বুকেতে টানিয়া ল'য়ে
হেসে চলে' যাও আশার অতীত হ'য়ে।

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মত
  আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
  টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও,
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি
চকিত চরণে চলে' যাও দিয়ে ফাঁকি।

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
  নয়ন অধর দেয়নি ভাষায় ভরে',
মোহন মধুর মন্ত্র জানিনে মোরা,
  আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে'?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি!
কোন সুলগনে হব না কি কাছাকাছি!
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে!

গুরুঠাকুর।

গোস্বামী নিত্যানন্দ ঠাকুর সবেমাত্র ঊনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বার গৃহশূন্য হন। পনর বৎসর পূর্ব্বে আর একবার তিনি পত্নীবিয়োগ-বিধুর হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তখন ত শোকটা এত লাগে নাই, তখনও গৃহশূন্য হইয়াছিলেন, কিন্তু

গৃহ ত এত শূন্যময় হয় নাই। হায়! তবে কি এ শোক মাধ্যাকর্ষণের মত প্রতিপদে বাড়িয়াই চলিবে? গোস্বামী এখন পূজা করিবার সময় দেখিতে পান, পূজার উপকরণ তেমন সুশৃঙ্খলায় নাই, আহার করিতে করিতে বুঝেন, রন্ধনে তেমন পারিপাট্য নাই, শয়ন করিতে গিয়া দেখেন, শয্যারচনায় সে নিপুণতা নাই; শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠে। এইরূপে দিনে দিনে গোস্বামী ঠাকুর, ইন্দুমতী-বিরহে অজের মত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দের গুরুগিরি ব্যবসায়। শিষ্য সেবকও বিস্তর। এক ঘর রাজাও তাঁর শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত। শীঘ্রই গুরুদেবের এই বিপদের কথা শিষ্যমহলে প্রচার হইল, সেই ভক্ত রাজ-হৃদয়ে কিছু অধিক মাত্রায় ব্যথা লাগিল। গুরুর এ অঙ্গহীনতা রাজার অসহ্য বোধ হইয়াছিল, তাই তিনি ভগ্নার্দ্ধাঙ্গ ঠাকুরের অঙ্গসংস্কারে ব্যস্ত হইলেন। পাত্রীর অনুসন্ধানে দেশবিদেশে লোক ছুটিল। রাজা যে বিবাহের সহায়, সে বিবাহে পাত্রীর অভাব কোথায়? অচিরে একটী রূপ-গুণ-সম্পন্না ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা গোস্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইলেন। লোকে বলিত ঠাকুরের গলে এ রত্ন মুক্তাহারের ন্যায় শোভা পাইবে।

এতদিনে নিত্যানন্দের নিরানন্দ হৃদয় আনন্দে পূরিয়া উঠিল, শূন্যগৃহ আবার পূর্ণ হইল। তখন গোস্বামী ঠাকুর নূতন উৎসাহে সংসারযাত্রা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে গুরুদেবের প্রবাসযাত্রার সময় আসিল, তিনি প্রবাসে বাহির হইলেন। কিন্তু এবার আর তত দীর্ঘকাল প্রবাস-বাস ঘটিল না। বাটীতে প্রবীণ অভিভাবক কেহ নাই, শুধু যুবতী বিধবা ভগ্নী ও বিধবা কন্যা আর একটী শিশু ভাগিনেয়। বিশেষ ভগ্নী ও কন্যা উভ-

য়েই সর্ব্বদা বিমর্ষ এবং অন্যমনস্ক। অন্য সময়ের কথা দূরে থাক্, এ-হেন আনন্দময় বিবাহ-উৎসবেও, গোস্বামী তাহাদের একটিবার হাসি দেখেন নাই। এমন হৃদয়হীনাদের কাছে বালিকা সহধর্ম্মিণীকে রাখিয়া বেশী দিন দূরদেশে থাকা, ঠাকুর বিধের জ্ঞান করিলেন না। কাজেই এবার তাঁহাকে প্রবাসের পালা সংক্ষেপেই শেষ করিতে হইল। বিশেষ শরীরটাও তেমন ভাল ছিল না, তাই তিনি তিন মাসের পরিবর্ত্তে তিন সপ্তাহ মধ্যে গৃহে ফিরিলেন।

গ্রামে অনেকেই সম্বন্ধে গোস্বামীর নাতি, তাহার মধ্যে এক-জন জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরদাদা, এবার যে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়্লেন?" ঠাকুরদাদা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নাতি-সম্প্রদায় হইতে কে বলিয়া উঠিল, "বুঝিস্‌নে ত—চুম্বকের টান কত?" কথাটা বুঝি গোঁসাইজীর মনোমত হইয়াছিল, তাই তিনি দীর্ঘ শিখা দোলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বটে ভায়া!"

নিত্যানন্দের সমবয়স্ক-মহলেও তাঁহাকে লইয়া খুব একটা আমোদ পড়িয়া গেল। কেহ বলিলেন, "কি হে নিত্য ভায়া, দিন্‌কের দিন যে শ্রী ফিরে যাচ্ছে, পাকা হরিতকী খেলে নাকি?" সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলিয়া উঠিলেন, "ভায়াকে আর কিছু খেতে হবে কেন? জাননা—বালা স্ত্রী ক্ষীর-ভোজনম্।"

বিবাহের তিন বৎসর পর দৈবপ্রসাদাৎ গুরুদেবের একটী পুত্র জন্মিল। গৃহে আর আনন্দ ধরে না। দেখিতে দেখিতে ছেলেটী নির্ব্বিঘ্নে আট মাস অতিক্রম করিল; মহাধূমধামে অন্ন-প্রাশন সমাধা হইয়া গেল। কেবল নামকরণ লইয়া একটু গোল বাধিয়াছিল। গোস্বামী ঠাকুরের ইচ্ছা, ছেলেটীর নাম

হয় সচ্চিদানন্দ, কিন্তু নাম শুনিয়াই গোঁসাই-গৃহিণী জ্বলিয়া উঠি-লেন, নামটার সঙ্গে সঙ্গে যেন শিখা-কণ্ঠী-তিলকধারী এক বিভীষিকা-মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। ভাবিলেন, আমার সোনার বাছার এমন বুড়োটে নাম হতে গেল কেন? তখন তিনি বাছিয়া বাছিয়া নাম রাখিলেন—হেমচন্দ্র। বুঝি গোঁসাই-গৃহিণীর মৃণালিনীখানা পড়া ছিল। যাই হোক, শেষ হেমচন্দ্র নামই বলবৎ রহিল। গোস্বামী মহাশয় যদি কখনও ভ্রমক্রমে আদর করিয়া ছেলেকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া ফেলিতেন, তবে তখনই মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া আশপাশ চাহিয়া, মনে মনে বারকত বিষ্ণুনাম স্মরণ করিতেন।

ক্রমে হেমচন্দ্র পঞ্চ-বর্ষ অতিক্রম করিল। এখন তার লেখা-পড়ার পালা। সে অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে বার বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে ছয় খানা বাঙ্গালা বই শেষ করিয়া ফেলিল। তখন গোস্বামী ঠিক করিলেন, ছেলেকে "মুগ্ধবোধ" পড়িতে দিবেন; ভরসা সে ভবিষ্যতে সাহিত্য ও স্মৃতিচর্চ্চা করিয়া একটা দিগ্‌গজ হইয়া উঠিবে। কিন্তু হেমের গর্ভধারিণী তায় রাজি নন। তিনি চান, ছেলেকে ইংরাজীও শিখাইতে হইবে। শেষ নিত্যানন্দের সেই প্রিয় শিষ্য রাজা বাহাদুরের সাহায্যে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে হেমচন্দ্রের পড়া ঠিক হইল। রাজার দুই পুত্র কলিকাতায় পড়িতেন, গুরুপুত্রও এখন হইতে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া পড়াশুনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাজকুমার-দ্বয় গুরুপুত্রকে লইয়া প্রথম প্রথম কিছু সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। বৎসরকত কলিকাতায় থাকিয়া কুমারযুগলের পান-আহারটা পিতার অগোচরে কিঞ্চিৎ ম্লেচ্ছ-সংস্পৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, পাছে এ সকল ব্যাপার গুরুপুত্রের নয়নগোচর হইয়া, গুরুসূত্রে পিতার

শ্রুতিগোচর হয়, এ ভাবনা তাঁহাদের মনে প্রায়ই হইত, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা বুঝিলেন, সে ভয় নিতান্তই অমূলক। অচিরাৎ এমন দিন আসিল, যখন গুরুপুত্র বলিতেন, "এ সব ছাড়তে হয় তোমরা ছাড়, আমি কিন্তু আর ছাড়চি না।"

এইরূপ হেমচন্দ্র একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কলিকাতায় কাটাইল। সে এই কয় বৎসরে সংস্কৃত কলেজে দুইবার "প্রমোশন" পাইয়াছে। এখন আর সে ইংরাজী বুক্‌নি ভিন্ন কথা বলিতে পারে না। হেম যখন বাড়ীতে আহার করিতে বসিয়া বলে তরকারীগুলা অতি nasty, বাটীটা বড় dirty, তখন তার মা ও পিসি অবাক্ হইয়া মহানন্দে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হেমের বিদ্যা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। এই সময় তাহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িয়া গুরুগিরি ধরিতে হইল। তবে ব্যবসাটা তার মনোমত নয়। টেরি মুছিয়া টিকি রাখিতে, সার্ট ছাড়িয়া নামাবলী ধরিতে সত্যই তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু কি করে, এমন সুবিধা ত আর কিছুতে হয় না, কাজেই সে ব্যবসাটাকে ত্যাগ করিতেও পারিল না। তবু সে উহার মধ্যে একটু সূক্ষ্ম কাটিল, ঠিক করিল টেরিটা ত থাকিবেই সঙ্গে সঙ্গে টিকিও রাখিবে, কিন্তু "হোমিওপ্যাথিক ডোজে" তিলকও কাটিতে হইবে—তবে সেটা রসকলির রূপান্তর মাত্র। আবার দায়ের উপর দায়, শিষ্যবাড়ীতে কাঠের মালা না পরিয়া গেলেও চলে না, অগত্যা, সে এক হুক-লাগান মালা সংগ্রহ করিল। মালাটা পকেটেই থাকিত আবশ্যক হইলে তৎক্ষণাৎ পকেটের মালা গলায় উঠিত। কিন্তু ইহাতেও ত নিষ্কৃতি নাই, দুষ্ট লোকে আবার তাঁর সাধের গোঁফ দাড়ির উপরেও কুদৃষ্টি দেয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ইহারও একটা

কিনারা করিয়া ফেলিল। যদি কেহ বলিত, "গোঁসাই ঠাকুরের গোঁফ দাড়ি কেন ?" তবে সে তখনই হাস্যমুখে, উর্দ্ধদৃষ্টে হাত দুটী জোড় করিয়া, মস্তক স্পর্শ করিয়া একটা ভাব ধারণ করিত, অর্থ— এ সব বাবা তারকেশ্বরের মানত। হেমচন্দ্র আর এক সমস্যায় পড়িল। সে দেখিল, গায়ত্রী না জপিলে, জপ আহ্নিক না করিলে এ ব্যবসায়ে মান থাকে না। কলিকাতায় থাকিতে, প্রথম প্রথম যাবনিক খাদ্যগুলা শোধন করিবার নিমিত্ত গায়ত্রী জপার প্রয়োজন হইত বটে, কিন্তু সে যে অনেক কালের কথা! এখন ত তার কিছুই মনে নাই! তবু সে একটা উপায় উদ্ভাবন করিল। শিষ্যবাড়ী গিয়া সে স্নানান্তে সুর করিয়া আওড়াইত!

"অত্রার্চ্চেয়াং শ্বতী নাতি ক্রমেহতিঃপর্য্যধী গতৌ।
অপি পদার্থসংভাব্য গর্হানুজ্ঞা সমুচ্চয়ে।
মুরারিঃ লক্ষ্মীশঃ বিষ্ণুৎসবঃ, হৃষীকেশঃ দামোদরঃ।
মাধবর্দ্ধিঃ শিবঙ্কারঃ কৃষ্ণৈকত্বং মুকুন্দোক্তিঃ কৃষ্ণৈক্যং ভবৌষধং।"

সাধারণ শিষ্যবর্গ ভাবিত, ঠাকুরপুত্র ঠাকুর অপেক্ষাও পণ্ডিত। কই ঠাকুর ত এমন করিয়া আহ্নিক করিতে পারিতেন না।

হেমচন্দ্র স্থানবিশেষে গীতামহিমা ও বৈষ্ণবশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া শিষ্যা ও শিষ্যবর্গের প্রেম ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টা পাইতেন। সুবিধা পাইলেই বিবর্ত্তবিলাসের অর্থ এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মও যথাস্থানে প্রচার করিতেন। একদিন মেদিনীপুর অঞ্চলে কোন শিষ্যের অন্তঃপুরে, তিনি রাসলীলা লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলেন, এই উপলক্ষে সে বাটীর জনৈক ইংরাজী-পড়া নব্য যুবা নিতান্ত অহিন্দুর মত ব্যবহার করিয়াছিল। সে কিনা ঠাকুরপুত্রকে বাহিরের এক নির্জ্জন গৃহে লইয়া গিয়া বলিয়াছিল, "ঠাকুর কাল রাসলীলার অভিনয়

দেখিয়াছেন, আজ গোবর্দ্ধন ধারণ করতে হবে।" সেই ভক্তিহীন যুবকের পীড়নে ঠাকুরপুত্র নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, শেষ প্রবীণ ভক্তের দল জুটিয়া ঠাকুরপুত্রকে এই দানবের হাত হইতে উদ্ধার করেন। শুনিতে পাই, সেই হইতে হেমচন্দ্র শিষ্যগৃহে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ত্যাগ করিয়াছে।

স্বরলিপি।

ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

সুন্দরি রাধে আওএ বনি।
ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি।
কুঞ্চিতকেশিনী, নিরুপমবেশিনী,
রস-আবেশিনী, ভঙ্গিনী রে।
অধর-সুরঙ্গিনী, অঙ্গতরঙ্গিনী,
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিনী রে।
কুঞ্জরগামিনী, মোতিমদশনী,
দামিনীচমক-নেহারিণী রে।
আভরণধারিণী, নব অভিসারিণী,
শ্যামর হৃদয়বিহারিণী রে।
নব-অনুরাগিণী, অখিল-সোহাগিনী,
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে।
রাসবিলাসিনী, হাসবিকাশিনী,
গোবিন্দদাস-চিত-শোহিনী রে।

৪ ২
|

।০।১।২´।৩।

০ ১ ২´
॥ ঋরা -া জ্ঞা মা। জ্ঞা - দজ্ঞদা মা -া। মা -ঞ্ঝা মা দা।
॥ সু — ন্দ রী। রা — ধে —। আ — ওএ ব।

৩ ॥
। সা -া -া -া । সা পা পা পা। পা -া পা পা।
। ণি — — —। ব্র জ র ম । ণী — গ ণ।

। পা পদা মা পা। দা -া -া -া ॥ সা -রা ঋা মা।
। মু কু ট, ম। ণি — — —॥ কু — ঞ্চি ত।

। পা -া পা পা। মা পা দা ঞা। র্সা -া র্সা র্সা।
। কে — শি নী। নি রু প ম। বে — শি নী।

। পা দা ঞা -র্সা। র্সা -া র্সা র্সর্ঞা। ঞা -া র্ঋা র্ঞা।
। র স আ —। বে — শি নী। ভ — ঙ্গি নী।

। র্সা -া -া -া। ঞা র্সা র্ঞা র্সা। ঞা -া দা পা।
। রে — — —। অ ধ র, সু। র — ঙ্গি নী।

। পা -া ঞা দা। পা -া ঞা দা। পা -া দা ঞা।
। অ — ঙ্গ, ত। র — ঙ্গি নী। স — ঙ্গি নী।

। পা দা ঞা র্সা। ঞা -া র্ঋা র্ঞা। র্সা -ঞা -দা -পা ॥
। ন ব ন ব। র — ঙ্গি নী। রে — — —॥

০
। সা -া প্া দ্া। ঞ্া -া সা সা। ঞা -া ঋা লা।
। কু — ঞ্জ র। গা — মি নী। মো — তি ম।

। সা ঞ্া সা -া। সা -া র্সা ঞা। দা পা মা ঋা।
। দ শ নী —। দা — মি নী। চ ম ক, নে।

। রা -া মা ঋা। লা -া -সা -া। রা ঋা ঋা রা।
। হা — রি ণী। রে — — —। আ ভ র ণ।

। জ্ঞা -রা জ্ঞা জ্ঞা। রা মা জ্ঞা জ্ঞা। রা -া জ্ঞা জ্ঞা।
। ধা — রি ণী। ন ব অ ভি। সা — রি ণী।

। সা -লা মা জ্ঞা। লা সা ঞ্‌া দ্‌া। প্‌া -দ্‌া ঞ্‌া সা।
। শ্যা — ম র। হৃ দ য়, বি। হা — রি ণী।

। লা -া -া -া। সা রা জ্ঞা মা। পা -া পা পা।
। রে — — —। ন ব অ নু। রা — গি ণী।

। মা পা দা ঞা। র্সা -া র্সা র্সা। পা -া দা ঞা।
। অ থি ল, সো। হা — গি ণী। প — ঞ্চ ম।

। র্জ্ঞা -া র্লা র্সা। ঞা -া র্জ্ঞা র্লা। র্সা -া -া -া।
। রা — গি ণী। মো — হি নী। রে — — —।

। র্সা -া ঞা র্সা। র্লা -া র্সা ঞা। দা -া পা দা।
। রা — স, বি। লা — সি নী। হা — স, বি।

। ঞা -া দা পা। মা র্সা -া ঞা। দা পা মা জ্ঞা।
। কা — শি নী। গো বি — ন্দ। দা স চি ত।

। মা -া ঞা দা। পা -া -া -া॥ ॥
। মো — হি নী। রে — — —॥ ॥

কেদারা—ঢিমা তেতালা।

আহা কি রূপ হেরিনু, মন মোহিল।
স্বপনে দেখা দিয়ে কোথা লুকাল।
কেন রে জাগিলি, কি ধন হারালি হায়
স্বপন-মুরতি আমার কোথা মিলাল।

৩৮২

।১।২´।৩।০।

১ ২´ ॥ ৩
॥ ধা । পা মগা মা -া । পা -া র্সা -া । -নর্ঋ সা নধপা -া ।
॥ আ । হা কি রূ — । প — হে — । — রি নু — ।

০
। -া -া -া মগা । -া মা -া -গমপধা । পমগা মা -া -া ।
। — — — ম । — ন — — । মো — — — ।

। রা -া সা -া । -া সা সা সা । মগা পজ্ঞা ধজ্ঞা পা ।
। হি — ল — । — স্ব প নে । দে খা দি য়ে ।

০
। গমপা -ধনর্সা -র্ঋ র্ঋর্ঋ । র্সনধা -পজ্ঞপা -া -া । -া া া ॥
। কোথা — — লুকা । ল — — — । — ॥

৩
। পা পা পা -র্সা । -া র্ঋ র্সা র্সা । র্সা -র্সা র্ঋ র্সা ।
। কে ন রে — । — জা গি লি । কি — ধ ন ।

। র্সা র্সা নর্সা -া । -ধা -া পা -া । মা পা -জ্ঞা পা ।
। হা রা লি — । — — হা য় । স্ব প — ন ।

। ধা পমা গমা -পা । গমা -রা সা -া । সা মা -গা -পা ।
। মূ র তি — । আ — মা র । কো থা — — ।

। -জ্ঞা -পা -া -া । গা মা -পা -ধা । -না -র্সা -র্ঋ -া ।
। — — — — । মি লা — — । — — — —

০
। র্সা -নধা -পজ্ঞা -া । -পা -া -া ॥ ॥
ল — — — । — — — ॥ ॥

———
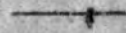
অভিব্যক্তির ভিত্তিমূল।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, জগতে অভিব্যক্তি তিন ধারায় প্রবাহিত হয়; তাহার মধ্যে একটি ধারা অহংবৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি বা মনোবৃত্তি—যাহাই বলো; আর একটি ধারা—

দার্শনিক পণ্ডিত। থামো! অহংবৃত্তি, মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে প্রভেদ আছে; উহারা এক বৃত্তি নহে—তিন বৃত্তি (সাংখ্যদর্শনের অমুক পৃষ্ঠা দেখ)।

প্রত্যুত্তরে সবিনয় নিবেদন। আপনার কথা শিরোধার্য্য! কিন্তু তিনটিই কিছু আর মূল পদার্থ নহে—মূল পদার্থ একটি। সংখ্যা হইতে তো সাংখ্যের উৎপত্তি? সংখ্যার প্রবাহ ধর— ১,২,৩,৪,৫ ইত্যাদি। সকলেই কিছু আর মূল সংখ্যা নহে—মূল সংখ্যা ১। যেমন সংখ্যার প্রবাহ তেমনি অভিব্যক্তির প্রবাহ;—

বাল্য	উদ্ভিদ	অহংবৃত্তি
যৌবন	জীবজন্তু	মনোবৃত্তি
জরা	মনুষ্য	বুদ্ধিবৃত্তি

এখানেও মূল এক বই দুই নয়।

দার্শনিক পণ্ডিত। মূল—অহংবৃত্তি নহে কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি। "মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাত্মনঃ" (সাংখ্যদর্শনের অমুক পৃষ্ঠা দেখ)।

প্রত্যুত্তরে সবিনয় নিবেদন। ইহা সকলেরই দেখা কথা, আপনিও বোধ করি দেখিয়া থাকিবেন যে, শিশুর বুদ্ধি অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার মন অভিব্যক্ত হয়; এবং তাহারও পূর্ব্বে তাহার অহং অভিব্যক্ত হয়। আপনার শাস্ত্রেও তো বলে যে, "অয়ং ঘটঃ" "এটা ঘট" এইরূপ নিশ্চয় করার নাম বুদ্ধি। একটি ছয় মাসের কচি বালকের চক্ষের সমক্ষে একটা ঘট ধরিলে

সে কি করে? "এটা ঘটি" এরূপ যে নিশ্চয় করিবে—সে সামর্থ্য এখনও তাহার জন্মে নাই। "এটা না জানি কি" এইরূপ একটা সংশয় তাহাকে আক্রমণ করে। বেদান্ত-শাস্ত্রে বলে "মন সংশয়াত্মিকা বৃত্তি"। অতএব ঐ বালকের অভ্যন্তরে মন কতকটা অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার বুদ্ধি-উন্মেষের এখনও বিলম্ব আছে। এইরূপ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, আগে মন, পরে বুদ্ধি ক্রমান্বয়ে অভিব্যক্ত হয়। আরও এই দেখা যায় যে, একটি সদ্যোজাত বালক ওরূপ অবস্থায় ঘটির দিকে ক্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে মাত্র—"এটা না জানি কি" এরূপ সংশয়ও তাহার মনে উদয় হয় না; অথচ তাহার ভিতরে অহংবৃত্তি জাগিতেছে। তাহার প্রমাণ—ক্ষুধার সময়ে দুধ না পাইলে সে রাগিয়া কাঁদিতে থাকে। "আমার দুধ চাইই চাই"—আপনার প্রতি এইরূপ একটা টান ইহারই মধ্যে তাহার জন্মিয়াছে। এই জন্য বলিতেছি যে, মন অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে অহংবৃত্তি অভিব্যক্ত হয়। সাংখ্যদর্শনের কথা একরূপ, আমাদের কথা আর একরূপ; কিন্তু কথার অনৈক্যেই কিছু আর মতের অনৈক্য হয় না—স্থল-বিশেষে হইতে পারে, কিন্তু সকল স্থলে নহে। এমনও অনেক স্থল সময়ে সময়ে উপস্থিত হয় যেখানে কথার বৈপরীত্যে ভাবের ঐক্য এবং কথার ঐক্যে ভাবের বৈপরীত্য সপ্রমাণ হয়। একজন বাঙ্গালীর মুখে "আমি ইংরাজ" অথবা "আমি মিষ্টার অমুক", আর, একজন ইংরাজের মুখে "আমি মিষ্টার অমুক", কথা দুইই সমান—কিন্তু দুই কথার দুই ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। তেম্‌নি আমি যদি লণ্ডনে দাঁড়াইয়া বলি "আমি স্বদেশে আছি" আর কলিকাতায় দাঁড়াইয়া বলি "আমি স্বদেশে আছি" তবে কথা দুইই অবিকল সমান, অথচ

দুই কথার দুই ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। সাংখ্যদর্শন উপর হইতে নীচে নামিতেছেন, আমরা নীচে হইতে উপরে উঠিতেছি; এরূপ অবস্থায় সাংখ্যদর্শন যাহাকে প্রথম ধাপ বলিতেছেন আমরা তাহাকে শেষ ধাপ বলিলেই কথাটা সঙ্গত হয়। নচেৎ সাংখ্যদর্শন উপর হইতে নীচে নামিবার সময় যাহাকে প্রথম ধাপ বলিয়াছেন, নীচে হইতে উপরে উঠিবার সময় আমরাও যদি তাহাকে বলি প্রথম ধাপ, তবে সাংখ্যদর্শনের সহিত আমাদের কথার ঐক্যে মতের অনৈক্যই বুঝাইবে, ঐক্য বুঝাইবে না। সাংখ্যদর্শনের সহিত আমাদের যে, মতভেদ একেবারেই নাই তাহা বলিতেছি না—বর্ত্তমান স্থলে বিশেষ কোনও মতভেদ নাই, ইহাই কেবল আমাদের মন্তব্য। পরে আমরা দেখাইব যে, সাংখ্যদর্শনের মহত্তত্ত্ব যদিচ মোটামুটি বলিতে গেলে—বুদ্ধি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার অর্থের দৌড় বুদ্ধি অপেক্ষা অনেক বেশী; বুদ্ধির সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে কিছুতেই তাহার স্থান সঙ্কুলন হয় না।

আজকাল মাঠে হাটে ঘাটে শাস্ত্রচর্চ্চার যেরূপ প্রবল আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে আগে শাস্ত্রে কি বলে না বলে তাহার একটা গৌরচন্দ্রিকা না করিলে যাহা বলিব কোনো কথাই কাহারও মনঃপুত হইবে না, এই বিবেচনায় এখানে অতগুলো বাদানুবাদের উপর প্রবন্ধের গোড়াপত্তন করিতে হইল, নহিলে এতক্ষণে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারিত।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে অভিব্যক্তির ধারা তিনটি;

অহংবৃত্তির অভিব্যক্তি।

প্রাণের অথবা ক্রিয়াব্যূহের অভিব্যক্তি।

আকৃতি এবং গঠনের অভিব্যক্তি।

অতঃপর দেখিতে পাওয়া যাইবে যে অহংবৃত্তির ভিত্তিভূমি

মূলজ্ঞান, ক্রিয়াব্যূহের ভিত্তিভূমি মূলশক্তি এবং আকৃতি ও গঠনের ভিত্তিভূমি মূলবস্তু।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, যদিও বস্তুসকলের নানাপ্রকার আকৃতি এবং গঠন অভিব্যক্তি হইতে লয়ে এবং লয় হইতে অভিব্যক্তিতে পদনিক্ষেপ করিতেছে, কিন্তু Matter is indestructible—মূলদ্রব্য অবিনশ্বর। আমরা তাই বলিতেছি যে, মূলবস্তু হয়ও না যায়ও না—তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। সুতরাং অভিব্যক্তি হইতে কেবল তাহার নাম, রূপ, গঠন প্রভৃতিই অভিব্যক্ত হয়—মূলবস্তু যাহা আছে তাহাই আছে—তাহাই ছিল এবং তাহাই থাকিবে। আংশিক বস্তুই, পরিচ্ছিন্ন বস্তুই, ভাঙন-গড়নের অধিকারমধ্যে অবস্থিতি করে; যেহেতু মূলবস্তুর একাংশের ভাঙনের নামই অপরাংশের গড়ন। কিন্তু জগতের সমগ্র অংশ ভাঙিয়া জগতের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে না। শরীরের পরমাণুসকল শরীরকে ছাড়িয়া শরীরের বহিস্থিত আর আর বস্তুতে বিলীন হইতেছে; কিন্তু সমগ্র জগতের একটি ধূলিকণাও জগতের বাহিরে যাইতে পারে না। সমগ্র মূলবস্তুর সম্বন্ধে ভাঙন, গড়ন, অভিব্যক্তি পরিবর্ত্তন প্রভৃতির কোন সুদূর প্রসঙ্গও উঠিতে পারে না। অতএব ক্রমাভিব্যক্তি প্রভৃতি যতকিছু পরিবর্ত্তনের ব্যাপার তাহা পরিচ্ছিন্ন বস্তুসকলের মধ্যেই আবদ্ধ—মূলবস্তুকে তাহা কোনক্রমেই নাগাল পায় না। এক্ষণে বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আকৃতি এবং গঠনের যেখানে যতকিছু অভিব্যক্তি, সেই এক অপরিচ্ছিন্ন মূলবস্তুই তত্তাবতের ভিত্তিমূল। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যেমন Indestructibility of matter মানেন তেমনি Conservation of energy মানেন। তাঁহারা বলেন যে, জগতে নানা শক্তির নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অভি-

ব্যক্তি এবং অন্য দুয়েরই সহায়তাকার্য্যে নিরন্তর নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রমাগতই রূপান্তরিত হইতেছে; কিন্তু সমগ্র ক্রিয়াশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভবে না। এ কথা খুবই সত্য। এক শক্তি অন্য শক্তির উপরে প্রযুক্ত হইলে, সেই গতিকে উভয়েরই রূপান্তর-ঘটনা অনিবার্য্য। পর্ব্বত হইতে যদি একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরের চাপ ভূতলে খসিয়া পড়ে, তবে তাহার গতিক্রিয়া রূপান্তরিত হইয়া ভূমিতে তাপ উৎপাদন করে এবং সেই সঙ্গে তাহার আধারবস্তু প্রস্তর-খণ্ডও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। প্রস্তর-খণ্ডের গতিবেগ তাহার বাহিরের অন্য এক বস্তুর শক্তি দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়াতেই এরূপ ক্রিয়া-পরিবর্ত্তন সম্ভব হইল। কিন্তু জগতের সমগ্র মূলশক্তির বাহিরে এমন কোন শক্তি নাই যাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা-গতিকে মূলশক্তির ক্রিয়া রূপান্তরিত হইবে। অতএব জগতের পরিচ্ছিন্ন শক্তিসমূহ ভিন্ন সমগ্র মূলশক্তি অভিব্যক্তি বা অনভিব্যক্তির অধিকারমধ্যে মস্তক অবনত করিতে পারে না। এই মূলশক্তিই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন ক্রিয়াশক্তির ভিত্তিমূল। অতএব ইহা স্থির যে, পরিচ্ছিন্ন সাকার বস্তুসকলের ভিত্তিভূমি অপরিবর্ত্তনীয় মূলবস্তু; এবং পরিচ্ছিন্ন শক্তি ক্রিয়াসকলের ভিত্তিভূমি অপরিবর্ত্তনীয় মূলশক্তি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, অহংবৃত্তির ভিত্তিভূমি কি? ইহার উত্তর স্পষ্টই পাড়িয়া আছে—অহংবৃত্তির ভিত্তিভূমি মূলজ্ঞান।

মূলজ্ঞান বলিতে প্রথমতঃ বুঝায় বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান বা বুদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ বুঝায় সামান্য জ্ঞান;—সামান্য জ্ঞান এবং বিজ্ঞান—দুয়ের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর নাই, কেননা দুইই জ্ঞান; তা ছাড়া, যেমন পিতা আপন পুত্রের সম্বন্ধে পিতা কিন্তু আপন পিতার সম্বন্ধে পুত্র; তেমনি, উচ্চ সোপানের জ্ঞানের

সম্বন্ধে যাহা সামান্য জ্ঞান, নিম্ন সোপানের জ্ঞানের সম্বন্ধে তাহা বিশেষ জ্ঞান। প্রথম ধাপের সামান্য জ্ঞান, অর্থাৎ যে জ্ঞান হইতে সমস্ত বিশেষ জ্ঞানের গোড়াপত্তন আরম্ভ হয়, কি কৃষক কি পণ্ডিত আপামরসাধারণ সকল মনুষ্যেরই যাহা সাধারণ সম্পত্তি তাহাতে কাহারও বুদ্ধিশক্তির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আপামরসাধারণ সামান্য-জ্ঞানকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে বিশেষ জ্ঞানে পরিণত করিতে পারে, সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণে আপনার ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করে। দেবদত্তকে আমিও জানি, তুমিও জান। একদিন দেবদত্ত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদের উভয়ের সম্মুখে উপস্থিত। তুমি তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিলে "ইনি দেবদত্ত"—আমি ভাবিতেছি যে "এঁকে যেন কোথায় কবে দেখিয়াছি" ইত্যাদি। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে দেবদত্ত-ঘটিত সামান্য জ্ঞান তোমার আমার দুই জনেরই সমান; কিন্তু দেবদত্ত-ঘটিত বিশেষ জ্ঞান আমা অপেক্ষা তোমার অধিক। ভাল হীরা কাহাকে বলে তাহা আমিও জানি, জহরীও জানে। কিন্তু একখণ্ড হীরা দেখিবামাত্র জহরী বলিবে যে, এটা অমুক শ্রেণীর হীরা; আমি হয় তো অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিব যে, এটা হয় প্রথম শ্রেণীর, নয় দ্বিতীয় শ্রেণীর, নয় তৃতীয় শ্রেণীর, নয় চতুর্থ শ্রেণীর ইত্যাদি। কোন্ শ্রেণীর হীরা কিরূপ তাহা যেমন জানা চাই—তেমনি তাহা দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারা চাই—তবেই বলিব যে তুমি একজন রত্নজ্ঞ পণ্ডিত। যে জ্ঞান যত বিশেষ, তাহার উপার্জ্জনে তত বুদ্ধি খাটাইবার প্রয়োজন, এবং যে জ্ঞান যত সামান্য তাহা তত অনায়াসলভ্য। "এটা ঘোড়া" এ কথা বলা সহজ; কিন্তু "এটা আরব-ঘোড়া" এ কথা

বলিতে হইলে ভাবনা চিন্তা আবশ্যক, বুদ্ধি খাটানো আবশ্যক। আবার "এটা অমুক বয়স্ক আরব-অশ্ব" এ কথা বলিতে হইলে, তাহা অপেক্ষা আরও অনেক বুদ্ধি খাটানো আবশ্যক। অতএব যে জ্ঞান যত সামান্য সেই জ্ঞান তত মূল-ঘেঁষা—আর যে জ্ঞান যত বিশেষ সেই জ্ঞান তত ফল-ঘেঁষা। এখানে একটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত—এরূপ যেন মনে করা না হয় যে, বিশেষ বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞানই বিশেষ জ্ঞান। দেয়াল একটা বিশেষ বস্তু—তা বলিয়া "এটা দেয়াল" এরূপ জ্ঞান বড় যে একটা বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচায়ক তাহা নহে। এখানে বিশেষ বস্তুর কথা হইতেছে না—বিশেষ জ্ঞানের কথা হইতেছে। দেয়াল বিশেষ বস্তু বটে;—কিন্তু বস্তু কথাটাই সামান্যের পরিচায়ক—বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। কেননা, দেয়াল যেন একটা বিশেষ বস্তু হইল—কিন্তু তাহা কিরূপ বস্তু?—প্রস্তর বা ইষ্টক বা কাষ্ঠ? অতএব দেয়াল একটা বিশেষ বস্তু এরূপ জানিলে বুঝায় যে, দেয়াল সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞানে উত্তীর্ণ হইতে এখনও অনেক পথ অবশিষ্ট আছে।

অতএব বস্তু, বিশেষই হউক (যেমন স্বর্ণ, হীরক) আর সামান্যই হউক (যেমন মৃত্তিকা ইত্যাদি) তাহাতে কিছুই আইসে যায় না; জ্ঞান সামান্য কি বিশেষ তাহাই এখানকার মন্তব্য কথা। হীরক বিশেষ-বস্তু বটে কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতীব যৎসামান্য হইতে পারে—এমন হইতে পারে যে আমি শুধু জানি হীরা বেলোয়ারির মত একটা চক্‌চকে সামগ্রী ইহার অধিক আর কিছুই নহে। তেমনি মৃত্তিকা অতীব সামান্য বস্তু হইলেও তৎসম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে; আমি হয় তো জানি—মৃত্তিকা আদিম যুগে কি ছিল—ক্রমে

কিরূপে তাহার রূপান্তর ঘটিয়াছে—তাহাতে কি কি প্রকার পরমাণু আছে—ইত্যাদি নানা বৃত্তান্ত এবং তাহার সঙ্গে সেই সকল বৃত্তান্তের কাহার সহিত কাহার কিরূপ সম্বন্ধ।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, যে জ্ঞান যত সামান্য সেই জ্ঞান তত মূল-ঘেঁষা এবং যে জ্ঞান যত বিশেষ সেই জ্ঞান তত ফল-ঘেঁষা। অতএব গোড়ায় সামান্য জ্ঞান না থাকিলে পরিণামে বিশেষ জ্ঞান ফলিত হইতে পারে না। ইউক্লিডের জ্যামিতি ইহার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ। দুই হাড়গিলার চঞ্চুর মাপ যদি সমান হয় আর উভয়ের চঞ্চুব্যাদানের মাত্রা যদি সমান হয়, তবে উভয়েরই উপর-চঞ্চুর অগ্রভাগ হইতে নিম্ন-চঞ্চুর অগ্রভাগ সমদূরবর্ত্তী (ইউক্লিডের চতুর্থ সিদ্ধান্ত); এই সামান্য জ্ঞানের উপরে ইউক্লিড ক্ষেত্রতত্ত্বের গোড়াপত্তন করিয়া ক্রমশই বিশেষ হইতে বিশেষে পদনিক্ষেপ করিয়াছেন। সকল বস্তু ছাড়া পাইলে ভূতলে পতিত হয় এটা কত না সামান্য জ্ঞান; কিন্তু এই জ্ঞান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া মহামহা পণ্ডিতেরা ক্রমে ক্রমে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। অতএব সামান্য জ্ঞান সামান্য নহে, তাহাই সমস্ত বিশেষ-জ্ঞানের পত্তন-ভূমি। জ্ঞানের মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা নিউটনের জ্ঞান হইতে চাষার জ্ঞানে—চাষার জ্ঞান হইতে জীবজন্তুর মনোরাজ্যে—জীবজন্তুর মনোরাজ্য হইতে জীব এবং উদ্ভিদ্ উভয়-সাধারণ প্রাণমূলপঙ্কের অহংমাত্র সামান্য বোধে, এবং তাহারও নীচে দলবদ্ধ পরমাণুপুঞ্জের পৃথক্ সত্তার মূলে জ্ঞানের অতীব অস্ফুট বীজভাবে উপনীত হই। সেখানে বীজ-ভাব শুধু যে কেবল জ্ঞানের তাহা নহে,—শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং ভৌতিক আকার গঠনাদিও সেখানে বীজভাবের উর্দ্ধে উঠে নাই। মনে

কয়, পৃথিবী সমুদ্রে বাতাসার মত গলিয়া গিয়াছে, এবং অগ্নির উত্তাপে সমুদ্র বাষ্পে পরিণত হইয়া আকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে; সেই আকাশাবশিষ্ট বস্তুতে আকার গঠনাদি যেমন—শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তেম্‌নি—এবং অহংবৃত্তি তেম্‌নি—তিনই বীজ-ভূত। বীজভূত হইলেও তাহা অভিব্যক্তি-রাজ্যের অন্তঃপাতী; কেননা অঙ্কুরিত হইতে পারাতেই বীজের বীজত্ব। যাহা অঙ্কুরিত হইবার জন্য হয় নাই তাহাকে বীজ বলা সঙ্গত হয় না। যেমন সমস্ত অভিব্যক্তিশীল আকারাদির মূলে এক অপরিবর্ত্তনীয় মূলবস্তুর সত্তা অস্বীকার করা যাইতে পারে না; সমস্ত অভিব্যক্তিশীল ক্রিয়াশক্তির মূলে এক অপরিবর্ত্তনীয় সমগ্র মূলশক্তির সত্তা অস্বীকার করিতে পারা যায় না, তেমনি সমস্ত অভিব্যক্তিশীল অহংবৃত্তির মূলে এক অপরিবর্ত্তনীয় জ্ঞানের সত্তা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার পরে মূল জ্ঞান, বুদ্ধি, মন এবং অহংকার এই চারিতত্ত্বের মধ্যে কাহার সহিত কাহার কিরূপ সম্বন্ধ এবং সেই প্রসঙ্গে সাংখ্যদর্শনের সহিত আমাদের মতের কিরূপ ঐক্যানৈক্য তাহা সবিস্তরে প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা রহিল।

কড়ায়-কড়া কাহন-কানা।

"ইংরাজিতে পাউণ্ড আছে, শিলিং আছে, পেনি আছে, ফার্দিং আছে—আমাদের টাকা আছে, আনা আছে, কড়া আছে, ক্রান্তি আছে, দন্তি আছে, কাক আছে, তিল আছে। ... ...
ইংরাজ এবং অন্যান্য জাতি ক্ষুদ্রতম অংশ ধরে না, ছাড়িয়া দেয়; আমরা ক্ষুদ্রতম অংশ ধরি, ছাড়ি না। ... ...
হিন্দু বলেন যে ধর্ম্মজগতেও কড়াক্রান্তিটি বাদ যায় না, স্বয়ং ভগবান কড়াক্রান্তি-

টিও ছাড়েন না। তাই বুঝি হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াক্রান্তিটি পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই, কড়াক্রান্তিটির ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।" সাহিত্য। ৩য় ভাগ। ৭ম সংখ্যা।

সকল দিক সমান ভাবে রক্ষা করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই জন্য মানুষকে কোন-না-কোন বিষয়ে রফা করিয়া চলিতেই হয়।

কেবলমাত্র যদি থিওরি লইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তুমি কড়া, ক্রান্তি, দন্তি, কাক, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ লইয়া, ঘরে বসিয়া, পাটিগণিতের বিচিত্র সমস্যা পূরণ করিতে পার। কিন্তু কাজে নামিলেই অতি সূক্ষ্ম অংশগুলি ছাঁটিয়া চলিতে হয়, নতুবা হিসাব মিলাইতে মিলাইতে কাজ করিবার সময় পাওয়া যায় না।

কারণ, সীমা ত এক জায়গায় টানিতেই হইবে। তুমি সূক্ষ্ম হিসাবী, দন্তি কাক পর্য্যন্ত হিসাব চালাইতে চাও, তোমার চেয়ে সূক্ষ্মতর হিসাবী বলিতে পারেন কাকে গিয়াই বা থামিব কেন! বিধাতার দৃষ্টি যখন অনন্ত সূক্ষ্ম, তখন আমাদের জীবনের হিসাবও অনন্ত সূক্ষ্মের দিকে টানিতে হইবে। নহিলে তাঁহার সম্পূর্ণ সন্তোষ হইবে না—তিনি ক্ষমা করিবেন না।

বিশুদ্ধ তর্কের হিসাবে ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কথা কহিবার যো নাই—কিন্তু কাজের হিসাবে দেখিতে গেলে, যোড়-হস্তে, বিনীতস্বরে আমরা বলি—"প্রভু, আমাদের অনন্ত ক্ষমতা নাই সে তুমি জান। আমাদিগকে কাজও করিতে হয় এবং তোমার কাছে হিসাবও দিতে হয়। আমাদের জীবনের সময়ও অল্প এবং সংসারের পথও কঠিন। তুমি আমাদিগকে দেহ দিয়াছ, মন দিয়াছ, আত্মা দিয়াছ; ক্ষুধা দিয়াছ, বুদ্ধি

দিয়াছ, প্রেম দিয়াছ। এবং এই সমস্ত বোঝা লইয়া আমা-দিগকে সংসারের সহস্র লোকের সহস্র বিষয়ের আবর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছ। ইহার উপরেও পণ্ডিতেরা ভয় দেখাইতেছেন, তুমি হিন্দুর দেবতা অতি কঠিন, তুমি কড়াক্রান্তি, দন্তি কাকের হিসাবও ছাড় না। তা যদি হয়, তবে ত হিন্দুকে সংসারের কোন প্রকৃত কাজে, মানবের কোন বৃহৎ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অবসর দেওয়া হয় না। তবে ত তোমার বৃহৎ কাজ ফাঁকি দিয়া, কেবল তোমার ক্ষুদ্র হিসাব কসিতে হয়। তুমি যে শোভা-সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্যময় সাগরাম্বরা পৃথিবীতে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছ, সে পৃথিবী ত পর্য্যটন করিয়া দেখা হয় না, তুমি যে উন্নত মানববংশে আমাদিগকে জন্মদান করিয়াছ, সেই মানবদের সহিত সম্যক পরিচয় এবং তাহাদের দুঃখমোচন, তাহাদের উন্নতিসাধনের জন্য বিচিত্র কর্ম্মানুষ্ঠান, সে ত অসাধ্য হয়। কেবল ক্ষুদ্র পরি-বারে, ক্ষুদ্র গ্রামে বদ্ধ হইয়া, গৃহকোণে বসিয়া, গতিশীল বিপুল মানব-প্রবাহ ও জগৎসংসারের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া আপনার ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের কড়াক্রান্তি গণিতে হয়। ইহাকে স্পর্শ করিব না, তাহার ছায়া মাড়াইব না, অমুকের অন্ন খাইব না, অমুকের কন্যা গ্রহণ করিব না, এমন করিয়া উঠিব, অমন করিয়া বসিব, তেমন করিয়া চলিব, তিথি, নক্ষত্র, দিন, ক্ষণ, লগ্ন বিচার করিয়া হাত পা নাড়িব, এমন করিয়া কর্ম্মহীন ক্ষুদ্র জীবনটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া, কাহনকে কড়া কড়িতে ভাঙ্গিয়া স্তূপাকার করিয়া তুলিব, এই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য? হিন্দুর দেবতা, এই কি তোমার বিধান যে, আমরা কেবল মাত্র, "হিঁদু" হইব, মানুষ হইব না?"

ইংরাজিতে একটা কথা আছে—"পেনি ওয়াইজ্, পাউণ্ড

কুলিশ্”—বাঙ্গলায় তাহার তর্জ্জমা করা যাইতে পারে কড়ায় কড়া, কাহনে কানা। অর্থাৎ কড়ার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে গিয়া কাহনের প্রতি ঢিলা দেওয়া হয়। তাহার ফল হয়, “বজ্র অঁাটন ফস্কা গিরো”—প্রাণপণ অঁাটুনির ত্রুটি নাই কিন্তু গ্রন্থিটি শিথিল।

আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। বিধিব্যবস্থা, আচার বিচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ করিতে গিয়া, মনুষ্যত্বের স্বাধীন উচ্চ অঙ্গের প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে।

সামাজিক আচার হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মনীতির ধ্রুব অনুশাসনগুলি পর্য্যন্ত সকলেরই প্রতি সমান কড়াক্কড় করাতে, ফল হইয়াছে, আমাদের দেশে সমাজনীতি ক্রমে সুদৃঢ় কঠিন হইয়াছে কিন্তু ধর্ম্মনীতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। এক জন লোক গরু মারিলে সমাজের নিকট নির্যাতন সহ্য করিবে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিবে, কিন্তু মানুষ খুন করিয়া সমাজের মধ্যে বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্থান পাইয়াছে এমন দৃষ্টান্তের বোধ করি অভাব নাই। পাছে হিন্দুর বিধাতার হিসাবে কড়াক্রান্তির গরমিল হয়, এই জন্য পিতা অষ্টমবর্ষের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দেন এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে জাতিচ্যুত হন; বিধাতার হিসাব মিলাইবার জন্য সমাজের যদি এতই সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে তবে উক্ত পিতা নিজের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের শত শত পরিচয় দিলেও কেন সমাজের মধ্যে আত্মগৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে? আমাদের সুসূক্ষ্ম হিসাবী হিন্দুসমাজ এমন কি অনেক সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্ত লোককে জানেন না যাহারা কুলরমণীকে কুলচ্যুত করিয়াও সমাজে উচ্চশিরে বিরাজ করে? ইহাকে কি কাকদন্তির হিসাব বলে? আমি যদি অস্পৃশ্য নীচ

জাতিকে স্পর্শ করি, তবে সমাজ তৎক্ষণাৎ সেই দক্তি-হিসাব সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করিয়া দেন, কিন্তু আমি যদি উৎপীড়ন করিয়া সেই নীচ জাতির ভিটামাটি উচ্ছিন্ন করিয়া দিই, তবে সমাজ কি আমার নিকট হইতে সেই কাহনের হিসাব তলব করেন? প্রতিদিন রাগদ্বেষ, লোভ, মোহ, মিথ্যাচরণে ধর্ম্মনীতির ভিত্তিমূল জীর্ণ করিতেছি অথচ স্নান, তপ, বিধিব্যবস্থার তিলমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। এমন কি দেখা যায় না?

আমি বলি না যে, হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্মনীতিমূলক পাপকে পাপ বলে না। কিন্তু মনুষ্যকৃত সামান্য সামাজিক নিষেধগুলিকেও তাহার সমশ্রেণীতে ভুক্ত করাতে যথার্থ পাপের ঘৃণ্যতা স্বভাবতই হ্রাস হইয়া আসে। অত্যন্ত বৃহৎ ভিড়ের ভিতর শ্রেণীবিচার দুরূহ হইয়া ওঠে। অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা, এবং সমুদ্রযাত্রা হইতে নর-হত্যা পর্য্যন্ত সকল পাপই আমাদের দেশে গোলে হরিবোল দিয়া মিশিয়া পড়ে।

পাপখণ্ডনেরও তেমনি শত শত সহজ পথ আছে। আমা-দের পাপের বোঝা যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে, তেমনি যেখানে সেখানে তাহা ফেলিয়া দিবারও স্থান আছে। গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম, অমনি গাত্রের ধূলা এবং ছোট বড় সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেল। যেমন রাজ্যে বৃহৎ মড়ক হইলে প্রত্যেক মৃত দেহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গোর দেওয়া অসাধ্য হয়, এবং আমীর হইতে ফকীর পর্য্যন্ত সকলকে রাশীকৃত করিয়া এক বৃহৎ গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া সংক্ষেপ অন্ত্যেষ্টি-সৎকার সারিতে হয়—আমাদের দেশে তেমনি খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে এত পাপ যে প্রত্যেক পাপের স্বতন্ত্র খণ্ডন করিতে গেলে সময়ে কুলায় না, তাই মাঝে মাঝে একেবারে ছোট বড়

সকলগুলাকে কুড়াইয়া অতি সংক্ষেপে এক সমাধির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিতে হয়। যেমন বজ্র আঁটন তেমন ফস্কা গিরো।

এইরূপে, পাপ পুণ্য যে মনের ধর্ম্ম, মানুষ ক্রমে সেটা ভুলিয়া যায়। মন্ত্র পড়িলে, ডুব মারিলে, গোময় খাইলে যে, পাপ নষ্ট হইতে পারে এ বিশ্বাস মনে আনিতে হয়। কারণ, মানুষকে যদি মানুষের হিসাবে না দেখিয়া যন্ত্রের হিসাবে দেখ, তবে তাহারও নিজেকে যন্ত্র বলিয়া ভ্রম হইবে। যদি সামান্য লাভ লোক্‌সান ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া আর কোন বিষয়েই তাহার স্বাধীন বুদ্ধিচালনার অবসর না দেওয়া হয়—যদি ওঠা, বসা, মেলামেশা, ছোঁওয়া খাওয়াও তাহার জন্য দৃঢ় নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে মানুষের মধ্যে যে একটা স্বাধীন মানসিক ধর্ম্ম আছে সেটা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে হয়। পাপ পুণ্য সকলই যন্ত্রের ধর্ম্ম মনে করা অসম্ভব হয় না এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তও যন্ত্রসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু অতি সূক্ষ্ম যুক্তি বলে, যদি মানুষের স্বাধীন বুদ্ধির প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র নির্ভর করা যায় তবে দৈবাৎ কাকদন্তির হিসাব না মিলিতে পারে। কারণ, মানুষ ঠেকিয়া শেখে—কিন্তু তিল-মাত্র ঠেকিলেই যখন পাপ, তখন তাহাকে শিখিতে অবসর না দিয়া নাকে দড়ি দিয়া চালানই যুক্তিসঙ্গত। ছেলেকে হাঁটিতে শিখাইতে গেলে পড়িতে দিতে হয়, তাহা অপেক্ষা তাহাকে বুড়া-বয়স পর্য্যন্ত কোলে করিয়া লইয়া বেড়ানই ভাল। তাহা হইলে, তাহার পড়া হইল না, অথচ গতিবিধিও বন্ধ হইল না। ধূলির লেশমাত্র লাগিলে হিন্দুর দেবতার নিকট হিসাব দিতে হইবে, অতএব মনুষ্যজীবনকে তেলের মধ্যে ফেলিয়া শিশির মধ্যে নীতি-মিউজিয়ামের প্রদর্শনদ্রব্যের স্বরূপ রাখিয়া দেওয়াই সুপরামর্শ।

ইহাকেই বলে কড়ায় কড়া, কাহনে কানা। কি রাখিলাম আর কি হারাইলাম সে কেহ বিচার করিয়া দেখে না। কবি-কঙ্কণে বাণিজ্যবিনিময়ে আছে—

"শুকুতার বদলে মুকুতা দিবে
ভেড়ার বদলে ঘোড়া।"

আমরা পণ্ডিতেরা মিলিয়া অনেক যুক্তি করিয়া শুক্তার বদলে মুক্তা দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। মানসিক যে স্বাধীনতা না থাকিলে পাপপুণ্যের কোন অর্থই থাকে না, সেই স্বাধীনতাকে বলি দিয়া নামমাত্র পুণ্যকে তহবিলে জমা করিয়াছি।

পাপপুণ্য, উত্থানপতনের মধ্য দিয়া আমাদের মনুষ্যত্ব উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে। স্বাধীনভাবে আমরা যাহা লাভ করি সেই আমাদের যথার্থ লাভ; অবিচারে অন্যের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করি তাহা আমরা পাই না। ধূলি কর্দ্দমের উপর দিয়া, আঘাতসংঘাতের মধ্য দিয়া, পতন পরাভব অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে যে বল সঞ্চয় করি, সেই বলই আমাদের চিরজীবনের সঙ্গী। মাটিতে পদার্পণ মাত্র না করিয়া, দুগ্ধফেনশুভ্র পুণ্যশয্যায় শয়ান থাকিয়া হিন্দুর দেবতার নিকটে জীবনের একটি অতি নিষ্কলঙ্ক হিসাব প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়—কিন্তু সে হিসাব কি? একটি শূন্য শুভ্র খাতা। তাহাতে কলঙ্ক নাই এবং অঙ্কপাত নাই। পাছে কড়া ক্রান্তি কাক দন্তির গোল হয় এই জন্য আয় ব্যয় স্থিতিমাত্র নাই।

নিখুঁৎ সম্পূর্ণতা মনুষ্যের জন্য নহে। কারণ, সম্পূর্ণতার মধ্যে একটা সমাপ্তি আছে। মানুষ ইহজীবনের মধ্যেই সমাপ্ত নহে। যাঁহারা পরলোক মানেন না, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন একটি জীবনের মধ্যেই মানুষের উন্নতি সম্ভাবনার শেষ নাই।

নিম্নশ্রেণীর জন্তুরা ভূমিষ্ঠকাল অবধি মানব-শিশুর অপেক্ষা অধিকতর পরিণত। মানবশিশু একান্ত অসহায়। ছাগ-শিশুকে চলিবার আগে পড়িতে হয় না। যদি বিধাতার নিকট চলার হিসাব দিতে হয় তবে ছাগশাবক কাকদন্তির হিসাব পর্য্যন্ত মিলাইয়া দিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের পতন কে গণনা করিবে?

জন্তুদের জীবনের পরিসর সঙ্কীর্ণ, তাহারা অল্প দূর গিয়াই উন্নতি শেষ করে—এই জন্য আরম্ভ কাল হইতেই তাহারা শক্ত সমর্থ। মানুষের জীবনের পরিধি বহুবিস্তীর্ণ, এই জন্য বহুকাল পর্য্যন্ত সে অপরিণত দুর্ব্বল।

জন্তুরা যে স্বাভাবিক নৈপুণ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে ইংরাজিতে তাহাকে বলে ইন্‌ষ্টিংক্ট্‌, বাঙ্গলায় তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সহজ সংস্কার। সহজ সংস্কার, অশিক্ষিত পটুত্ব একেবারেই ঠিক পথ দিয়া চলিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি ইতস্ততঃ করিতে করিতে ভ্রমের মধ্য দিয়া আপনার পথ সন্ধান করিয়া বাহির করে। সহজ সংস্কার পশুদের, বুদ্ধি মানুষের। সহজ সংস্কারের গম্যস্থান সামান্য সীমার মধ্যে, বুদ্ধির শেষ লক্ষ্য এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আবশ্যকের আকর্ষণ, চতুষ্পার্শ বাঁচাইয়া, পথ ঘাট দেখিয়া, ক্ষেত্র নিষ্কণ্টক করিয়া, সুবিধার পথ দিয়া আমাদিগকে স্বার্থপরতার সীমা পর্য্যন্ত লইয়া যায়; প্রেমের আকর্ষণ, আমাদিগকে সমস্ত গণ্ডীর বাহিরে লইয়া, আত্মবিসর্জ্জন করাইয়া, কখনো ভূতলশায়ী কখনো অশ্রুসাগরে নিমগ্ন করে। আবশ্যকের সীমা আপনার মধ্যে, প্রেমের সীমা কোথায় কেহ জানে না। তেমনি, পূর্ব্ব হইতে সমস্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া সমস্ত পতন সমস্ত গ্লানি হইতে রক্ষা করিয়া একটি নিরতিশয় সমতল

সমাজের মধ্যে নিরাপদে জীবন চালনা করিলে, সে জীবনের পরিণাম নিতান্ত সামান্য হয়।

আমরা মানবসন্তান বলিয়াই বহুকাল আমাদের শারীরিক মানসিক দুর্ব্বলতা; বহুকাল আমরা পড়ি, বহুকাল আমরা ভুলি, বহুকাল আমাদিগকে শিক্ষা করিতে যায়;—আমরা অনন্তের সন্তান বলিয়া বহুকাল ধরিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা, পদে পদে আমাদের দুঃখ, কষ্ট, পতন। কিন্তু সেই আমাদের সৌভাগ্য, সেই আমাদের চিরজীবনের লক্ষণ, তাহাতেই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে এখনও আমাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের শেষ হইয়া যায় নাই।

শৈশবেই যদি মানুষের উপসংহার হইত, তাহা হইলে মানুষের মত অপরিস্ফুটতা সমস্ত প্রাণীসংসারে কোথাও পাওয়া যাইত না, অপরিণত পদস্খলিত ইহজীবনেই যদি আমাদের পরিসমাপ্তি হয় তবে আমরা একান্ত দুর্ব্বল ও হীন তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বিলম্ববিকাশ, আমাদের ত্রুটি, আমাদের পাপ আমাদের সম্মুখবর্ত্তী সুদূর ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। বলিয়া দিতেছে, কড়া, ক্রান্তি, কাক দন্তি চোখ-বাঁধা ঘানির বলদের জন্য; সে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের পদচিহ্নিত একটি ক্ষুদ্র সুগোল চক্রের মধ্যে প্রতিদিন পাক খাইয়া সর্ষপ হইতে তৈল নিষ্পেষণ নামক একটি বিশেষ-নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহার প্রতি মুহূর্ত্ত এবং প্রতি তৈলবিন্দু হিসাবের মধ্যে আনা যায়—কিন্তু যাহাকে আপনার সমস্ত মনুষ্যত্ব অপরিমেয় বিকাশের দিকে লইয়া যাইতে হইবে তাহাকে বিস্তর খুচরা হিসাব ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে।

উপসংহারে একটি কথা বলিয়া রাখি, একিলিস্ এবং কচ্ছপ

নামক একটি ন্যায়ের কুতর্ক আছে। তদ্দ্বারা প্রমাণ হয় যে একিলিস্ যতই দ্রুতগামী হউক মন্দগতি কচ্ছপ যদি একত্রে চলিবার সময় কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর থাকে তবে একিলিস্ তাহাকে ধরিতে পারিবে না। এই কুতর্কে তার্কিক অসীম ভগ্নাংশের হিসাব ধরিয়াছেন—কড়াক্রান্তি, দন্তিকাকের দ্বারা তিনি ঘরে বসিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে কচ্ছপ চিরদিন অগ্রবর্ত্তী থাকিবে। কিন্তু এদিকে প্রকৃত কর্ম্মভূমিতে একিলিস্ এক পদক্ষেপে সমস্ত কড়াক্রান্তি, দন্তি কাক লঙ্ঘন করিয়া কচ্ছপকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়। তেমনি আমাদের পণ্ডিতেরা সূক্ষ্মযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন, যে, কড়াক্রান্তি, দন্তিকাক লইয়া আমাদের কচ্ছপসমাজ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অগ্রসর হইয়া আছে—কিন্তু দ্রুতগামী মানবপথিকেরা এক এক দীর্ঘ পদক্ষেপে আমাদের সমস্ত সূক্ষ্ম প্রমাণ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে যদি ধরিতে চাই তবে চুলচেরা হিসাব ফেলিয়া দিয়া রীতিমত চলিতে আরম্ভ করা যাক্। আর তা যদি না চাই, তবে অন্ধ আত্মাভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য চোখ বুজিয়া পাণ্ডিত্য করা অলস সময়যাপনের একটা উপায় বটে। তাহাতে আমাদের পুণ্য প্রমাণ হয় কি না জানি না, কিন্তু নৈপুণ্য প্রমাণ হয়।

জন্মদিন।

উমারাণি—

সেই সে পুরাণো সুরে, বর্ষ চক্র ঘুরে ঘুরে
জন্মদিনে তব উপনীত।
তুমিও তো সেই মেয়ে, আজি তোর পানে চেয়ে
কেন হৃদি হয় বিগলিত ?

—একি দুঃখ?—একি সুখ?—কেন মা ও চাঁদমুখ—
দেখি—দেখি—দেখিতে না চাই।
ইচ্ছা, সুধু শুনি কানে বেঁচে আছ প্রাণে প্রাণে,
"দৃষ্টি" দিতে সাহস না পাই।
কভু না বাসনা করি হও তুমি রাজ্যেশ্বরী,
সুখে থাক করি আশীর্ব্বাদ।
উদার-উন্নত প্রাণে চাহিবে সংসার পানে—
এই শিক্ষা হোক্—বড় সাধ।

সারসংগ্রহ।

উপন্যাসলেখা।

বিলাতী উপন্যাস-লেখকেরা আজকাল গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন "পুঁজি তো ফুরাইয়া গিয়াছে, আর কি লিখিব?" কি লিখিবেন ভাবিয়া আকুল। তাঁহাদের সমাজ-অধিষ্ঠাত্রী প্রবীণা "মিসেস্ গ্রণ্ডী"র শাসনে তাঁহারা অস্থির। স্থূলকায়া মিসেস্ গ্রণ্ডী সব সহ্য করেন—খুন, জখম, জাল, জুয়াচুরী হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি সকলরকম দুষ্প্রবৃত্তিকে তিনি প্রশ্রয় দেন এবং ঐ সকলের চর্চ্চায় অসীম আগ্রহ প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন না; কিন্তু বিবাহ-বন্ধনের বাহিরে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সামান্য বে-আইনী ভাব দেখিলেই তিনি আগুন হইয়া উঠেন। এত বাঁধাধরার ভিতর থাকিয়া উপন্যাস লিখিয়া আর সুখ কি?

সম্প্রতি মিসেস্ লিন লিণ্টন্ এই সুরে তাঁহার মনের দুঃখ

প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সংসারে প্রত্যহ কটাই বা খুন হয়, আর ক'জন লোকই বা তাহার প্রতিবাসীর ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়? ভালবাসার মত বিশ্বব্যাপী জিনিষ আর কি আছে? এ বিষয়ে লেখকদের হাত পা বাঁধিয়া ফেলিলে তাহাদের উপর বড়ই অত্যাচার করা হয়। মিসেস্ লিণ্টন্ এক-জন উন্নতিশীল স্ত্রীলোক—তিনি সমাজের উপর বড়ই নারাজ। আজকাল বিলাতে এই ধরণের স্ত্রীলোকের একটা দল হইয়া উঠিয়াছে।

কিছুদিন হইল, লণ্ডনের স্ত্রীস্বাধীনতা সমিতির অধিবেশনে মিস্ কসেন্স্ এক দীর্ঘ বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন "পুরুষজাতি আমাদের পরম শত্রু, চিরকাল আমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছে ও করিবে। আমাদের আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বক্তৃতার কাল গিয়াছে—এস সকলে আমরা এবার আমাদের কর্ত্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হই। বিনা রক্তপাতে কখনও কোন সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। স্ত্রী-লোকেরা ডাইনামাইটের ব্যবহার বেশ জানে—তবে আর ভয় কি? বন্দুকের ব্যাপারটা ভালরকম শিখিলে পুরুষেরা আর আমাদের এত তাচ্ছিল্য করিতে পারিবে না। আপাততঃ পুরুষ-জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিতে হইবে, পরে পুত্রসন্তান বিনাশ জন্য এক আইন জারী করিতে হইবে।"

মিস্ কসেন্সের সখীরাও এইসকল কথা শুনিয়া একটু বিচলিত হইলেন। শেষে যখন বড় বাড়াবাড়ি হইতে লাগিল তখন একজন পুরুষজাতীয় প্রতিবাসী কৌটায় করিয়া একটা ইন্দুর আনিয়া বক্ত্রীর গায়ে ছাড়িয়া দিতে উদ্যত হইলে সুন্দরী তাড়াতাড়ি বক্তৃতা শেষ করিলেন।

কিন্তু উপন্যাস লেখার বিষয় মিসেস্ লিণ্টনের সহিত অনেক পুরুষজাতীয় উপন্যাস-লেখকেরও ঐক্যমত দেখা যায়। মিসেস্ লিণ্টনের মতে আদিরসাত্মক উপন্যাসগুলি আলমারীতে বন্ধ করিয়া রাখিলেই চলিবে, যাহাতে অপরিণতবয়স্ক যুবক যুবতীদের হাতে না পড়ে।

টমাস্ হার্ডি সাহেবও ঐরূপ মতাবলম্বী, কিন্তু তিনি বলেন যে, ঐ সকল উপন্যাস মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া শেষে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া মূল্য একটু অধিক ধার্য্য করিলে আর কোন গোল হইবে না। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই সকল উপায় স্রোতের মুখে বালির বাঁধ দেওয়ার ন্যায় নিষ্ফল হইবে। উহা একটা খাতিরের কথা মাত্র।

ওয়াল্টর বেসাণ্ট্ সাহেব ইহাঁদের ন্যায় সমাজদ্রোহী নহেন। তিনি সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারিতা ও কপট প্রেমকে স্থান দিতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। এই সকলের দ্বারা যে সমাজের মূলে আঘাত লাগে, উপন্যাস-লেখক তাহা দেখাইয়া দিলে বিশেষ উপকার আছে সত্য, কিন্তু আদিরস সম্বন্ধে ফ্রান্সের অনুকরণ করিতে গেলে বিপরীত ফল দাঁড়াইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বেসাণ্ট্ বলেন, লিখিবার বিষয় সম্বন্ধে তিনি ধরাকাট করিতে চাহেন না, কিন্তু লিখিবার প্রণালীটা ভাল হওয়া আবশ্যক। ইংরাজী সাহিত্যে কপট প্রেমের অভাবই বা কোথায়? হার্ট অব মিড্‌লোথিয়ান, অ্যাডাম্ বীড, ভিকার অব ওয়েক্‌ফিল্ড, জেন আয়ার, ইষ্ট লীন প্রভৃতি গ্রন্থে গুপ্তপ্রেম যথেষ্ট আছে। এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ইচ্ছা করিলেই এই সকল উপন্যাস পাঠ করিতে পারেন, তাহাতে কোনও বাধা নাই। তথাপি মিসেস্ লিণ্টনের দল সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা

ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারিতা ইংলণ্ডে স্থাপন করিতে চাহেন। প্রস্তাবটা আমাদের মতে অত্যন্ত গর্হিত। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে ইংলণ্ডের যে একমাত্র শ্রেষ্ঠতা আছে তাহা লোপ হইবার সম্ভাবনা। মানবশরীরে পাশব প্রবৃত্তির প্রাবল্য অস্বীকার করা বিড়ম্বনা মাত্র। সেই প্রবৃত্তির দমন করিয়া রাখাই সমাজ ও ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য। মিসেস্ গ্রণ্ডীকে এতদিন পরে পদচ্যুত করিয়া দেশে স্বেচ্ছাচারিতা প্রচার করিলে ফ্রান্সের মত অবস্থা দাঁড়াইবে। ফ্রান্সে যে পরিমাণে অশ্লীলতা ও কদর্য্যতা দেখা যায়, ইংরাজ সমাজে মিসেস্ গ্রণ্ডীর শাসনগুণে ততদূর এখনও হয় নাই। তবে যদি ইংরাজ উপন্যাস-লেখকগণ জোলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটা অবস্থান্তর ঘটিবে।

বেসাণ্ট্ সাহেব সমাজের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, নীচ প্রবৃত্তির আলোচনা সাধারণ ইংরাজসমাজে আদৌ প্রচলিত নাই। তিনি বলেন—প্রায় প্রত্যেক পুরুষের জীবনে এমন একটি পরিচ্ছেদ আছে যাহা সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কখনও সাধারণ্যে প্রকাশ করে না। এই পরিচ্ছেদটি বিবাহের পর একেবারে মুড়িয়া রাখা হয় এবং আর কখনও খোলা হয় না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের—বিশেষতঃ একটু উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের জীবনে এরূপ কোনও গোপন পরিচ্ছেদ নাই। ইংলণ্ডের শিক্ষিত স্ত্রীসম্প্রদায়ের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যায়—এবং এই সম্প্রদায় এখন যথেষ্ট প্রবল ও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই শ্রেণীর ইংরাজ পুরুষ কখনই প্রায় স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করে না এবং বিবাহের পূর্ব্বে ভাবী পত্নীকে সন্দেহ করা ত তাহাদের কল্পনারও অতীত।

শেষের কথাগুলিতে বেসান্ট্ সাহেব শিক্ষিত স্ত্রীসম্প্রদায়ের সম্ভ্রম বজায় রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু মোটের উপর এ বিষয়ে উপন্যাস-লেখকেরা যাহাতে বাড়াবাড়ি না করেন তাঁহার এই-রূপ অভিপ্রায়। ধর্ম্মের সহায় হইয়া সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করাই সাহিত্যর মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি তাহার বিপরীত হয়, যদি তাহার দ্বারা নীচ প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইতে থাকে, যদি উপন্যাসে সভ্য মানব আফ্রিকার অসভ্য অরণ্যবাসীদের তুল্যরূপে অঙ্কিত হয়েন তাহা হইলে সাহিত্যের দ্বারা সমাজের কি উপকার সাধন হইবে?

দারিদ্র্য ও অপরাধ।

বিভিন্ন দেশের আর্থিক অবস্থা ও অপরাধের সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে, দারিদ্র্যের সহিত অপরাধের কি যোগ তাহা জানা যাইতে পারে। এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া যদি জানা যায় যে, যেখানে দারিদ্র্যের কষ্ট সেইখানেই অপরাধের বাহুল্য, তাহা হইলেই প্রমাণ হয় যে, দারিদ্র্য ও অপরাধের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

য়ুরোপের চৌর্য্য অপরাধের তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

ইটালি,	১৮৮০—৮৪	প্রতি লক্ষ নিবাসীর হার-অনুসারে চৌর্য্য অপরাধের বাৎসরিক বিচার	২২১
ফ্রান্স,	১৮৭৯—৮৩	ঐ	১২১
বেলজিয়ম,	১৮৭৬—৮০	ঐ	১৪৩
জর্ম্মানি,	১৮৮২—৮৩	ঐ	২৬২
ইংলণ্ড,	১৮৮০—৮৪	ঐ	২২৮
স্কট্লণ্ড,	১৮৮০—৮৪	ঐ	২৮৯

আয়রলণ্ড, ১৮৮০—৮৪	ঐ	১০১
হঙ্গারি, ১৮৭৬—৮০	ঐ	৮২
স্পেন্, ১৮৮৩—৮৪	ঐ	৭৪

এক্ষণে দেখা যাউক, এই তালিকা হইতে কি প্রমাণ হয়। ইহা জানা কথা যে, য়ুরোপের মধ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সদেশ সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। ইংলণ্ডের ধন-সংস্থান ইটালি অপেক্ষা প্রায় ছয় গুণ অধিক; তথাপি, ইটালি অপেক্ষা ইংলণ্ডের চৌর্য্য অপরাধের সংখ্যা অধিক। আয়রলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সের ধন-ঐশ্বর্য্য অসংখ্য-গুণে অধিক, তথাপি, আয়রলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সে চৌর্য্য অপরাধের সংখ্যা অধিক। স্পেন্ য়ুরোপের মধ্যে অত্যন্ত দরিদ্র ও স্কট্লণ্ড একটি বেশ ধনশালী দেশ—কিন্তু উহাদের অপরাধ-তালিকা তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, স্পেন অপেক্ষা স্কট্লণ্ডে চৌর্য্য অপরাধের সংখ্যা প্রায় চারি গুণ অধিক।

ইংলণ্ডের সহিত আয়রলণ্ডের অপরাধ-তালিকা তুলনা করিলে আরও আশ্চর্য্য হইতে হয়। কারণ, প্রায় একই নিয়মানুসারে ঐ উভয় দেশের অপরাধ-তালিকা প্রস্তুত হয়—উভয় দেশের রাজ-নিয়ম সাধারণতঃ প্রায় একই—উভয় দেশেই আইন বলবৎরূপে কার্য্যে পরিণত—উভয় দেশের বিচার কার্য্য প্রায় একরূপে নির্ব্বাহ হয়। সুতরাং এই উভয় দেশের অপরাধ-তালিকা যেরূপ তুলনার যোগ্য এরূপ আর কোথাও সম্ভব নহে। এক্ষণে উল্লিখিত তালিকাটি মিলাইয়া দেখ, দেখিবে, আয়রলণ্ড যদিও এত গরিব তবু তথাকার চৌর্য্য অপরাধের সংখ্যা ইংলণ্ড অপেক্ষা অর্দ্ধেকেরও কম। আবার ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের অপরাধ-তালিকা তুলনা করিয়া দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলণ্ডের অপরাধ সংখ্যা পাঁচ ছয় গুণ

অধিক। দারিদ্র্য হইতেই অপরাধের উৎপত্তি একথা যদি মানা যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ অপরাধ বিষয়ে অগ্রগণ্য হইবার কথা; যেহেতু ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশ অতি অল্পই আছে। কিন্তু আসলে কি দেখা যায়?—ভারতবর্ষীয়-দিগের ন্যায় আইন-ভীরু জাতি আর একটি আছে কি না সন্দেহ। যদি বল, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে তুলনাই হইতে পারে না, কারণ তাহাদের মধ্যে আচার ব্যবহার ধর্ম্মে আকাশ পাতাল প্রভেদ—আমাদের বক্তব্য তো তাহাই—অর্থাৎ, শুধু দারিদ্র্যের উপর অপরাধের ন্যূনাধিক্য নির্ভর করে না।

ইহার আর একটি বলবৎ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ইংলণ্ডের কয়েদী-তালিকা তুলনা করিয়া দেখিলে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, শীতকালে, যখন গরিবদের কষ্টের আর সীমা থাকে না, সেই সময়েই অপরাধ-সংখ্যা কম, আর, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে যখন কাজকর্ম্মের খুব সুবিধা সেই সময়েই অপরাধের আধিক্য। অতএব দেখা যাইতেছে, দেশের ভৌতিক সম্পদে অপরাধ-প্রবণতা তিরোহিত হয় না—ভৌতিক উন্নতি হইতে যেমন কতকগুলি সুফল, তেমনি কতকগুলি কুফলও উৎপন্ন হয়। ভৌতিক উন্নতি হইতে অনেক সময়ে নৈতিক অবনতি উৎপন্ন হয়—লাম্পট্য, পান-দোষ, আলস্য, বিলাসিতা ইহার অপরিহার্য্য সহচর। নৈতিক উন্নতি না হইলে শুধু ভৌতিক উন্নতিতে কোনও জাতির প্রকৃত মঙ্গল নাই। মসিয়ো ডে লাভ্লে বলেন, "মনুষ্যের শরীর মন হৃদয়ের সমগ্র উন্নতিতেই মনুষ্যের পূর্ণতা—পারিবারিক স্নেহ-মমতা, মানব-প্রেম, এবং সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য ও রচনা-সৌন্দর্য্য সম্ভোগে অনুরাগ ইহাই হৃদয়ের উ-তির বিষয়" এই মহান আদর্শের দিকে মানব যে পরিমা

অগ্রসর হইবে সেই পরিমাণে দুষ্কর্ম্ম অপরাধ মানব-সমাজ হইতে তিরোহিত হইবে। ভৌতিক ধন-ঐশ্বর্য্য যদি এই উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হয়, তবেই তাহা হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হয়। নচেৎ অর্থই অনর্থের মূল হইয়া উঠে।

প্রসঙ্গ কথা।

কোন কোন ইংরাজি লেখক বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে 'গ্র্যাটিটুড্' শব্দের কোন প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না, আর সেই জন্য তাঁহাদের সিদ্ধান্তমতে এদেশে 'গ্র্যাটিট্যুড্' জিনিষটাই নাই। তাঁহারা বোধ হয় বঙ্গভাষায় কৃতজ্ঞতা শব্দ পর্য্যন্ত পৌঁছান নাই। যা হোক্ যুক্তিটা হচ্ছে এই যে, যে দেশে যে কথা নাই, সে দেশে সে জিনিষও নাই। যুক্তিটা সব সময়ে খাটেনা। সংস্কৃত ভাষায় প্যারাডক্স্ শব্দের প্রতিশব্দ না পাওয়া গেলেও প্যারাডক্স্ জিনিষটা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শব্দকে ব্রহ্ম স্থির করিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা কথার মারপেঁচে বিশ্বজগৎ উড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

গতমাসের সাধনার সারসংগ্রহে প্রাচীন শূন্যবাদের যে একটি দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছিল, তাহাতে কথার ভেল্কির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। গম্যমানগতাগত ইত্যাদি দুই চারিটি কথা [illegible]াইয়া ঠিক হইল যে কিছুই নাই; সুতরাং যুক্তিও নাই, কথা-[illegible]ও নাই। তর্ক করিয়া প্রমাণ করা যে, তর্ক করিতেছি না—সে

তর্কের বাহাদুরী আছে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে যে, কিল্‌কেনির বিড়ালে এমন যুদ্ধ করে যে, দুই বিড়ালের দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর, তাহাদের লাঙ্গুল ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমাদের শূন্যবাদীর কথাগুলি আপনা-আপনির মধ্যে কাটা-কাটি করিয়া কিছুই বাকী রাখে না। কিলকেনির বিড়ালদের তবু লাঙ্গুলগুলো উদ্বৃত্ত থাকে।

এইপ্রকার কথার ভেক্কি যে খালি আমাদেরই এক বিশেষত্ব তা' নয়। প্রাচীন হিন্দুরা গ্রীকদের নিকট পূর্ব্বোক্ত তর্কটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কি গ্রীকরা হিন্দুদের নিকট এ বিষয়ে ঋণী, ইহা নির্ণয় করা কঠিন। গ্রীক দর্শনশাস্ত্রে শূন্যবাদীর গম্যমানগতাগত যুক্তিটি অন্য আকারে পাওয়া যায়। গ্রীক দার্শনিক জে.নো তর্ক করিতেন যে গতি অসম্ভব; কেন না, কোন বস্তু, হয়, যে স্থানে আছে সেই স্থানেই আছে, নয়, যে স্থানে নাই সেই স্থানে আছে। যে স্থানে আছে সে স্থানে থাকিলে গতি হইল না। আর যে স্থানে নাই সে স্থানে ত থাকিতেই পারে না। অতএব গতি অসম্ভব।

গতি সম্বন্ধে জে.নোর আর একটি তর্ক ছিল। মনে কর, কোন লোক ঘণ্টায় এক মাইল চলিতে পারে, এবং আর এক ব্যক্তি ঘণ্টায় দশ মাইল চলে। মনে কর যে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা দশ মাইল অগ্রসর হইয়া আছে। দুই জনেই এক সময়ে চলিতে আরম্ভ করিল। দ্রুতগামী দ্বিতীয় ব্যক্তি যতক্ষণে দশ মাইল গেল, মন্দগামী অগ্রবর্ত্তী প্রথম ব্যক্তি ততক্ষণে একমাইল গিয়াছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি অপে- সে এক মাইল অগ্রে রহিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি যতক্ষণে এই ১

মাইল গেল, প্রথম ব্যক্তি ততক্ষণে আরও এক মাইলের দশমাংশে উপস্থিত হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি যতক্ষণে এই এক মাইলের দশমাংশে পৌঁছিল, প্রথম ব্যক্তি ততক্ষণে আরও এক মাইলের শতাংশ গিয়াছে। ইত্যাদিক্রমে দ্বিতীয় ব্যক্তি যতই অগ্রসর হয়, প্রথম ব্যক্তি আরও অগ্রবর্ত্তী থাকে। উভয়ের ব্যবধান অনন্তকাল দশমাংশ করিয়া হ্রাস হইতে থাকে, কিন্তু সম্পূর্ণ লোপ হয় না। অতএব এ যুক্তিমতে দ্বিতীয় ব্যক্তি কখনও প্রথম ব্যক্তিকে ধরিতে পারে না অথবা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। অথচ প্রকৃত পক্ষে দুই ঘণ্টায় দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন কুড়ি মাইল উত্তীর্ণ হইয়াছে, প্রথম ব্যক্তি তখন দুই মাইল মাত্র চলিয়াছে, অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে আট মাইল ছাড়াইয়া গিয়াছে।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক স্যর উইলিয়ম হ্যামিল্টনের নিকট জেনোর এই তর্ক অকাট্য মনে হইত। তবে তাঁহার মতে সত্যের ধারণা মাত্রেরই মধ্যে একটি আত্মখণ্ডন আছে। তিনি এই আত্মখণ্ডনের অনেকগুলি উদাহরণ দিতেন। যথা—

(১) সসীমের মধ্যে অসীম থাকিতে পারে না। অথচ বস্তু মাত্রেরই বিভাগের সীমা নাই। অতএব অসীম সসীমের অন্তর্গত রহিয়াছে—ইহা একটি আত্মখণ্ডন।

(২) অসীমের আদি অন্ত নাই। অথচ সমগ্র অতীতকাল অসীম হইলেও এই মুহূর্ত্তে তাহার অন্ত। এবং সমগ্র ভবিষ্যৎ অসীম হইলেও এই মুহূর্ত্তে তাহার আরম্ভ। অতএব অসীমের সীমা দেখা যায়, ইহাও একটি আত্মখণ্ডন।

প্রাচীন হিন্দুদের কিন্তু একটি বড় গুণ ছিল। একটা তর্ক

একবার সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে, তাহার দৌড় যতদূরই হোক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত যাইতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। গম্যমানগতাগত এক তর্ক আরম্ভ করিয়া দাঁড়াইল যে কিছুই নাই। তাহাই সই। কিছুই যে নাই তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। কি করিব? তর্কে দাঁড়াইল যে কিছুই নাই, এখন কিছুই নাই না বলিলে চলিবে কেন? প্রাচীন হিন্দুরা সত্য সত্যই "লজিক্যাল" ছিলেন।

এই লজিকাল প্রবৃত্তির ফল আমরা হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে পদে পদে দেখিতে পাই। হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব এই যে, পৃথিবীর সমস্তই মায়া, আমাদের সুখ দুঃখ সমস্তই মায়া, সামাজিক পারিবারিক সম্বন্ধ সবই মায়া; পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী ইত্যাদির সহিত ভক্তি, স্নেহ ও প্রীতিবন্ধন সমস্তই মায়াবন্ধন মাত্র। যতদিন আমরা মায়াপাশে আবদ্ধ, ততদিন আমাদের মুক্তি নাই। এই সমস্ত মায়াবন্ধন ছিন্ন করাই মুক্তির একমাত্র উপায়। অতএব, হে ধর্ম্মপথাবলম্বি, মায়াবন্ধন ছিন্ন করিবার উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হও।

কথাগুলি শুনিতে খুব জাঁকালো বটে। পৃথিবীর সমস্তই মায়া, মায়া-সংস্কার ত্যাগ না করিলে মুক্তি নাই, মায়া কাটাইতে পারিলেই আমরা ব্রহ্মে লীন হইব, কথাগুলো বড়রকমের শোনায় বটে। একদল আধুনিক হিন্দু এই 'বিরাট' কল্পনা লইয়া নিতান্তই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু এই মায়াতত্ত্বের লজিকাল ফল কি তা' বোধ হয় আধুনিক হিন্দু ভাবিয়া দেখেন না।

প্রাচীন হিন্দু, কিন্তু, কথাগুলি বেশ ভালরকম করিয়াই বুঝিয়া দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সংস্কারগুলি ত্যাগ করা নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে। কতকগুলি সংস্কার এত বদ্ধমূল যে, সেগুলি ত্যাগ করা একান্তই দুষ্কর। পারিবারিক পবিত্র সম্বন্ধসকল দার্শনিক মায়া-সংস্কার বলিয়া বুঝাইয়া দিলেও সে সকল সম্বন্ধের পবিত্র ভাব মন হইতে দূর করা প্রায় অসম্ভব; সে সকল সম্বন্ধের পবিত্রতার উপর হস্তক্ষেপ কল্পনা করিতেও বীভৎস মনে হয়। পারিবারিক পবিত্র সম্বন্ধ দূরে থাক্, এমন কি খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার এতদূর বদ্ধমূল যে, যে সকল দ্রব্য আমরা অখাদ্য বলিয়া জ্ঞান করি, সে সকল দ্রব্য আহার করিবার কল্পনাতেও আমাদের একান্ত ঘৃণা উপস্থিত হয়।

প্রাচীন হিন্দুদের লজিকাল বুদ্ধি সহজেই বুঝিতে পারিল যে, এপ্রকার বদ্ধমূল দৃঢ় সংস্কার দূর করিতে হইলে তাহার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। বন্ধনগুলি এত দৃঢ় যে, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ইহা একেবারে ছিন্নভিন্ন করিয়া না ফেলিলে উপায় নাই। খাদ্য অখাদ্য ইত্যাদি সংস্কার দূর করিতে হইলে খাদ্য অখাদ্য সমভাবে আহার অভ্যাস করিতে হয়; এমন কি, বরং অখাদ্য সম্বন্ধে ঘৃণা একেবারে দূর করিতে হইলে অখাদ্যটাই নিত্য সেবন করা একমাত্র উপায় হইয়া উঠে। পারিবারিক সম্বন্ধের পবিত্র ভাবকে সংস্কার জ্ঞান করিয়া সেই সংস্কার একেবারে দূর করিতে হইলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক এই পবিত্রতাকে কলুষিত করা, ও কর্দ্দমে নিক্ষিপ্ত করিয়া পদতলে দলন করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। এ সকল সংস্কার কি সহজে দূর করা যায়? পবিত্র অপবিত্রে ভেদ নাই, অতএব

পবিত্রকে অপবিত্র করিয়া পবিত্র অপবিত্র সংস্কার হইতে মুক্তি পাও, ইহা তন্ত্রের একটি শিক্ষা।

বৌদ্ধদেরও ঠিক হিন্দুদের ন্যায় তন্ত্র আছে। তাহাদেরও এই একই শিক্ষা। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে গেলে, বলিতে হইবে যে, মূল কথাটা যদি সত্য হয়, সবই যদি যথার্থই মায়া হয়, আর এই মায়াবন্ধন ছিন্ন করাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তান্ত্রিক শিক্ষাটা যৌক্তিক বটে। মানুষের মন হইতে সংস্কার দূর করা সহজ ব্যাপার নয়। যদি সংস্কার ছাড়ানই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তন্ত্রের বীভৎস অনুষ্ঠানগুলিই একমাত্র উপায়। যেমন রোগ তেমনি ঔষধ আবশ্যক; সংস্কার যে পরিমাণে বদ্ধমূল, তার উপর অত্যাচারও সেই পরিমাণে আবশ্যক, নহিলে সংস্কার নির্ম্মূল করা যায় না। তন্ত্রের অনুষ্ঠানগুলিতে যদি সংস্কার নির্ম্মূল না হয়, তাহা হইলে আর কিছুতে হইবার যো নাই, আর তার চেয়ে কমে হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

অল্প দিন হইল আমি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কোন পুস্তকে কতকগুলি তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের বিবরণ পাড়তেছিলাম। এ তন্ত্র বৌদ্ধদের। সে অনুষ্ঠানগুলা যে কি ভয়ানক বীভৎস তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমরা যাহা কিছু পবিত্র বলিয়া জানি—আমাদের পবিত্রতম পারিবারিক সম্বন্ধসকলের উপর একান্ত ব্যভিচার হচ্ছে সেই তন্ত্রের অনুষ্ঠান। এবিষয়ে ইঙ্গিতেও উল্লেখ করিতে যার পর নাই ঘৃণার উদ্রেক হয়।

তবে যুক্তি অনুসারে আপত্তি করিবার যো নাই। কুৎসিৎ

অথবা ঘৃণাত্মক বলিলে, তান্ত্রিক উত্তর করিবে "যদি মায়াই হয়, যদি এ সকল কেবল সংস্কারমাত্রই হয়, আর যদি সংস্কার দূর করা ও মায়াবন্ধন উন্মোচন করাই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হয়, তবে এ সকল অনুষ্ঠানে আপত্তিই বা কি? আর ইহা ভিন্ন অন্য উপায়ই বা কি? অন্য উপায় থাকিলেও এই 'বীভৎস' উপায় অবলম্বনে দোষ কি? তুমি যদি কোন বিশেষ কার্য্যকে 'বীভৎস' বল, তাহা হইলে তোমার এখনও সংস্কার যায় নাই, তুমি এখনও মায়াবদ্ধ; তোমার পক্ষেই বরং এই সকল 'বীভৎস' অনুষ্ঠান আরও বেশী আবশ্যক।" আমরা যদি মূল কথাটা মানিয়া লই, তাহা হইলে এ যুক্তির উত্তরে আমাদের কথা কহিবার যো নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা "বিরাট লয়তত্ত্ব" হিন্দুমাত্রেরই অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পৈশাচিক অনুষ্ঠানগুলা কিরূপ মনে হয়? তাঁহারা বোধ হয় এই লজিকাল পরিণাম ভাবিয়া দেখেন নাই। যদি ভাবিয়া দেখা সত্ত্বেও লয়তত্ত্ব আশ্রয় করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন, তবে বলিতে হয়—যিনি ইচ্ছা মুক্তি লাভ করুন, আমরা মায়াপাশেই বদ্ধ হইয়া থাকি। লয়প্রাপ্তির জন্য আমাদের তিলমাত্র তাড়া নাই।

সমালোচনা।

অশোকচরিত। শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত।

এই গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় দুর্লভ। শুধু বঙ্গভাষায় কেন, কোন বিদেশীয় গ্রন্থে অশোকের চরিত এত বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে

যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা সমস্ত জানিতে হইলে অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। তাহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। গ্রন্থকার তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ফল একাধারে সন্নিবিষ্ট করিয়া, সাধারণ পাঠকবর্গের মহৎ উপকার করিয়াছেন। এই অশোকচরিত পাঠ করিলে তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, অবস্থা, ভাষা, সভ্যতার উন্নতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গ্রন্থের আর একটি গুণ এই যে, ইহা অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের উপসংহারে, অশোক-চরিত সম্বন্ধীয় একটি ক্ষুদ্র নাটিকা সংযোজিত হইয়াছে। ইহাকে একটি "ফাউ"স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। "ফাউ"টিও ফেলার সামগ্রী নহে—উহাতেও একটু বেশ রস আছে।

পঞ্চামৃত। শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত।

এই গ্রন্থে আমাদের দেশের পূর্ব্বতন ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদিগের যে সকল কল্যাণপ্রদ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা বাছা বাছা রত্ন। এই গ্রন্থখানি কবিরত্ন মহাশয় অনাথ কুষ্ঠরোগীদিগের উপকারার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি ত সকলের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেনই; কিন্তু জনসমাজে এক জন যদি শারীরিক ব্যাধিতে প্রপীড়িত হয়, তবে তাহার তুলনায় শতসহস্র ব্যক্তি মানসিক ব্যাধিতে প্রপীড়িত। শেষোক্ত ব্যাধির ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা শুভানুধ্যায়ী দয়ার্দ্রচিত্ত সাধু ব্যক্তি-দিগের অমৃতময় আশ্বাসবাণী এবং উপদেশ। বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় শেষোক্তরূপ মহৌষধ স্তরে স্তরে সাজান রহি-য়াছে। এই জন্য কবিরত্ন মহাশয়ের বিরচিত গ্রন্থ জয়যুক্ত হউক, ইহা আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

সাধনা।

—⚬⚬⚬—

বাঙ্গলা লেখক।

লেখকদিগের মনে যতই অভিমান থাক্, এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, আমাদের দেশে পাঠক-সংখ্যা অতি যৎ-সামান্য। এবং তাহার মধ্যে এমন পাঠক "কোটিকে গুটিক" মেলে কি না সন্দেহ, যাঁহারা কোন প্রবন্ধ পড়িয়া, কোন সুযুক্তি শুনিয়া আপন জীবনযাত্রার লেশমাত্র পরিবর্ত্তন সাধন করেন। নির্জ্জীব নিঃস্বত্ব লোকের পক্ষে সুবিধাই একমাত্র কর্ণধার, সে কর্ণের প্রতি আর কাহারো কোন অধিকার নাই।

পাঠকের এই অচল অসাড়তা লেখকের লেখার উপরও আপন প্রভাব বিস্তার করে। লেখকেরা কিছুমাত্র দায়িত্ব অনু-ভব করেন না। সত্য কথা বলা অপেক্ষা চতুর কথা বলিতে ভাল-বাসেন। সুবিজ্ঞ গুরু, হিতৈষী বন্ধু, অথবা জিজ্ঞাসু শিষ্যের ন্যায় প্রসঙ্গের আলোচনা করেন না, কূটবুদ্ধি উকিলের ন্যায় কেবল কথার কৌশল এবং ভাবের ভেল্কী খেলাইতে থাকেন।

এখন দাঁড়াইয়াছে এই—যে যার আপন আপন সুবিধার সুখ-শয্যায় শয়ান, লেখকদিগের কার্য্য, স্ব স্ব দলের বৈতালিক বৃত্তি করিয়া সুমিষ্ট স্তবগানে তাঁহাদের নিদ্রাকর্ষণ করিয়া দেওয়া।

মাঝে মাঝে দুই দলের লেখক রঙ্গভূমিতে নামিয়া লড়াই করিয়া

থাকেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধের যত কৌশল দেখাইতে পারেন ততই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট বাহবা লাভ করিয়া হাস্যমুখে গৃহে ফিরিয়া যান।

লেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা হীনবৃত্তি আর কিছু হইতে পারে না। এই বিনা বেতনে চাটুকার এবং যাদুকরের কাজ করিয়া আমরা সমস্ত সাহিত্যের চরিত্র নষ্ট করিয়া দিই।

মানুষ যেমন চরিত্রবলে অনেক দুরূহ কাজ করে, অনেক অসাধ্য সাধন করে, যাহাকে কোন যুক্তি, কোন শক্তির দ্বারা বশ করা যায় না তাহাকেও চরিত্রের দ্বারা চালিত করে, এবং দীপ-স্তম্ভের নির্নিমেষ শিখার ন্যায় সংসারের অনির্দ্দিষ্ট পথের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় ধ্রুব নির্দ্দেশ প্রদর্শন করে—সাহিত্যেরও সেইরূপ একটা চরিত্র আছে। সে চরিত্র, কৌশল নহে, তার্কিকতা নহে, আস্ফালন নহে, দলাদলির জয়গান নহে, তাহা অন্তর্নিহিত নির্ভীক, নিশ্চল জ্যোতির্ম্ময় সত্যের দীপ্তি।

আমাদের দেশে পাঠক নাই, ভাবের প্রতি আন্তরিক আস্থা নাই, যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহাই চলিয়া যাইতেছে, কোন-কিছুতে কাহারো বাস্তবিক বেদনাবোধ নাই; এরূপ স্থলে লেখক-দের অনেক কথাই অরণ্যে ক্রন্দন হইবে এবং অনেক সময়েই আদরের অপেক্ষা অপমান বেশী মিলিবে।

এক হিসাবে অন্য দেশ অপেক্ষা আমাদের এ দেশে লেখ-কের কাজ চালানো অনেক সহজ। লেখার সহিত কোন যথার্থ দায়িত্ব না থাকাতে কেহ কিছুতেই তেমন আপত্তি করে না। ভুল লিখিলে কেহ সংশোধন করে না, মিথ্যা লিখিলে কেহ প্রতিবাদ করে না, নিতান্ত ছেলেখেলা করিয়া গেলেও তাহা "প্রথম শ্রেণীর" ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়। বন্ধুরা

বন্ধুকে অম্লানমুখে উৎসাহিত করিয়া যায়, শত্রুরা রীতিমত নিন্দা করিতে বসা অনর্থক পণ্ডশ্রম মনে করে।

সকলেই জানেন, বাঙ্গালীর নিকটে বাঙ্গলা লেখার, এমন কি, লেখামাত্রেরই এমন কোন কার্য্যকারিতা নাই, যে জন্য কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করা যায়। পাঠকেরা কেবল যতটুকু আমোদ বোধ করে ততটুকু চোখ বুলাইয়া যায়, যতটুকু নিজের সংস্কারের সহিত মেলে ততটুকু গ্রহণ করে, বাকিটুকু চোখ চাহিয়া দেখেও না। সেই জন্য যে-সে লোক যেমন-তেমন লেখা লিখিলেও চলিয়া যায়।

অন্যত্র, যে দেশের লোকে ভাবের কার্য্যকরী অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা কেবলমাত্র সংস্কার সুবিধা ও অভ্যাসের দ্বারাই বদ্ধ নহে, যাহারা স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাও কিয়ৎপরিমাণে স্বহস্তে জীবন গঠিত করে, সুন্দর কাব্যে, প্রবল বাগ্মিতায়, সুসংলগ্ন যুক্তিতে যাহাদিগকে বাস্তবিকই বিচলিত করে, তাহাদের দেশে লেখক হওয়া সহজ নহে। কারণ, লেখা সেখানে খেলা নহে, সেখানে সত্য। এই জন্য লেখার চরিত্রের প্রতি সেখানকার পাঠকদের সর্ব্বদা সতর্ক তীব্র দৃষ্টি। লেখা সম্বন্ধে সেখানে কোন আলস্য নাই। লেখকেরা সযত্নে লেখে, পাঠকেরা সযত্নে পাঠ করে। মিথ্যা দেখিলে কেহ মার্জ্জনা করে না, শৈথিল্য দেখিলে কেহ সহ্য করে না। প্রতিবাদযোগ্য কথামাত্রের প্রতিবাদ হয় এবং আলোচনাযোগ্য কথামাত্রেরই আলোচনা হইয়া থাকে।

কিন্তু এ দেশে লেখার প্রতি সাধারণের এম্নি সুগভীর অশ্রদ্ধা, যে, কেহ যদি আন্তরিক আবেগের সহিত কাহারও প্রতিবাদ করে, তবে লোকে আশ্চর্য্য হইয়া যায়। ভাবে, সময়

নষ্ট করিয়া এত বড় একটা অনাবশ্যক কাজ করিবার কি এমন প্রয়োজন ঘটিয়াছিল! অনর্থক কেবল লোকটার মনে আঘাত দেওয়া! তবে নিশ্চয়ই বাদীর সহিত প্রতিবাদীর একটা গোপন বিবাদ ছিল, এই অবসরে তাহার প্রতিশোধ লইল।

কিন্তু যে কারণে, এক হিসাবে, এখানে লেখক হওয়া সহজ, সেই কারণেই, অন্য হিসাবে, এখানে লেখকের কর্ত্তব্য পালন করা অত্যন্ত কঠিন। এখানে লেখকে পাঠকে পরস্পরের সহায়তা করে না। লেখককে একমাত্র নিজের বলে দাঁড়াইতে হয়। যেখানে কোন লোক সত্য শুনিবার জন্য তিলমাত্র ব্যগ্র নহে, সেখানে আপন উৎসাহে সত্য বলিতে হয়। যেখানে লোকে কেবলমাত্র প্রিয়বাক্য শুনিতে চাহে, সেখানে নিতান্ত নিজের অনুরাগে তাহাদিগকে হিতবাক্য শুনাইতে হয়। যেখানে বহুদর্শন থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা, সযত্নে চিন্তা করিয়া কথা বলিলেও যা, অযত্নে ঝোঁকের মাথায় কথা বলিলেও তা—এবং অধিকাংশের নিকট শেষোক্ত কথারই অধিক আদর হয়, সেখানে কেবল নিজের শুভ ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইয়া, চিন্তা করিয়া, সন্ধান করিয়া, বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে হয়। চক্ষের সমক্ষে প্রতিদিন দেখিতে হইবে, বহু যত্ন, বহু আশার ধন সম্পূর্ণ অনাদরে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে; গুণ এবং দোষ, নৈপুণ্য এবং ত্রুটি সকলই সমান মূল্যে অর্থাৎ বিনামূল্যে পথপ্রান্তে পড়িয়া আছে; যে আশ্বাসে নির্ভর করিয়া পথে বাহির হওয়া গিয়াছিল, সে আশ্বাস প্রতিপদে ক্ষীণ হইতেছে অথচ পথ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে—যথার্থ শ্রেষ্ঠতার আদর্শ একমাত্র নিজের অশ্রান্ত যত্নে সম্মুখে দৃঢ় এবং উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে।

আমি বঙ্গদেশের হতভাগ্য লেখক-সম্প্রদায়ের হইয়া ক্রন্দন-

গীত গাহিতে বসি নাই। বিলাতের লেখকদের মত আমাদের বহি বিক্রয় হয় না, আমাদের লেখা লোকে আদর করিয়া পড়ে না বলিয়া অভিমান করিয়া সময় নষ্ট করা নিতান্ত নিষ্ফল; কারণ, অভিমানের অশ্রুধারায় কঠিন পাঠকজাতির হৃদয় বিগলিত হয় না। আমি বলিতেছি, আমাদের লেখকদিগকে অতিরিক্তমাত্রায় চেষ্টান্বিত ও সতর্ক হইতে হইবে।

আমরা অনেকসময় অনিচ্ছাক্রমে অজ্ঞানতঃ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হই। যখন দেখি সত্য বলিয়া আশু কোন ফল পাই না এবং প্রায়ই অনেকের অপ্রিয় হইতে হয়, তখন, অলক্ষিতে আমাদের অন্তঃকরণ সেই দুরূহ কর্ত্তব্যভার স্কন্ধ হইতে ফেলিয়া দিয়া নটের বেশ ধারণ করে। পাঠকদিগকে সত্যে বিশ্বাস করাইবার বিফল চেষ্টা ত্যাগ করিয়া চাতুরীতে চমৎকৃত করিয়া দিবার অভিলাষ জন্মে। ইহাতে কেবল অন্যকে চমৎকৃত করা হয় না, নিজেকেও চমৎকৃত করা হয় ; নিজেও চাতুরীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

একটা কথাকে যতক্ষণ না কাজে খাটানো হয়, ততক্ষণ তাহার নির্দ্দিষ্ট সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; ততক্ষণ তাহাকে ঘরে বসিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা মার্জ্জনা করিতে করিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করিয়া তোলা যায়—ততক্ষণ এ পক্ষেও বিস্তর কথা বলা যায়, ও পক্ষেও কথার অভাব হয় না। আমাদের দেশে সেই কারণে অতিসূক্ষ্ম কথার এত প্রাদুর্ভাব। (কারণ, কথা কথাতেই থাকিয়া যায়, তর্ক ক্রমে তর্কের সংঘর্ষণে উত্তরোত্তর শাণিতই হইতে থাকে, এবং সমস্ত কথাই বাষ্পাকারে এমন একটা লোকাতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয় যেখানকার কোন মীমাংসাই ইহলোক হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই।|

আমাদের দেশের অনেক খ্যাতনামা লেখকও পৃথিবীর ধারণাযোগ্য পদার্থসকলকে গুরুমন্ত্র পড়িয়া ধারণাতীত করিয়া অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক কুহেলিকা নির্ম্মাণ করিতেছেন। পাঠকেরা কেবল নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে আসিয়াছেন, তাহা লইয়া তাঁহারা গৃহকার্য্য করিবেন না, তাহাকে রীতিমত আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করাও দুঃসাধ্য, সুতরাং সে যে প্রতিদিন মেঘের মত নব নব বিচিত্র আকার ধারণ করিয়া অলস লোকের অবসরযাপনের সহায় তা করিতেছে তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু এই বাষ্প-গঠিত মেঘে কি মাঝে মাঝে সত্যকে ম্লান করিতেছে না? উদা-হরণস্বরূপে কেবল উল্লেখ করি, চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার "কড়া-ক্রান্তি" প্রসঙ্গে যেখানে মনুসংহিতা হইতে মাতৃসম্বন্ধে একটা নিরতিশয় কুৎসিৎ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা হইতে একটা বৃহৎ আধ্যাত্মিক বাষ্প সৃজন করিয়াছেন, সে কি কেবলমাত্র কথার কথা, রচনার কৌশল, সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয়, আধ্যাত্মিক ওকালতি? সে কি মনুষ্যত্বের পবিত্রতম শুভ্রতম জ্যোতির উপরে নিঃসঙ্কোচ স্পর্দ্ধার সহিত কলঙ্ককালিমা লেপন করে নাই? অন্য কোন দেশের পাঠক কি এরূপ নির্লজ্জ কদর্য্য তর্ক-চাতুরী সহ্য করিত?

আমরা সহ্য করি কেন? কারণ, আমাদের দেশে যে যেমন ইচ্ছা চিন্তা করুক, যে যেমন ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, যে যেমন ইচ্ছা রচনা করুক্, আমাদের কাজের সহিত তাহার যোগ নাই। অতএব আমরা অবিচলিতভাবে সকল কথাই শুনিয়া যাইতে পারি—তুমিও যেমন, উহাতে কাহার কি যায় আসে!

কিন্তু কেন কাহারও কিছু যায় আসে না! আমাদের সাহি-

ত্যের মধ্যে চরিত্রবল নাই বলিয়া। যাহা অবহেলায় রচিত তাহা অবহেলার সামগ্রী। যাহাতে কেহ যথার্থ জীবনের সমস্ত অনুরাগ অর্পণ করে নাই, তাহা কথনো অমোঘ বলে কাহারও অন্তর আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

এখন আমাদের লেখকদিগকে অন্তরের যথার্থ বিশ্বাসগুলিকে পরীক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে, নিরলস এবং নির্ভীকভাবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আঘাত করিতে এবং আঘাত সহিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।

একদিকে যেমন আমাদের কিছুতেই কিছু আসে যায় না,অন্য দিকে তেমনি আমাদের নিজের প্রতি তিলমাত্র কটাক্ষপাত হইলে গায়ে অত্যন্ত বাজে। ঘরের আদর অত্যন্ত অধিক পাইলে এই দশা হয়। নিজের অপেক্ষা আর কিছুকেই আদরণীয় মনে হয় না।

সেটা নিজের সম্বন্ধে যেমন, স্বদেশের সম্বন্ধেও তেমনিই। আদুরে ছেলের আত্মানুরাগ যেরূপ, আমাদের স্বদেশানুরাগ সেইরূপ। একটা যে হিতচেষ্টা কিম্বা কঠিন কর্ত্তব্যপালন তাহার নাম নাই—কেবল আহা উহু, কেবল কোলে কোলে নাচান। কেবল কিছু গায়ে সয় না, কেবল চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া স্তবগান। কেহ যদি তাহার সম্বন্ধে একটা সামান্য অপ্রিয় কথা বলে, অমনি আদুরে স্বদেশানুরাগ ফুলিয়া ফাঁপিয়া কাঁদিয়া মুষ্টি উত্তোলন করিয়া অনর্থপাত করিয়া দেয়, অমনি তাহার মাতৃ-স্বসা এবং পিতৃস্বসা, তাহার মাতুলানী এবং পিতৃব্যানী মহা হাঁকডাক করিতে করিতে ছুটিয়া আসে, এবং ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, তাহার নাসাচক্ষু মোচন করিয়া তাহার চিরন্তন আদুরে নামগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনা সাধন করে।

আমরা স্থির করিয়াছি, বাঙ্গালীর আত্মাভিমানকে নিশিদিন কোলে তুলিয়া নাচানো লেখকের প্রধান কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে বয়স্ক সহযোগী ও প্রতিযোগীর সহিত আমরা যেরূপ ব্যবহার করি, তাহাদিগকে উচিত ভাবে প্রিয়বাক্যও বলি অপ্রিয় বাক্যও বলি, কিন্তু নিয়ত বাৎসল্য-গদ্গদ অত্যুক্তি প্রয়োগ করি না, স্বজাতি সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবহার করাই সুসঙ্গত। আমরা আমাদের দেশের যথার্থ ভাল জিনিষগুলি লইয়া এত বাড়াবাড়ি করি, যে, তাহাতে ভাল জিনিষের অমর্য্যাদা করা হয়। কালিদাস পৃথিবীর সকল কবির সেরা, মনুসংহিতা পৃথিবীর সকল সংহিতার শ্রেষ্ঠ, হিন্দুসমাজ পৃথিবীর সকল সমাজের উচ্চে—এরূপ করিয়া বলিয়া আমরা কালিদাস, মনুসংহিতা এবং হিন্দু-সমাজের প্রতি মুরুব্বিয়ানা করি মাত্র। তাঁহারা যদি জীবিত ও উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে যোড়করে বলিতেন "তোমরা আমাদিগকে এত কৌশল এবং এত চীৎকার করিয়া বড় করিয়া না তুলিলেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইত না! বাপুরে, একটু ধীরে, একটু বিবেচনাপূর্ব্বক, একটু সংযতভাবে কথা বল! পৃথিবীতে সকল জিনিষেরই ভালও থাকে মন্দও থাকে—তোমরা যতই কূটতর্ক কর না, অসম্পূর্ণতা হো হা দ্বারা ঢাকা পড়ে না! যাহার যথেষ্ট ভাল আছে, তাহার অল্পস্বল্প মন্দর জন্য ছলনা করিবার আবশ্যক হয় না, সে ভাল মন্দ দুই অবাধে প্রকাশ করিয়া সাধারণের ন্যায়বিচার অসঙ্কোচে গ্রহণ করে। যাহারা ক্ষুদ্র, যাহাদের অল্পস্বল্প ভাল, তাহাদেরই জন্য সূক্ষ্ম পয়েণ্ট্ ধরিয়া ওকালতি কর। চন্দ্র কখনো চন্দন দিয়া কলঙ্ক ঢাকে না, অথবা তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করে না—তথাপি নিষ্কলঙ্ক কেরোসিন্ শিখার অপেক্ষা তাহার গৌরব বেশী! কিন্তু ঐ কলঙ্কের

জন্য বাজে কৈফিয়ৎ দিতে গেলেই কিম্বা চন্দ্রকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া তাহার মিথ্যা আদর বৃদ্ধি করিতে গেলেই তাহার প্রতি অসম্ভ্রম করা হয়।”

শিক্ষা-প্রণালী।

আমাদের ‘শিক্ষিত’ যুবকদের মধ্যে শিক্ষার যতটা সুফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, ততটা যে দেখা যায় না, বরং অনেকটা উল্টাই দেখা যায়, এ বিষয়ে যদি আমার সহিত কাহারও মতভেদ হয়, তাহা হইলে আগে থাকিতেই বলিয়া রাখি, আমার এ প্রবন্ধ তাঁহাদের জন্য নয়। তবে যদি কেহ বলেন যে, কুফলটা আমাদের মস্তিষ্কেরই দোষ, শিক্ষা-প্রণালীকে সে জন্য দায়ী করা যাইতে পারে না, তা’ হইলে, বোধ হয়, শিক্ষা-প্রণালীর গুরুতর ত্রুটি যে আছে, এই কথা প্রমাণ করিতে পারিলেই, তাঁহারা আমাদের মস্তিষ্ককে বেকসুর খালাস না দিন, নিদেন শিক্ষা-প্রণালীকে সমদোষী সাব্যস্ত করিবেন।

আমাদের স্কুলের ছাত্রদিগকে কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং সে প্রণালীর সংশোধন ও উন্নতিসাধন সম্ভব কি না, ইহাই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শিক্ষার দুই উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করা, এবং দ্বিতীয়তঃ মনোবৃত্তি চালনা করিবার ক্ষমতা চর্চ্চা করা। যে শিক্ষায় দুই উদ্দেশ্যই সাধন হয়, সেই শিক্ষাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে এক উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইলেও শিক্ষাটাকে চলনসই বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুইটার মধ্যে

কোন উদ্দেশ্যই সফল না হইলে সে শিক্ষার মূল্য সম্বন্ধে বোধ হয় তর্কের আবশ্যক নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীতে না হয় যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞানসঞ্চয়, না হয় মনোবৃত্তি চর্চ্চা। দেবায় এবং ধর্ম্মায় নাই হোক্, চলনসই রকম কেরাণীগিরি ছাড়া সে শিক্ষা আর কোন কাজে লাগাইতে হইলে অসাধারণ বুদ্ধির আবশ্যক। এই শিক্ষা সত্ত্বেও যে আমাদের মধ্যে প্রতিভাশালী লোক পাওয়া যায়, ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়।

কালেজের শিক্ষার কথা এখন আমি বিশেষ কিছু বলিতে চাহি না। কালেজে পাঠ করিবার বয়সে শিক্ষাটা অনেকটা আমাদের নিজের উপর নির্ভর করা উচিত, আর সেই নিজেকে শিক্ষা দিবার ক্ষমতা অনেকটা আমাদের প্রথম শিক্ষার উপর নির্ভর করে। শৈশবাবস্থায় আমরা সকল বিষয়েই অন্যের হস্তে, তখন অন্যে আমাদের শরীর মন যে প্রকারে গড়িয়া তুলেন তাহারই ফল আমাদিগকে চিরজীবন ভোগ করিতে হয়। সেই জন্য বাল্যশিক্ষাই আমার প্রধান আলোচ্য বিষয়। কি রকম করিয়া A B C পড়াইতে হইবে, কি রকম করিয়া ক খ পড়াইতে হইবে, এসব কথা যেন কেহ তুচ্ছ বিবেচনা না করেন। এই A B C পড়া এবং ক খ শিক্ষা করাই আমাদের জীবনের ভিত্তি; এই ভিত্তির দৃঢ়তার উপর, পরে অট্টালিকা হইবে কি কুঁড়ে ঘর হইবে, নির্ভর করে।

কোন কার্য্য করিতে হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় অবলম্বন করাই সাধারণ নিয়ম। নিতান্ত নির্ব্বোধ অশিক্ষিত মূর্খকেও সোজা পথ ছাড়িয়া বিনা কারণে বাঁকা পথ ধরিতে দেখিলে তাহার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের ঘোর আশঙ্কা উপ-

স্থিত হইবার কথা। অথচ আমাদের শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা যে প্রণালী প্রচলিত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হইতে পারে, যেন উদ্দেশ্যসাধনের সহজ পথ ধরিয়া চলাটা তাঁহারা নীতি কিম্বা যুক্তিবিরুদ্ধ জ্ঞান করেন।

দেখা যাক্, জ্ঞানসঞ্চয় ও মনোবৃত্তি চর্চ্চা শিক্ষার এই দুই উদ্দেশ্যমধ্যে আমাদের উপস্থিত প্রণালী দ্বারা কোন্ উদ্দেশ্যটি ভালরূপে সম্পাদিত হয়।

ইংরাজী স্কুলে ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত, বীজগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ইংরাজী ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা, এই কয়টি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। সর্ব্বনিম্ন-শ্রেণীতে অতি অল্প পরিমাণে বাঙ্গলা পড়ান হয়; এত অল্প যে, সে নামমাত্র। যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। ইতিহাস, ভূগোল ও অঙ্কবিদ্যা শিক্ষা করিলে জ্ঞানলাভও হয় বটে, এবং মনের উৎকর্ষসাধনও হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়গুলি সত্যসত্যই শিখান দরকার। শিখাইবার ভান করিয়া পাখী পড়াইবার মতন করিলে কোন লাভ নাই। জ্যামিতির সত্যগুলি জানা যতদূর আবশ্যক, তদপেক্ষা এই সত্যগুলি আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তে আনিবার প্রয়াসে যে মানসিক অনুশীলন হয় তাহা আমাদের প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে বেশী আবশ্যক। আমরা স্কুল ও কালেজ ছাড়িবার পর জ্যামিতির অনেক সত্য ভুলিয়া যাইতে পারি; কিন্তু ভাল করিয়া জ্যামিতি শিক্ষা করিলে যে মানসিক অনুশীলন হয় তদ্দ্বারা আমাদের মন যদি যুক্তি ধারণা করিবার ক্ষমতালাভ না করে তাহা হইলে সে শিক্ষাই নিষ্ফল। ত্রিভুজের দুই কোণ সমান হইলে তাহার দুই বাহু সমান হইবে এ সত্যটি না জানিলেও পৃথিবীর অনেক কাজ চালাইতে

পারা যায়, কিন্তু এই সত্যটি ও ইহার প্রমাণ ধারণা করিবার জন্য যে মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক তাহা লাভ করা নিতান্তই প্রয়োজনীয়। সত্য ও যুক্তি ধারণা করিবার এই ক্ষমতার চর্চ্চা হইলেই মনকে শিক্ষিত বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই ক্ষমতা চর্চ্চা করিবার নিমিত্ত যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা আবশ্যক। আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত যাহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা বোঝা আবশ্যক। অতএব যে বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার ও আয়ত্ত করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়াই উৎকৃষ্ট শিক্ষা-প্রণালীর উচিত উদ্দেশ্য।

কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে সুবিধা করিয়া দেওয়া দূরে থাক্, বরং যতদূর সম্ভব অসুবিধা ঘটাইবারই বিশেষ চেষ্টা লক্ষিত হয়। ভূগোল, ইতিহাস, বিশেষতঃ অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি যে স্বভাবতঃ আপনা হইতেই আমাদের মস্তিষ্কের আয়ত্তে আসিয়া পড়ে তা' নয়। বরং সে জন্য বিশেষ প্রয়াসেরই আবশ্যক। কিন্তু এ সকল বিষয় শিক্ষা দিবার কি প্রণালী অবলম্বিত হয়? না, যে ভাষা নিতান্ত বিজাতীয়, যে ভাষায় বিন্দুবিসর্গমাত্র দখল নাই, সেই ভাষায় এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়। মনে কর, কোন লোককে কোন বস্তুর আকৃতি পরিস্ফুটরূপে দেখান আবশ্যক, সে স্থলে তাহার চোখে কালো ঝাপ্‌সা চস্‌মা আঁটিয়া দেওয়া কিম্বা কুজ্‌ঝটিকার মধ্য দিয়া সেই বস্তু দেখান যে ঠিক্ যুক্তিসঙ্গত নয় এ কথা আমরা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারি। অথচ আমরা জ্যামিতির সত্য ও যুক্তিগুলিকে অপরিচিত বিজাতীয় ভাষা-কুজ্‌ঝটিকার মধ্য দিয়া দেখানকে জ্যামিতি শিখাইবার উচিত উপায় মনে করি। "বি-এল্-এ ব্লে, বি-এল্-ই ব্লি" শেষ

করিয়াই আমরা শিক্ষার সকল বিষয়গুলিই ইংরাজী ভাষায় শিখিতে আরম্ভ করি। ইংরাজী ভাষাটা যে তখনও করতলন্যস্ত আমলকবৎ হয় নাই তাহা কাহারও অবিদিত নহে। এ অবস্থায় ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি ইংরাজী ভাষায় পাঠ করিলে যে ভাবগুলি শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি সেগুলি নিতান্ত অস্পষ্ট ও ঝাপ্‌সা মনে হয়; ঠিক্ পরিষ্কার করিয়া ধরিতে পারি না। অথচ ক্লাসের পড়া তৈয়ারি করাও আবশ্যক, পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে হইবে, কাজেই মুখস্থ করা আমাদের এক সহজ উপায় হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ মুখস্থ করাই একমাত্র উপায় হইয়া দাঁড়ায়। বেচারারা করিবে কি? মুখস্থ করা ভিন্ন কি অন্য পন্থা আছে?

এই মুখস্ত-প্রণালীতে যে কত সময় নষ্ট হয় তাহা বোধ হয় অনেকেই ভাবেন না। আমাদের স্কুলের ছেলেরা খাটিতে কসুর করে না। সমস্ত দিনটাত স্কুলে আবদ্ধ থাকে, আর বাড়িতে যে সময়টুকু থাকে তা' আহারনিদ্রার সময় বাদ দিয়া স্কুলের পড়া মুখস্থ করিতেই কাটিয়া যায়। (আমরা যে চলিত ভাষায় "পড়া মুখস্থ করা" বলি, সে কথাটা বড় ঠিক্, আমাদের পক্ষে পড়া "মুখস্থ" করা ছাড়া আর কিছু করিবার উপায় নাই।) এইরকম আট নয় বৎসর ধরিয়া ক্রীতদাসের ন্যায় পরিশ্রমের ফল কি হয়—না, "এণ্ট্রান্স্ পাস্"! এণ্ট্রান্স্-পাস-করা ছেলের কতদূর যে বিদ্যা তা' সকলেই জানে।

দেখা যাক্, এণ্ট্রান্স্ ক্লাসে কি প্রথানুসারে পড়ান হয়। ইংরাজী একটি টেক্স্‌ট্ বুক আছে, সেইটি রোজ এক পৃষ্ঠা করিয়া পড়ান হয়; অনেক স্থলে এক পৃষ্ঠা পর্য্যন্তও পৌছায় না। ভূগোল একদিনে এক পৃষ্ঠা, জ্যামিতি একদিনে এক প্রতিজ্ঞা, ইতি-

হয় একদিনে এক পৃষ্ঠা, ইত্যাদি। সমস্ত বিষয়গুলি ছেলেরা বাড়ি থেকে মুখস্থ করিয়া আনে, ক্লাসে আসিয়া সেগুলি বসিয়া বসিয়া লিখে। স্কুলটা খালি প্রাত্যহিক পরীক্ষার জন্য—যতটুকু শিক্ষা হয় তা' বাড়িতে। এমন কি, প্রাইভেট্ টিচার না রাখিলে, কিম্বা অন্যের খোসামোদী করিয়া পড়া না বুঝাইয়া লইলে স্কুলের পড়া প্রস্তুত করা ছেলেদের পক্ষে অসাধ্য। স্কুলের মাষ্টারেরা ভাল করিয়া পড়া বুঝাইয়া দেন না, আর বুঝাইবার সময়ও পান না। মনে কর, ইতিহাস পড়ান হইতেছে, ইতিহাসের বিষয়টিমাত্র ছেলেরা বুঝিলে ও আয়ত্ত করিলে চলিবে না, কেননা পরীক্ষায় ইংরাজীতে উত্তর লিখিতে হইবে। কাজেই স্কুলের প্রথম লক্ষ্য হয় কিসে চট্‌পট্ ইংরাজীতে উত্তর লেখার অভ্যাস হয়। সুতরাং প্রত্যহ ক্লাসে ইংরাজীতে ইতিহাস লেখান অভ্যাস করাইতে হয়। যদি ইংরাজী ভাষাটার উপর খুব দখল থাকিত, তা' হইলে কোনই গোলমাল হইত না। কিন্তু এদিকে ইংরাজী ভাষাটি একেবারেই অপরিচিত, আর ওদিকে ইংরাজী ভাষাতেই শিক্ষা করিয়া সেই ভাষাতেই লিখিতে হইবে। মুখস্থ করিয়া লেখা ছাড়া আর কোন উপায় নাই; আর অপরিচিত ভাষায় ইতিহাস কথায় কথায় মুখস্থ করাও বড় সহজ কার্য্য নহে। দিন এক পৃষ্ঠার বেশী যে পড়া হয় না তাহা আশ্চর্য্য নহে। এক মাসে যে ইতিহাস শিক্ষা হইতে পারিত, তাহা দুই তিন বৎসরেও হয় না। জ্যামিতি, ভূগোল ইত্যাদি সম্বন্ধেও ঠিক্ এই একই কথা খাটে। এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষার জন্য যে পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার পক্ষে যত পরিশ্রম করা আবশ্যক তদপেক্ষা শতগুণ বেশী পরিশ্রম করিতে হয়। আর এই পরিশ্রম শুদ্ধমাত্র তোতা পাখীর মতন মুখস্থ করিতেই ব্যয় হয়। বস্তুতঃ

মুখস্থ করা যে স্থলে অপরিহার্য্য, সে স্থলে মুখস্থর উপর বুঝিবার চেষ্টা করা ছেলেদের এবং মাষ্টারদের নিকট অনর্থক পরিশ্রম বলিয়া মনে হইতে পারে। নিদান পক্ষে প্রত্যহ এই মুখস্থ করা আর লেখাতে এত সময় দিতে হয় যে, বুঝিবার কিম্বা বোঝাইবার সময় থাকে না। স্কুলের মাষ্টারেরাই বা কি করিবে? পরীক্ষা পাস করান ত চাই, পরীক্ষা পাস করাইতে না পারিলে সে স্কুলের বেশী দিন টিঁকিবার সম্ভাবনা নাই।

ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া এবং বাঙ্গলা ভাষায় পরীক্ষা করা। তাহা হইলে মুখস্থ করিবার প্রয়োজন থাকে না, আর বিষয়গুলি যথার্থ শিক্ষা দিবার দিকে মনোযোগ দিতে পারা যায়। শিক্ষাটাও আজ-কাল যেরূপ হইতেছে তাহা অপেক্ষা এতদূর সহজ হইয়া আসে যে, হতভাগ্য বালকেরা এখনকার চেয়ে ঢের বেশী শিক্ষালাভ করিয়াও প্রচুর পরিমাণে খেলা করিবার সময় পাইতে পারে।

ইংরাজেরা যে মধ্যে মধ্যে এদেশীয় শিক্ষিত লোকদিগকে "অর্দ্ধশিক্ষিত" বলিয়া উপেক্ষা করে, কথাটা আমাদের গায়ে লাগিতে পারে বটে, কিন্তু নিতান্ত যে অমূলক তা' নয়। ইংলণ্ডে স্কুলেও যেটুকু শিক্ষা হয় সেটুকু সত্যসত্যই শিক্ষা হয়, আমা-দের দেশে শিক্ষা যতটুকু হয়, পণ্ডশ্রম তদপেক্ষা শতগুণ বেশী হয়।

আমার কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন—"কথাটা নিতান্ত অযথার্থ না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আজকাল-কার বাজারে ইংরাজীটি না জানিলে কাজ চলে না, আর উপ-স্থিত প্রণালীতে আর কিছু হোক্ বা না হোক্, ইংরাজীটি নিদান পক্ষে ভাল শিক্ষা হয়।" উপস্থিত প্রণালীতে যে ইংরাজী শিক্ষা

ভাল হয় সে বিষয়ে আমার খুবই সন্দেহ আছে। আমাদের ইংরাজী শিখাইবার প্রণালীতে কতকগুলি বাঁধা বই মুখস্থ করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু হয় না। দু' একটি টেক্‌স্ট্‌বুক পড়ান হয়, কতকগুলি শব্দের প্রতিশব্দ মুখস্থ হয়, তা' ছাড়া ভাষায় জ্ঞান-লাভ বিন্দুমাত্রও হয় না। এণ্ট্রান্স্-পাস্-করা ছেলে কি ইংরাজী লিখিতে কিম্বা বলিতে কিম্বা বুঝিতে পারে? কেমন করিয়াই বা হইবে? যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং পরীক্ষা করা হয় তাহাতে প্রতিশব্দ মুখস্থ করা ছাড়া আর কিছুই চলে না। আর তা' ছাড়া, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদিতে এত সময় অপব্যয় হয় (যাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি) যে, ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য যতটা সময় দেওয়া আবশ্যক ততটা সময় দিতে পারে না। ভাষা শিক্ষা দিতে হইলে ভাষাটা ভাষাস্বরূপে শিক্ষা দেওয়াই ভাল। ভাষা শিক্ষা হইবার অগ্রে সেই ভাষার অন্য কঠিন বিষয় শিক্ষা দিলে, না হয় ভাষাশিক্ষা, না হয় বিষয়শিক্ষা। তা' ছাড়া, প্রথমে কতকটা মানসিক অনুশীলন হইলে ভাষা শিক্ষা করাটাও সহজ হইয়া আসে। থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় বাঙ্গালায় শিক্ষা দিয়া তৎপরে যদি দুই বৎসর ইংরাজীটা খালি ভাষাস্বরূপে শিখান হয়, তা' হলে আমার বিশ্বাস যে, এখন এণ্ট্রান্স্ ক্লাসে যতটা ইংরাজী শিক্ষা হয় তদপেক্ষা বেশী হইবারই সম্ভাবনা। যদি নিতান্ত মনে হয় যে, দুই বৎসরে অতটা ইংরাজী শিখান দুষ্কর, তাহা হইলে নিম্নশ্রেণী হইতেই ইংরাজীটা খালি ভাষাস্বরূপে পড়ান যাইতে পারে। ইংরাজী ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দিবার কিম্বা পরীক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে হয়ত বাঙ্গালায় অনেক বিষয়ে শিক্ষাপুস্তকের ব্যবহার করা ভিন্ন অন্য উপায়

ছিল না। আজকাল কিন্তু সে অভাব নাই; আর যদি বাঙ্গলায় শিক্ষা দেওয়াই স্থির হয়, তবে, অতি শীঘ্রই সকল বিষয়েই বাঙ্গলায় শিক্ষাপুস্তক বাহির হইবে। লিখিবার লোক যে নাই তা' নয়। বরং এক আশ্চর্য্য দেখা যায় যে, বাঙ্গালীতে বাঙ্গালী ছেলেদের জন্য বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিতেছেন—কিন্তু ইংরাজী ভাষায়! যদি বাঙ্গলা ভাষায় ইতিহাস পড়াইবার প্রণালী প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার রচিত বাঙ্গলার ও ভারতবর্ষের ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় লিখিতেন না?

আর একটি কথা। ভাষা শিখাইবার জন্য টেক্স্ট্‌বুক কেন? আর শিখাইবার জন্য হইলেও পরীক্ষার জন্য কেন? টেক্স্ট্‌বুকের পরীক্ষা করিলে ভাষাশিক্ষার দিকে মনোযোগ না হইয়া সেই টেক্সট্‌বুকখানি মুখস্থ করিবার দিকে মনোযোগ হয়। ভাষাশিক্ষা না হইয়া খালি প্রতিশব্দ ও "নোট্" মুখস্থ হয়। ভাষা-জ্ঞান পরীক্ষা করিতে হইলে দেখা উচিত, ছাত্র সে ভাষায় কেমন লিখিতে পারে, বলিতে পারে ও বুঝিতে পারে। টেক্স্ট্‌বুক পরীক্ষায় ইহার কিছুই হয় না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যদি বাঙ্গলায় শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী প্রচলিত করেন, আর সেই সঙ্গে যদি টেক্স্ট্‌বুক পরীক্ষা করিবার প্রণালী উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালীর দুইটি প্রধান দোষ দূর করা হয়।

ডায়ারি।

(ভূমিকা)

পাঠকেরা যদি "ডায়ারি" শুনিয়া মনে করেন ইহার মধ্যে লেখকের অনেক আত্মকথা আছে, তবে তাঁহারা ভুল বুঝিবেন। যদি সহসা তাঁহাদের এমন আশ্বাস জন্মিয়া থাকে যে, লোকটা নিশ্চয় সহসা মারা গিয়াছে, এখন তাহার দৈনিক জীবনের গোপন সিন্ধুক হইতে তাহার প্রতিদিবসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়গুলি সর্ব্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটন করিয়া রীতিমত কর্দ্দ করা হইবে, তবে তাঁহারা অত্যন্ত নিরাশ হইবেন। কারণ, আমি এখনো বাঁচিয়া আছি। আমার প্রতিদিনের খস্‌ড়া হিসাব এখনো আমার চাবির মধ্যেই আছে।

তবে, ব্যাপারটি কি একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। খুব যে পরিষ্কার হইবে এমন আশাও দেওয়া যায় না।

শাস্ত্রমতে পঞ্চভূতের সমষ্টিই জগৎ। মানুষও তাই। প্রত্যেক মানুষই প্রায় পাঁচটা মানুষ মিলিয়া। ভিতরেও পাঁচটা, বাহিরেও পাঁচটা। ভিতরে পাঁচটার প্রমাণ কি তাহা লইয়া অল্প দিন হইল আমাদের মধ্যে আলোচনা হইয়া গেছে, সে কথা পরে বলিব। বাহিরে পাঁচটা বলিতে কি বুঝায় সে কথা সংক্ষেপে সারিয়া লই।

কোন মানুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে। সামাজিক আদানপ্রদানের নিয়মে এক জন মানুষ, যে, অনেক জন মানুষের দ্বারা গঠিত হয়, এখানে আমি সেই অতি সাধারণ কথার উত্থাপন করিতেছি না। কিন্তু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে গুটিকতক বিশেষ মানুষ বিশেষরূপে সংলগ্ন হইয়া একটি বিশেষ ঐক্য নির্ম্মাণ করে। তাহার অসংখ্য

আলাপী আত্মীয়দের মধ্যে সেই কয়েকটি লোকই যেন তাহার সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। তেমন পারদর্শী জরিপ-আমিন থাকিলে একটা মানুষের সীমা তাঁওরাইয়া নিম্নলিখিতমত চৌহদ্দি স্থির করিয়া দিতে পারেন—

ব্যক্তি শ্রীঅম্বিকাচরণ। উত্তরে শ্রীশ্যামশঙ্কর। দক্ষিণে শ্রীমতী—নাম করিয়া কাজ নাই। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র। পশ্চিমে শ্রীমতী—সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা ছাড়া উত্তরপশ্চিম, পূর্ব্বদক্ষিণ প্রভৃতি আরও অনেক কোণ আছে।

উক্ত সীমানার বাহিরে সার্ভে অনুসারে পৃথিবীর অসংখ্য লোকের সহিত অম্বিকার দূরতর এবং নিকটতর সম্পর্ক আছে। কিন্তু দৈবযোগে কেবল শ্যামশঙ্কর, প্রফুল্লচন্দ্র এবং মাননীয়া শ্রীমতী অনামিকারাই অম্বিকাচরণের সহিত সংলগ্নভাবে অবস্থিত। তাহাদিগকে বাদ দিলে অম্বিকাচরণের ম্যাপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আকারের হইত।

যেমন অম্বিকাচরণের, তেমনি আমারও জনকতক লোক আছেন এই মানবজন্মে যাঁহাদিগকে আমি বিশেষরূপে আমারই জ্ঞান করি, যাঁহারা আমার জীবনের অব্যবহিত চতুষ্পার্শে সম্বদ্ধ হইয়া আমার পরিধির একটি বিশেষ গঠন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

রচনার সুবিধার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে কেবল পাঁচ জনকে লওয়া যাক্। এবং তাঁহাদের পঞ্চভূত নাম দেওয়া যাক্। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

একটা গড়া নাম দিতে গেলেই মানুষকে বদল করিতে হয়। তলোয়ারের যেমন খাপ, মানুষের তেমন নামটি তাহার পাওয়া

অসম্ভব। বিশেষতঃ ঠিক পাঁচ ভূতের সহিত পাঁচটা মানুষ অবিকল মিলাইব কি করিয়া?

আমি ঠিক মিলাইতেও চাহি না। আমি ত আমার সীমা সরহদ্দের তর্ক লইয়া আদালতে উপস্থিত হইতেছি না। আমার ভূগোলবিবরণ অনেকটা পরিমাণে কাল্পনিক করিয়া তুলিলেও পাঠকদের আপত্তির কারণ হইতে পারে না। কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা এই ধর্ম্মশপথ আছে, যে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব। মৃত্তিকাকে আদালতে সত্য বলে, কারণ, তাহা কাহারও গঠিত নহে, কিন্তু পাঠক-সভায় মূর্ত্তিকে মৃত্তিকার অপেক্ষা অধিক সত্য বলিয়া জানে, যদিও তাহা শিল্পে গড়া। বলা বাহুল্য, অনেক মূর্ত্তিও আছে যাহার মাটির দর।

এখন পঞ্চভূতের পরিচয় দিই।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতি আমাদের সকলের মধ্যে গুরুভার। তাঁহার অধিকাংশ বিষয়েই একটা অচল অটল ধারণা। তিনি যাহাকে একটা দৃঢ় আকারের মধ্যে পান, এবং প্রত্যক্ষভাবে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখেন, এবং আবশ্যক হইলে কাজে লাগাইতে পারেন তাহাকেই সত্য বলিয়া মানেন। তাহার বাহিরেও যদি সত্য থাকে, সে সত্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নাই, এবং সে সত্যের সহিত তিনি কোন সম্পর্ক রাখিতে চান না। তিনি বলেন, যে সকল জ্ঞান অত্যাবশ্যক তাহারই ভার বহন করা যথেষ্ট কঠিন। বোঝা ক্রমেই ভারী এবং শিক্ষা ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। ইহার উপর আবার সখের সত্য এবং যত সব অনাবশ্যক ভাব আহরণ করিয়া আনা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা। প্রাচীনকালে যখন জ্ঞান বিজ্ঞান এত স্তরে স্তরে জমা হয় নাই, মানু-

ষের নিতান্ত শিক্ষণীয় বিষয় যখন যৎসামান্য ছিল, তখন সৌখীন শিক্ষার অবসর ছিল। কিন্তু এখন আর ত সে অবসর নাই। ছোট ছেলেকে কেবল বিচিত্র বেশবাস এবং অলঙ্কারে আচ্ছন্ন করিলে কোন ক্ষতি নাই, তাহার খাইয়া-দাইয়া আর কোন কর্ম্ম নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, বয়ঃপ্রাপ্ত লোক, যাহাকে করিয়া-কর্ম্মিয়া, নড়িয়া-চড়িয়া, উঠিয়া-হাঁঠিয়া ফিরিতে হইবে, তাহাকে পায়ে নূপুর, হাতে কঙ্কণ, শিখায় ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সাজাইলে চলিবে কেন? তাহাকে ও সমস্ত অনাবশ্যক অলঙ্কার দূরে ফেলিয়া দিয়া, কেবল মালকোঁচা এবং শিরস্ত্রাণ আঁটিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইবে। এই কারণে সভ্যতা হইতে প্রতিদিন অলঙ্কার খসিয়া পড়িতেছে। উন্নতির অর্থই এই, ক্রমশঃ আবশ্যকের সঞ্চয় এবং অনাবশ্যকের পরিহার।

শ্রীমতী অপ্ (ইঁহাকে আমরা স্রোতস্বিনী বলিব) ক্ষিতির এ তর্কের কোন রীতিমত উত্তর করিতে পারেন না। তিনি কেবল ছলছল কলকল করিয়া, সুন্দর ভঙ্গীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিতে থাকেন—না, না, ও কথা কখনই সত্য না। ও যখন আমার মনে লইতেছে না, তখন ও কখনই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না। কেবল বারবার "না না, নহে নহে"। তাহার সহিত আর কোন যুক্তি নাই কেবল একটি তরল সঙ্গীতের ধ্বনি, একটি অশ্রু-ছলছল অনুনয় স্বর, একটি তরঙ্গনিন্দিত গ্রীবার আন্দোলন। না না, নহে নহে। এবং সেই সঙ্গে আদর, যত্ন, স্নেহ এবং নেত্র, বাহু ও সর্ব্বাঙ্গের ভাষা। আমি অনাবশ্যককে ভালবাসি, অতএব অনাবশ্যকও আবশ্যক। অনাবশ্যক অনেক সময় আমাদের আর কোন উপকার করে না, কেবলমাত্র আমাদের স্নেহ, আমাদের ভালবাসা, আমাদের করুণা, আমাদের স্বার্থবিসর্জ্জনের স্পৃহা

উদ্রেক করে, পৃথিবীতে সেই ভালবাসার আবশ্যকতা কি নাই? ঘুরিয়া ফিরিয়া কোমলস্বরে কেবলই, "আহা না, না, নহে নহে!" শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর এই অনুনয়প্রবাহে শ্রীযুক্ত ক্ষিতি প্রায় গলিয়া যান, কিন্তু কোন যুক্তির দ্বারা তাঁহাকে পরাস্ত করিবার সাধ্য কি?

শ্রীমতী তেজ (ইহাঁকে দীপ্তি নাম দেওয়া গেল) একেবারে নিষ্কাসিত অসিলতার মত ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠেন এবং শাণিত সুন্দর সুরে ক্ষিতিকে বলেন, ইস্‌! তোমরা মনে কর পৃথিবীতে কাজ তোমরা কেবল একলাই কর, এবং সভ্যতা যতই বাড়িতেছে কেবল তোমাদেরই কাজ বাড়িতেছে! আমরা হাঁকডাক মারধোর আস্ফালন করি না বলিয়া কাজ করি না? তোমাদের কাজে যাহা আবশ্যক নাই বলিয়া অনাবশ্যকবোধে ছাঁটিয়া ফেলিতে চাও, আমাদের কাজে তাহার আবশ্যক থাকিতে পারে। তোমাদের আচারব্যবহার, কথাবার্ত্তা, বিশ্বাস, শিক্ষা এবং শরীর হইতে অলঙ্কারমাত্রই তোমরা ফেলিয়া দিতে চাও, কেন না, সভ্যতার ঠেলাঠেলিতে স্থান এবং সময়ের বড় অনটন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের যে চিরন্তন কাজ, ঐ অলঙ্কারগুলো ফেলিয়া দিলে তাহা একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের কত টুকিটাকি, কত ইটি-উটি, কত মিষ্টতা, কত শিষ্টতা, কত কথা, কত কাহিনী, কত ভাব, কত ভঙ্গী, কত অবসর সঞ্চয় করিয়া তবে এই পৃথিবীর গৃহকার্য্য চালাইতে হয়! আমরা মিষ্ট করিয়া হাসি, বিনয় করিয়া বলি, লজ্জা করিয়া কাজ করি, দীর্ঘকাল যত্ন করিয়া যেখানে যেটি পরিলে শোভা পায় সেটি পরি, এই জনাই তোমাদের মায়ের কাজ, তোমাদের স্ত্রীর কাজ এত সহজে করিতে পারি। যদি সত্যই সভ্যতার তাড়ায় অত্যাবশ্যক জ্ঞানবিজ্ঞান

ছাড়া আর সমস্তই দূর হইয়া যায়, তবে, একবার দেখিবার ইচ্ছা
াছে অনাথ শিশুসন্তানের এবং পুরুষের মত এত বড় অসহায়
নির্ব্বোধ জাতির কি দশাটা হয়!

শ্রীযুক্ত বায়ু (ইহাঁকে সমীরণ বলা যাক্) প্রথমটা একবার
াসিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ক্ষিতির কথা
ছাড়িয়া দাও; একটুখানি পিছন হঠিয়া, পাশ ফিরিয়া, নড়িয়া-
চড়িয়া একটা সত্যকে নানা দিক্ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে
গেলেই উহার মানসিক রাজ্যে এমনি একটা ভূমিকম্প উপস্থিত
হয়, যে, বেচারার বহুযত্ননির্ম্মিত পাকা মতগুলি কোনটা বিদীর্ণ,
কোনটা ভূমিসাৎ হইয়া যায়। কাজেই ও ব্যক্তি অচল অটল হইয়া
বসিয়া থাকে। বলে, দেবতা হইতে কীটপর্য্যন্ত সকলি মাটি
হইতে উৎপন্ন। কারণ মাটির বাহিরে আর কিছু আছে স্বীকার
করিতে গেলে আবার মাটি হইতে অনেকখানি নড়িতে হয়।
এই জন্যে উহাকে একটা কথা বুঝানো আমার মত উড়ো
লোকের পক্ষে একেবারে অসাধ্য। ও লোকটা স্থির করিয়া
বসিয়া আছে, পৃথিবীতে কেবল মানুষ এবং জড় আছে—এই জন্য
বিজ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক সভ্যতাই
সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সভ্যতা এ বিষয়ে উহার সন্দেহ নাই। উহাকে
এই কথাটা বুঝানো আবশ্যক যে, মানুষের সহিত জড়ের সম্বন্ধ
লইয়াই সংসার নহে, মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধটাই আসল
সংসারের সম্বন্ধ। কাজেই বস্তুবিজ্ঞান যতই বেশী শেখ না
কেন, তাহাতে করিয়া লোকব্যবহার শিক্ষার কোন সাহায্য
করে না। কিন্তু যেগুলি জীবনের অলঙ্কার, যাহা কমনীয়তা,
যাহা কাব্য, সেইগুলিই মানুষের মধ্যে যথার্থ বন্ধন স্থাপন করে,
পরস্পরের পথের কণ্টক দূর করে, পরস্পরের হৃদয়ের ক্ষত

আরোগ্য করে, নয়নের দৃষ্টি খুলিয়া দেয়, এবং জীবনের প্রসার মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তারিত করে। কিন্তু এ সকল কথ কোন যুক্তি দ্বারা উহাকে বুঝাইতে পারিব না; কেবল যদি (য়রা শ্রীমতী স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তি দিনকতক উহার প্রতি ে বিশেষ মনোযোগ কর, তবে উহার বিস্তর পাকা মত কাঁচাই৷ দিতে পার এরূপ আশা করা যায়।

শ্রীযুক্ত ব্যোম কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিয়া বলিলেন—হর হর বোম্ বোম্। ঠিক মানুষের কথা যদি বল, যাহা অনাবশ্যক তাহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। যে-কোন-কিছুতে সুবিধা হয়, কাজ চলে, পেট ভরে, মানুষ তাহাকে প্রতিদিন ঘৃণা করে। এই জন্য ভারতের ঋষিরা ক্ষুধাতৃষ্ণা শীতগ্রীষ্ম একেবারেই উড়াইয়া দিয়া মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছিলেন। বাহিরের কোন কিছুর যে নিতান্ত আবশ্যক আছে ইহাই জীবাত্মার পক্ষে অপমানজনক। সেই অত্যাবশ্যকটাকেই যদি মানব সভ্যতার সিংহাসনে রাজা করিয়া বসানো হয় এবং তাহার উপরে যদি আর কোন সম্রাট্‌কে স্বীকার না করা যায়, তবে, সে সভ্যতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতা বলা যায় না।

ব্যোম যাহা বলে তাহা কেহ মনোযোগ দিয়া শোনে না। পাছে তাহার মনে আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় স্রোতস্বিনী যদিও তাহার কথা প্রণিধানের ভাবে শোনে, তবু মনে মনে তাহাকে বেচারা পাগল বলিয়া বিশেষ দয়া করিয়া থাকে। কিন্তু দীপ্তি তাহাকে সহিতে পারে না। অধীর হইয়া উঠিয়া মাঝখানে অন্য কথা পাড়িতে চায়। তাহার কথা ভাল বুঝিতে পারে না বলিয়া তাহার উপর দীপ্তির যেন একটা আন্তরিক বিদ্বেষ আছে।

কিন্তু ব্যোমের কথা আমি কখন একেবারে উড়াইয়া দিই না।

আমি তাহাকে বলিলাম, ঋষিরা কঠোর সাধনায় যাহা নিজের নিজের জন্য করিয়াছিলেন, বিজ্ঞান তাহাই সর্ব্বসাধারণের জন্য করিয়া দিতে চায়। ক্ষুধাতৃষ্ণা, শীতগ্রীষ্ম এবং মানুষের প্রতি জড়ের যে শত সহস্র অত্যাচার আছে, বিজ্ঞান তাহাই দূর করিতে চায়। জড়ের নিকট হইতে পলায়নপূর্ব্বক তপোবনে মনুষ্যত্বের মুক্তিসাধন না করিয়া জড়কে ক্রীতদাস করিয়া ভৃত্যশালায় পুষিয়া রাখিলে এবং মনুষ্যকেই এই প্রকৃতির প্রাসাদে রাজা-রূপে অভিষিক্ত করিলে আর ত মনুষ্যের অবমাননা থাকে না। অতএব স্থায়ীরূপে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন আধ্যাত্মিক সভ্যতায় উপনীত হইতে গেলে মাঝখানে একটা দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক যুগ অতিবাহন করা নিতান্ত আবশ্যক।

ক্ষিতি যেমন তাঁর বিরোধী পক্ষের কোন যুক্তি খণ্ডন করিতে বলা নিতান্ত বাহুল্য জ্ঞান করেন, আমাদের ব্যোমও তেমনি একটা কথা বলিয়া চুপ মারিয়া থাকেন, তাহার পর যে যাহা বলে তাহার গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিতে পারে না। আমার কথাও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। ক্ষিতি যেখানে ছিল সেইখানেই অটল হইয়া রহিল এবং ব্যোমও আপনার প্রচুর গোঁফদাড়ি ও গাম্ভীর্য্যের মধ্যে সমাহিত হইয়া রহিলেন।

এই ত আমি এবং আমার পঞ্চভূত সম্প্রদায়। ইহার মধ্যে শ্রীমতী দীপ্তি একদিন প্রাতঃকালে আমাকে কহিলেন, "তুমি তোমার ডায়ারি রাখনা কেন?"

মেয়েদের মাথায় অনেকগুলি অন্ধসংস্কার থাকে, শ্রীমতী দীপ্তির মাথায় তন্মধ্যে এই একটি সংস্কার ছিল যে, আমি নিতান্ত যে-সে-লোক নহি; আমি কি ভাবি, কি করি তাহা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য ... অস্ত সর্ব্বমান যদি বা ... অনাদর করিয়া

থাকে দূরদর্শী ভবিষ্যৎ আমাকে নিশ্চয় সন্ধান করিয়া বাহির করিবে। বলা বাহুল্য এই সংস্কার দূর করিবার জন্য আমি অত্যধিক প্রয়াস পাই নাই।

শ্রীমতী স্রোতস্বিনীও আমার মস্তকের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিয়া দুই একটা অকালপক্ক অপরাধী কেশের সন্ধান করিতে করিতে, স্নেহমুখে, সস্মিতনেত্রে কহিলেন "সত্যি, তুমি ডায়ারি লেখনা কেন?" বিশ্বাসপরায়ণা স্রোতস্বিনীর মাথায়ও আমার সম্বন্ধে দুই একটি অমূলক সংস্কার আছে। সমীরণ উদার চঞ্চলভাবে আমার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন "লেখ না হে!" কেবল ক্ষিতি এবং ব্যোম চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, ডায়ারি লিখিবার একটি মহদ্দোষ আছে।

দীপ্তি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তা থাক্, তুমি লেখ!

স্রোতস্বিনী মৃদুস্বরে কহিলেন, কি দোষ, শুনি!

আমি কহিলাম—ডায়ারি একটা কৃত্রিম জীবন। কিন্তু যখনি উহাকে রচিত করিয়া তোলা যায়, তখনি ও আমাদের প্রকৃত জীবনের উপর কিয়ৎ পরিমাণে আধিপত্য না করিয়া ছাড়ে না। একটা মানুষের মধ্যেই যথেষ্ট গোলমাল আছে, সব-কটাকে সামলাইয়া সংসার চালানো এক বিষম আপদ, আবার বাহির হইতে স্বহস্তে তাহার একটি কৃত্রিম জুড়ি বানাইয়া দেওয়া আপদ বৃদ্ধি করা মাত্র।

কোথাও কিছুই নাই, ব্যোম বলিয়া উঠিলেন—সেই জন্যইত তত্ত্বজ্ঞানীরা সকল কর্ম্মই নিষেধ করেন। কারণ, কর্ম্মমাত্রই এক একটি সৃষ্টি। যখনি তুমি একটা কর্ম্ম সৃজন করিলে তখনি সে অমরত্ব লাভ করিয়া তোমার সহিত লাগিয়া রহিল। আমরা

যতই ভাবিতেছি, ভোগ করিতেছি, কাজ করিতেছি, ততই আপনাকে নানা-খানা করিয়া তুলিতেছি। অতএব বিশুদ্ধ আত্মাটিকে যদি চাও, তবে, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত সংস্কার, সমস্ত কাজ ছাড়িয়া দাও।

দীপ্তি ভারি চটিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সমীরণ হাসিয়া উঠিয়া কহিল, তোমার বিশুদ্ধ আত্মাও যা, আর মাছ বাদ দিয়া মাছের ঝোলও তাই। একেবারে বিশুদ্ধ বলিয়া যদি কিছু থাকে ত সে হইতেছে ০। অতবড় বিশুদ্ধ অবস্থার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মিশ্র অবস্থাই আমি ভালবাসি।

আমি কহিলাম, আমারও সেই কথা। আমি নিজেকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিতে চাহি না। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া গেলে তাহাকে ভাঙ্গিয়া আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।

ক্ষিতি হাসিয়া কহিল—ডায়ারিকে কেন যে জীবন বলিতেছ আমি ত এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

আমি কহিলাম, সব কথাই যে একেবারে পুরোপুরি বুঝিতে হইবে এমন নহে। মানুষের ভাষাও মানুষের মত; কেবল যে নিজের কাজটুকুই করে তাহা নহে, সময়ে অসময়ে পাড়াপড়শির কাজও করিয়া দেয়। জীবন বলিতে প্রত্যহ যেমনটা বুঝায়, কোন এক সময়ে আবশ্যকমত তাহা হইতে অর্থের একটু ইতস্ততঃ হইলে অত্যন্ত মারাত্মক হয় না। আমার কথা এই, জীবন একদিকে একটা পথ আঁকিয়া চলিতেছে, তুমি যদি ঠিক তার পাশে কলম হস্তে তাহার অনুরূপ আর একটা রেখা কাটিয়া

যাও, তবে ক্রমে এমন অবস্থা আসিবার সম্ভাবনা, যখন বোঝা শক্ত হইয়া দাঁড়ায় তোমার কলম তোমার জীবনের সমপাতে লাইন কাটিয়া যায়, না, তোমার জীবন তোমার কলমের লাইন ধরিয়া চলে। দুটি রেখার মধ্যে কে আসল কে নকল, ক্রমে স্থির করা কঠিন হয়। জীবনের গতি স্বভাবতই রহস্যময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্মখণ্ডন, অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্ব্বাপরের অসামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু লেখনী স্বভাবতই একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে। সে, সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করিয়া, সমস্ত অসামঞ্জস্য সমান করিয়া, কেবল একটা মোটামুটি রেখা টানিতে পারে। সে একটা ঘটনা দেখিলে তাহার যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কাজেই তাহার রেখাটা সহজেই তাহার নিজের গড়া সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং জীবনকেও তাহার সহিত মিলাইয়া আপনার অনুবর্ত্তী করিতে চাহে।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া স্রোতস্বিনী দয়ার্দ্রচিত্তে কহিল—বুঝিয়াছি তুমি কি বলিতে চাও। স্বভাবতঃ আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতি গোপন নির্ম্মাণশালায় বসিয়া এক অপূর্ব্ব নিয়মে আমাদের জীবন গড়েন, কিন্তু ডায়ারি লিখিতে গেলে দুই ব্যক্তির উপর জীবন গড়িবার ভার দেওয়া হয়। কতকটা জীবন অনুসারে ডায়ারি হয়, কতকটা ডায়ারি অনুসারে জীবন হয়।

স্রোতস্বিনী এমনি সহিষ্ণুভাবে নীরবে সমনোযোগে সকল কথা শুনিয়া যায় যে, মনে হয় যেন বহুযত্নে সে আমার কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় যে, বহুপূর্ব্বেই সে আমার কথাটা ঠিক বুঝিয়া লইয়াছে—তখন একটু

লজ্জা বোধ হয়। সেই সঙ্গে আশ্চর্য্য বোধ হয়। স্রোতস্বিনীর সহজ বুদ্ধিশক্তি প্রতিবারেই একটা নূতন আবিষ্কারের মত আনন্দ দান করে।

আমি কহিলাম—সেই বটে।

দীপ্তি কহিল—তাহাতে ক্ষতি কি?

আমি কহিলাম—ক্ষতি তুমি কি বুঝিবে? যে ভুক্তভোগী সেই জানে। যে লোক সাহিত্যব্যবসায়ী সে আমার কথা বুঝিবে। সাহিত্যব্যবসায়ীকে নিজের অন্তরের মধ্য হইতে নানা ভাব এবং নানা মানুষ বাহির করিতে হয়। যেমন ভাল মালী ফরমাস অনুসারে নানারূপ সংঘটন এবং বিশেষরূপ চাষের দ্বারা একজাতীয় ফুল হইতে নানা জাতীয় ফুল বাহির করে, কোনটার বা পাতা বড়, কোনটার বা রঙ বিচিত্র, কোনটার বা গন্ধ সুন্দর, কোনটার বা ফল সুমিষ্ট, তেমনি সাহিত্যব্যবসায়ী আপনার একটি মন হইতে নানাবিধ ফলন বাহির করে। মনের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবের উপর জীবনের উত্তাপ প্রয়োগ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ করে। যে সকল ভাব, যে সকল স্মৃতি, মনোবৃত্তির যে সকল উচ্ছ্বাস সাধারণ লোকের মনে আপন আপন যথানির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া যথাকালে ঝরিয়া পড়ে, অথবা রূপান্তরিত হইয়া যায়—সাহিত্যব্যবসায়ী সেগুলিকে ভিন্ন করিয়া লইয়া তাহাদিগকে স্থায়ীভাবে মানুষ করিয়া তোলে। যখনি তাহাদিগকে ভালরূপে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রকাশ করে, তখনি তাহারা অমর হইয়া উঠে। এমনি করিয়া ক্রমশঃ সাহিত্য-ব্যবসায়ীর মনে একদল স্বস্বপ্রধান লোকের পল্লী বসিয়া যায়। তাহার জীবনের একটা ঐক্য থাকে না। কখন্ সে যে কি ভাবে চলিবে সে আপনিই জানে না ত অন্যে কি জানিবে। সে দেখিতে

দেখিতে একেবারে শতধা হইয়া পড়ে। তাহার চিরজীবনপ্রাপ্ত ক্ষুধিত মনোভাবের দলগুলি বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র আপন হস্ত প্রসারণ করিতে থাকে। সকল বিষয়েই তাহাদের কৌতূহল। বিশ্বরহস্য তাহাদিগকে দশদিকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। সৌন্দর্য্য তাহাদিগকে বাঁশি বাজাইয়া বেদনাপাশে বদ্ধ করে। দুঃখকেও তাহারা ক্রীড়ার সঙ্গী করে, মৃত্যুকেও তাহারা পরখ করিয়া দেখিতে চায়। নব কৌতূহলী শিশুদের মত সকল জিনিষই তাহারা স্পর্শ করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, কোন শাসন মানিতে চাহে না। একটা দীপে একেবারে অনেকগুলা পলিতা জ্বালাইয়া দিয়া সমস্ত জীবনটা হুহুঃশব্দে দগ্ধ করিয়া ফেলা হয়। একটা প্রকৃতির মধ্যে এতগুলা জীবন্ত বিকাশ বিষম বিরোধ বিশৃঙ্খলার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

স্রোতস্বিনী ঈষৎ ম্লানভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাকে এইরূপ বিচিত্র স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্ত করিয়া তাহার কি কোন সুখ নাই?

আমি কহিলাম—সৃজনের একটা বিপুল আনন্দ আছে। কিন্তু কোন মানুষত সমস্ত সময় সৃজনে ব্যাপৃত থাকিতে পারে না—তাহার শক্তির সীমা আছে, এবং সংসারে লিপ্ত থাকিয়া তাহাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেও হয়। এই জীবনযাত্রায় তাহার বড় অসুবিধা। মনটির উপর অবিশ্রাম কল্পনার তা' দিয়া সে এমনি করিয়া তুলিয়াছে যে তাহার গায়ে কিছুই সয় না। সাত ফুটাওয়ালা বাঁশি বাদ্যযন্ত্রের হিসাবে ভাল, ফুৎকারমাত্রে বাজিয়া ওঠে, কিন্তু ছিদ্রহীন পাকা বাঁশের লাঠি সংসার-পথের পক্ষে ভাল, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায়।

সমীরণ কহিল—দুর্ভাগ্যক্রমে বংশখণ্ডের মত মানুষের কার্য্য-

বিভাগ নাই—মানুষ-বাঁশিকে বাজিবার সময় বাঁশি হইতে হইবে, আবার পথ চলিবার সময় লাঠি না হইলে চলিবে না। কিন্তু ভাই, তোমাদের ত অবস্থা ভাল, তোমরা কেহ বা বাঁশি, কেহ বা লাঠি, আর আমি যে কেবল মাত্র ফুৎকার। আমার মধ্যে সঙ্গীতের সমস্ত উপকরণই আছে, কেবল যে একটা আকারের মধ্য দিয়া তাহাকে বিশেষ রাগিণীরূপে ধ্বনিত করিয়া তোলা যায়, সেই ছাঁচটা, সেই যন্ত্রটা নাই। আমি কেবল চারদিকে হাহা হুহু করিয়াই মরি। বন্ধুরা সর্ব্বদা তাগিদ্ করেন, একটা কিছু কাজ কর না কেন; আমি বলি আমার এত বেশী ভাবের প্রাবল্য যে, কোন একটা বিশেষ কাজ করা আমার পক্ষে অসাধ্য। আমার সর্ব্বাঙ্গে এত অধিক বর্ম্ম চর্ম্ম অস্ত্রশস্ত্র কল-কৌশল যে, লড়াই করা আমার পক্ষে অসম্ভব। বরং যে লড়িবে আমি তাকে অস্ত্র যোগাইতে পারি। কোন কোন বন্ধু বলেন, তবে লেখনা কেন? আমি কিছু ফাঁস না করিয়া চোখ টিপিয়া বলি, আমি ত সেই চেষ্টাতেই আছি—আর দিনকতক যাক না। বন্ধু আশ্বস্ত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া যান, আমি বসিয়া বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবি, ভাবের ত কিনারা দেখি না—কিন্তু লিখিতে গেলে ত এক জায়গায় আরম্ভ এবং এক জায়গায় শেষ করিতে হইবে। বন্ধু যদি সেইটে নির্দ্দেশ করিয়া বাড়ি যাইতেন ত কাজে লাগিত।

দীপ্তি কহিলেন—মানবজন্মে আমাদের অনেক জিনিষ অনর্থক লোকসান হইয়া যায়। আমাদের কত চিন্তা, কত ভাব, কত ঘটনা প্রবল সুখদুঃখের ঢেউ তুলিয়া দিয়া যায়, তাহারা কি এত তুচ্ছ যে একেবারে বিস্মৃতির যোগ্য! আমাকে যাহারা প্রতি-দিন নানারূপে বিচলিত করিয়া যায়, তাহাদিগকে যদি লেখায়

বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি তাহা হইলে মনে হয় যেন আমার জীবনের অনেকখানি হাতে রহিল। সুখই হৌক্, দুঃখই হৌক্, কাহারো প্রতি একেবারে সম্পূর্ণ দখল ছাড়িতে আমার মন চায় না।

ইহার উপরে আমার অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু দেখিলাম স্রোতস্বিনী একটা কি বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় যদি আমি আমার বক্তৃতা আরম্ভ করি তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজের কথাটা ছাড়িয়া দিবে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল—কি জানি ভাই, আমার ত আরো ঐটেই সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তিজনক মনে হয়। প্রতিদিন আমরা যাহা অনুভব করি তাহা প্রতিদিন লিপিবদ্ধ করিতে গেলে তাহার যথাযথ পরিমাণ থাকে না। আমাদের অনেক সুখদুঃখ, অনেক রাগদ্বেষ অকস্মাৎ সামান্য কারণে গুরুতর হইয়া দেখা দেয়। হয়ত অনেক দিন যাহা অনায়াসে সহ্য করিয়াছি একদিন তাহা একেবারে অসহ্য হইয়াছে, যাহা আসলে অপরাধ নহে একদিন তাহা আমার নিকটে অপরাধ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, তুচ্ছকারণে হয় ত একদিনকার একটা দুঃখ আমার কাছে অনেক মহত্তর দুঃখের অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া মনে হইয়াছে, কোন কারণে আমার মন ভাল নাই বলিয়া আমরা অনেক সময় অন্যের প্রতি অন্যায় বিচার করিয়াছি, তাহার মধ্যে যেটুকু অপরিমিত, যেটুকু অন্যায়, যেটুকু অসত্য তাহা কালক্রমে আমাদের মন হইতে দূর হইয়া যায়—এইরূপে ক্রমশই জীবনের বাড়াবাড়িগুলি চুকিয়া গিয়া জীবনের মোটামুটিটুকু টিঁকিয়া যায়, সেইটেই আমার প্রকৃত আমারত্ব। তাহা ছাড়া আমাদের মনে অনেক কথা অর্দ্ধস্ফুট আকারে আসে যায়

দিলায় তাহাদের সবগুলিকে অতিস্ফুট করিয়া তুলিলে মনের সৌকুমার্য্য নষ্ট হইয়া যায়। ডায়ারি রাখিতে গেলে একটা কৃত্রিম উপায়ে আমরা জীবনের প্রতি তুচ্ছতাকে বৃহৎ করিয়া তুলি, এবং অনেক কচি কথাকে জোর করিয়া ফুটাইতে গিয়া ছিঁড়িয়া অথবা বিকৃত করিয়া ফেলি।

সহসা স্রোতস্বিনীর চৈতন্য হইল কথাটা সে অনেকক্ষণ ধরিয়া এবং কিছু আবেগের সহিত বলিয়াছে, অমনি তাহার কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল—মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া কহিল—কি জানি, আমি ঠিক বলিতে পারি না, আমি ঠিক বুঝিয়াছি কি না কে জানে!

দীপ্তি কখন কোন বিষয়ে তিলমাত্র ইতস্ততঃ করে না—সে একটা প্রবল উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া আমি কহিলাম—তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমিও ঐ কথা বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু অমন ভাল করিয়া বলিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। শ্রীমতী দীপ্তির এই কথা মনে রাখা উচিত, বাড়িতে গেলে ছাড়িতে হয়। অর্জ্জন করিতে গেলে ব্যয় করিতে হয়। জীবন হইতে প্রতিদিন অনেক ভুলিয়া, অনেক ফেলিয়া, অনেক বিলাইয়া তবে আমরা অগ্রসর হইতে পারি। কি হইবে প্রত্যেক তুচ্ছ-দ্রব্য মাথায় তুলিয়া, প্রত্যেক ছিন্নখণ্ড পুঁটুলিতে পূরিয়া, জীবনের প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্ত পশ্চাতে টানিয়া লইয়া? প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ঘটনার উপর যে ব্যক্তি বুক দিয়া চাপিয়া পড়ে সে অতি হতভাগ্য!

দীপ্তি সৌখিক হাস্য হাসিয়া করযোড়ে কহিল—আমার ঘাট হইয়াছে তোমাকে ডায়ারি লিখিতে বলিয়াছিলাম, এমন কাজ আর কখন করিব না।

সমীরণ বিচলিত হইয়া কহিল—অমন কথা বলিতে আছে! পৃথিবীতে অপরাধ স্বীকার করা মহাভ্রম। আমরা মনে করি দোষ স্বীকার করিলে বিচারক দোষ কম করিয়া দেখে, তাহা নহে; অন্য লোককে বিচার করিবার এবং ভর্ৎসনা করিবার সুখ একটা দুর্লভ সুখ, তাহাতে মনেমনে একটা উচ্চাসনের অধিকারী হওয়া যায়। তুমি নিজের দোষ নিজে যতই বাড়াইয়া বল না কেন, কঠিন বিচারক সেটাকে ততই চাপিয়া ধরিয়া সুখ পায়। আমি প্রমাণ করিয়া দিব, সংসারের মধ্যে জীবনের কাজ করিয়া যাওয়ার অপেক্ষা ডায়ারির মধ্যে একটা জীবন গঠিত করিয়া যাওয়া ঢের ভাল কাজ। হুইট্‌নি সাহেব কহেন, পাণিনি যে এমন একটা সুসম্পূর্ণ ব্যাকরণ, তাহার কারণ, উহা কোন ভাষা অবলম্বন করিয়া রচিত নহে—তৎপূর্ব্বের সংস্কৃত ভাষার সহিত তাহার অবিকল যোগ নাই—অনেক আইনকানুন, ধাতুপ্রত্যয় নিজের ইচ্ছামতে গড়িয়া ব্যাকরণটা খুব সুসম্বদ্ধ হইয়াছে। জীবন্ত ভাষার ন্যায় মানুষের জীবনও অসম্পূর্ণ। অতএব জীবনটাকে বাদ দিয়া ডায়ারিকে পাণিনি ব্যাকরণের ন্যায় সম্পূর্ণ করিয়া তুলিলে যাহা হউক একটা রীতিমত কাজ করা হয়। আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব ভাবিতেছিলাম, এখন স্থির করিতেছি আমি ডায়ারি লিখিব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন সকল অনুরোধ দীপ্তি আমাকে করেন না। আমার মত এমন বিশুদ্ধ ক্ষেত্র আর নাই। আমি যে কি হইতে পারি এবং না হইতে পারি তাহা কেহ বলিতে পারে না—খবরের কাগজের সম্পাদক হইতে হাইকোর্টের জজ্ পর্য্যন্ত আমি যে কি আকারে পৃথিবীকে চকিত স্তম্ভিত করিব তাহা কেহ জানে না। অতএব দীপ্তির মাথায় যে সকল নূতন নূতন ভাব সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, আমাকে

যদি তার উপযুক্ত পরীক্ষাস্থল বিবেচনা করেন, তাহা হইলেই তাঁর বিবেচনা-শক্তির পরিচয় দেওয়া হয় এবং আমার মত কর্ম্মহীন হতাশ লোকের মনেও কিঞ্চিৎ সন্তোষ জন্মে। যাহা হউক্ দীপ্তি আমাকে যদি ডায়ারি লিখিতে অনুরোধ করেন, আমি তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি।

আমি কহিলাম—আমিও প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার নিজের কথা লিখিব না। এমন কথা লিখিব যাহা আমাদের সকলের। এই আমরা যে সব কথা প্রতিদিন আলোচনা করি—

স্রোতস্বিনী কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উঠিল। সমীরণ করযোড়ে কহিল—"দোহাই তোমার, সব কথা যদি লেখায় ওঠে, তবে বাড়ি হইতে কথা মুখস্থ করিয়া আসিয়া বলিব। এবং বলিতে বলিতে যদি হঠাৎ মাঝখানে ভুলিয়া যাই, তবে আবার বাড়ি গিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে। তাহাতে ফল হইবে এই যে, কথা বিস্তর কমিবে এবং পরিশ্রম বিস্তর বাড়িবে। যদি খুব ঠিক সত্য কথা লেখ, তবে তোমার সঙ্গ হইতে নাম কাটাইয়া আমি চলিলাম।

আমি কহিলাম—আরে না, সত্যের অনুরোধ পালন করিব না, বন্ধুর অনুরোধই রাখিব। তোমরা কিছু ভাবিও না আমি তোমাদের মুখে কথা বানাইয়া দিব।

ক্ষিতি বিশাল চক্ষু প্রসারিত করিয়া কহিল—সে যে আরো ভয়ানক। আমি বেশ দেখিতেছি তোমার হাতে লেখনী পড়িলে যত সব কুযুক্তি আমার মুখে দিবে আর তাহার অকাট্য উত্তর নিজের মুখ দিয়া বাহির করিবে।

আমি কহিলাম—মুখে যাহার কাছে তর্কে হারি, লিখিয়া তাহার প্রতিশোধ না নিলে চলে না। আমি আগে থাকিতেই

বলিয়া রাখিতেছি, তোমার কাছে যত উপদ্রব এবং পরাভব সহ্য করিয়াছি এবারে তাহার প্রতিফল দিব।

সর্ব্বসহিষ্ণু ক্ষিতি সন্তুষ্টচিত্তে কহিল—তথাস্তু।

ব্যোম কোন কথা না বলিয়া ক্ষণকালের জন্য ঈষৎ হাসিল, তাহার সুগভীর অর্থ আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই।

সুখ না দুঃখ?

মোটামুটি বলিতে গেলে মানুষ সুখের জন্য লালায়িত এবং দুঃখকে পরিহার করিবার জন্যই সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল। সুখের জন্য, অর্থাৎ সুখ বলিতে যাহা বুঝায়, বা যে যা' বুঝে, তাহার জন্য, অন্বেষণ ও তাহার লাভের চেষ্টাই জীবন। শুধু মনুষ্যজীবন কেন, ইতরপ্রাণীর পক্ষেও সুখের চেষ্টাই জীবন-প্রণালী; এবং স্থূলহিসাবে সুখান্বেষণ-চেষ্টার ফলই জৈবিক অভিব্যক্তি ও জৈবিক প্রবাহ। এস্থলে সুখ কি, সুখের আধ্যাত্মিক অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে বিতণ্ডা তোলার আবশ্যক নাই। সুখ অর্থে নিজের পক্ষে যে যাহা বুঝে সে তাহাই করে, এবং তাহার উদ্দেশ্য তাহার লক্ষ্যীভূত পদার্থ; অন্যের আদর্শোপযোগী হউক আর নাই হউক, সেই নিজ নিজ চেষ্টার সমবেত ফলে সৃষ্টি চলিতেছে; উন্নতিই বল আর অধোগতিই বল, বিবর্ত্তন বা অভিব্যক্তি তাহার ফলেই চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে। অভিব্যক্তির আর পাঁচটা কারণ থাকিলেও ডারুইনের প্রদর্শিত অভিব্যক্তি-প্রণালী স্থূল কথায় এই;——

যদিও আবহমানকাল মানুষের এই চেষ্টা এবং সুখান্বেষণেরই নাম জীবনপ্রয়াস, কিন্তু জীবনে সুখের ভাগ বেশী কি

দুঃখের ভাগ বেশী, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বহুকাল হইতে এই কথাটার মীমাংসা লইয়া দলাদলি চলিতেছে। এক পক্ষের মতে জীবনে সুখের মাত্রাই অবশ্য অধিক; অন্যপক্ষ বলেন, অসুখের পরিমাণ সুখের পরিমাণকে চিরকালই ছাড়াইয়া রহিয়াছে। হইতে পারে, প্রথম পক্ষ নিজ জীবনে দুঃখ অপেক্ষা সুখের আস্বাদন অধিকমাত্রায় পাইয়াছেন; তাঁহারা সকলই সুস্থ-চোখে সুন্দর দেখেন, এবং কুৎসিত হইতে স্বভাবতঃ দূরে থাকিয়া কুৎসিতের অস্তিত্ব জগতে নাই বলিতে চাহেন। অপর পক্ষ নিজ জীবনে তাদৃশ সৌভাগ্যশালী নহেন; তাঁহাদের রুগ্ন চক্ষু সুরূপকেও বিকৃত দেখে, এবং নৈরাশ্যের দুর্ব্বলতায় শিথিল পদদ্বয় দুঃখের পাঁক হইতে উঠিয়া সহজলভ্য সুখের শুষ্কপথে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। এরূপস্থলে তাঁহাদের মতামত নিজ জীবনের অনুভূতির প্রতিফলিত ছায়ামাত্র; জগতে সুখদুঃখের তারতম্য নির্ণয়ে ইহাঁদের মতামতের কোন মূল্য নাই। বলা বাহুল্য, যুক্তির ভার কোন্ পক্ষে গুরুতর তাহা স্থির করাই প্রধান সমস্যা, নিক্তির কাঁটা কোন্ দিকে হেলিয়াছে তাহা ঠিক্ দেখিবার উপায় থাকিলে, এতদিন মীমাংসা বাকী থাকিত না। কেন না, বিচারকেরাও বিচারকালে আপন আপন প্রকৃতি-গত চশ্‌মা চোখে না দিয়া পারেন না; কাজেই কেহ বলেন, এদিক্ ভারী, কেহ বলেন ওদিক্।

প্রথম পক্ষের প্রধান যুক্তি এক কথায় এই;—জীবনে সুখ বেশী, জীবনের অস্তিত্বই তার প্রমাণ। জীবনে সুখ না থাকিলে, অর্থাৎ সুখের মাত্রা অধিক না হইলে, মানুষ বাঁচিতে চাহিবে কেন? মানুষ যে বাঁচিতে চায়, (অবশ্য দুই চারিটা আত্ম-ঘাতীকে বাদ দিয়া) ইহাই সুখের মাত্রাধিক্য প্রমাণ করিতেছে।

দুঃখের ভাগ বেশী হইলে, দড়ি কলসী যোগান এতদিন 'বিরাট' ব্যাপার হইত; সংসার এতদিন জীবহীন মরুভূমে পরিণত হইত। আধিব্যাধি, মরণযাতনা, নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস, ধর্ম্মের নিপীড়ন, নিরীহের পেষণ, তাহার উপর মুখোস্‌পরা ধর্ম্মের জয়জয়কার ও প্রণয়ে কৃত্রিমতা, এসব নাই এমন নহে; তবে স্নেহ, দয়া, ভক্তি, মমতা, সারল্য, প্রেম ইহারাও আকাশকুসুম বা ভাষার কল্পিত অলঙ্কার নহে। এইসকলও জগতে বর্ত্তমান আছে, এবং ইহাদের পরিমাণ সর্ব্বতোভাবে অধিক বলিয়াই মানুষ আহারনিদ্রা সম্বন্ধে ভালরূপ বন্দোবস্তে আজিও নিতরাং ব্যাপৃত; নতুবা অভিব্যক্তি, অন্ততঃ মানুষের অভিব্যক্তি ব্যাপারটা এতদিন লোপ পাইত, এবং ডারুইন সাহেবকেও অভিব্যক্তি-বাদের সমর্থনের জন্য প্রয়াস ও অবকাশ পাইতে হইত না। মোটের উপর মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব এবং সেই অস্তিত্ব রক্ষণার্থ প্রয়াসই বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে যথেষ্ট উত্তর।

আজিকালি যাঁহারা নীতিশাস্ত্র নূতন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত করিয়া গঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাঁহাদের অনে-কেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ইঁহারা দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না;—কেন না, দুঃখের ক্ষয়সাধন ও সুখের বর্দ্ধ-নই অভিব্যক্তির মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য; সুতরাং দুঃখ আছে বৈ কি। নিরবচ্ছিন্ন সুখলাভই মনুষ্যজীবনের চরম উদ্দেশ্য, এবং জীব-নের প্রবাহ সেই মুখেই চলিতেছে বলিয়া সামাজিক উন্নতি। যাহা সুখপ্রদ বা মোটের উপর সুখপ্রদ তাহাই ধর্ম্ম, যাহা মোটের উপর দুঃখপ্রদ তাহাই অধর্ম্ম। ধর্ম্মাধর্ম্মের সংজ্ঞা শুনিয়া প্রথমে ভয় জন্মিতে পারে; কিন্তু 'সুখ' শব্দটার প্রতি যথেচ্ছ পরিমাণে আধ্যাত্মিক ভাবে উঁচু অর্থ প্রয়োগ করিয়া

আশ্বস্ত হওয়া যাইতে পারে। সুখ কি, না যাহাতে জীবন বর্দ্ধন করে; এবং জীবনবর্দ্ধনের ন্যায় মহান্ উদ্দেশ্য প্রকৃতির নিকট আর কি আছে? এইরূপে সুখ কথাটার ব্যাখ্যা করিলে ভয়ের আশঙ্কা বড় থাকে না। যাই হউক, মনুষ্যজীবনের ও মনুষ্যসমাজের উন্নতি হইতেছে যদি ধরা যায়, তবে সুখের মাত্রা ও উৎকর্ষ ক্রমেই বাড়িতেছে; কখনও পূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু গতি পূর্ণতার দিকে; এবং সর্ব্বক্ষণেই তদানীন্তন দুঃখের মাত্রাপেক্ষা তদানীন্তন সুখের মাত্রা অধিক; নহিলে মানুষ জীবনবর্দ্ধনের প্রয়াস না পাইয়া জীবনলোপের প্রয়াস পাইত। ধর্ম্মনীতি উলটাইয়া যাইত, স্নেহমমতা, পাপ ও চুরি-ডাকাতি ধর্ম্মের পর্য্যায়ে স্থান পাইত। যখন তাহা হয় নাই, তখন অবশ্যই মানুষ মোটের উপর সুখী।

ডারুইনের জাতীয় অভিব্যক্তি নামক পুঁথিখানা জগতের দৃশ্যপটটাকে অনেকটা বদলাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে শান্তি, প্রীতি ও মাধুর্য্য দেখা যাইত, এখন সেখানে কেবল হিংসা, স্বার্থ, শোণিততৃষা ও নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব দেখা যাইতেছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যেটাকে ঋষিদের তপোবনের মত 'শান্ত-রসাস্পদ' বোধ হইত, এখন নাদির সাহের অনুগৃহীত দিল্লী তাহার কাছে হারি মানে। কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টিবিভ্রম! এই নির্ম্মম কাটাকাটিই আবার মনুষ্যসমাজেরও উন্নতির অনেকটা মূল, এ কথা বলিতে গিয়া অনেকে গালি খাইয়াছেন, এবং গালি-অঙ্কের অভিনয় এখনও যে শীঘ্র থামিবে এরূপ ভরসা বড়ই অল্প। কিন্তু যাঁহারা জগতের এই বিভীষিকাময় চিত্র দেখান, তাঁহারা অথবা তাঁহাদের চেলারাই আবার জীবনের সুখময়ত্ব প্রতিপন্ন করিতে চান ইহাই বিস্ময়কর। উপরে যে বৈজ্ঞানিক

মতের উল্লেখ করিয়াছি, হর্বার্ট স্পেন্সর ইহার প্রধান প্রচারক; এবং হর্বার্ট স্পেন্সর ডারুইন-তত্ত্বের একজন প্রসিদ্ধ 'পাণ্ডা'।

ডারুইনের দর্শিত চিত্র দেখিলে জীবনের সুখময়ত্বে বিশ্বাস করা বড়ই অসংসাহসিক ব্যাপার হয়; কেন না, হিংসা ও রক্ত-পাতই যেখানে উন্নতির প্রধান উপায়, সেখানে আবার সুখ কি? ঘাতকের কিয়ৎপরিমাণে আপন মনের মত সুখ বা তৃপ্তি জন্মিতে পারে। কিন্তু সেও ক্ষণিকমাত্র, কেন না, জঠর-জ্বালারূপ সনাতন মহাদুঃখ নিবারণের জন্যই এই হত্যা-ব্যব-সায়; এবং আহারব্যাপারের পরক্ষণেই আবার জঠরজ্বালার পুনরাবির্ভাব। আর যে হন্যমান, তাহার যে পরোপকার-বৃত্তি সে সময়ে বিশেষ প্রবল হয় এবং তজ্জনিত পরমানন্দ উপভোগ করে, তাহারও প্রমাণাভাব। যাহাই হউক, সুপ্রসিদ্ধ আল্‌ফ্রেড্‌ ওয়ালাস্‌ ইহারও উত্তর দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ওয়ালাস্‌ এহেন ভীষণ ক্ষেত্রেও ক্লেশের অস্তিত্ব একেবারে লোপ করিতে চাহেন। জীবজগতে রক্তপাত আছে, হিংসা আছে, কিন্তু ক্লেশ নাই। হত্যাকার্য্যের দর্শক যেমন ভয় পান, যাহার উপর কার্য্যটা নিষ্পন্ন হইতেছে সে ততটা পায় না; দয়াশীলা প্রকৃতির এমনি সুচারু নিয়ম যে, হন্যমান জীবের অনুভূতির তীব্রতা থাকে না, এমন কি, বোধশক্তি হয়ত হননকালে লোপ পায়। প্রহার দেখা, শুনা বা কল্পনা ভয়ানক; কিন্তু প্রহার খাইতে কোন কষ্ট নাই। সকলে পরীক্ষাটা করিতে সম্মত হইবেন কি না সন্দেহ; তবে ওয়ালাসের যুক্তি ফেলিবার নহে। কিন্তু ওয়া-লাসের প্রয়াস কতদূর সফল হইয়াছে বলা যায় না। প্রহার-ভোগে যেন ক্লেশ খুব কম হইল, বা না হইল; তবে প্রহার-দর্শনও ত নিত্য ঘটনা। আবার দুঃখের অস্তিত্ব উড়াইতে গেলে

সুখের অস্তিত্বও উড়িয়া যায় ; কেন না, দুঃখ আছে বলিয়াই ত সুখও আছে। আবার দুঃখ হইতে মুক্তিচেষ্টাইত অভিব্যক্তি। তবে প্রকৃতির সমুদায় বিধানই দুঃখ লঘুকরণের অভিমুখী, এই পর্য্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ যাঁহারা জীবনকে দুঃখময় বলেন, তাঁহারা ও-পক্ষের যুক্তিতর্ক না শুনিয়া সুখাধিক্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিতে চান। কই খুঁজিয়া দেখিলে সুখ ত সংসারে মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য, দুঃখের ন্যায় সুলভ সামগ্রী কিছুই নাই। দারিদ্র্যকে দুঃখ বল, সংসারে তাহা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, ধনী কয়টা ? অজ্ঞানে দুঃখ বল, জ্ঞান কোথায় ? আবার অধর্ম্মে দুঃখ বল, পৃথিবীতে ধর্ম্ম বেশী না অধর্ম্ম বেশী ? ধার্ম্মিক যেখানে দুইটা, অধার্ম্মিক সেখানে দুশটা ; আবার ধার্ম্মিক দুইটার ধার্ম্মিকত্ব প্রমাণাপেক্ষ, অধার্ম্মিক দুশটার অধার্ম্মিকতায় সন্দেহ নাই। আবার মূল কথা লইয়া দেখ। জীবন বা জীবনী চেষ্টা যাহাকে বল, সে ত কেবল জীবনরক্ষার বা দুঃখলোপের প্রয়াসমাত্র। কিন্তু হায়, অধিকাংশস্থলে প্রয়াস কি কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র নহে। আবার মানসিক জীবনের প্রধান ভাগই ইচ্ছা বা লালসা। ইচ্ছা বা লালসা লইয়াই জীবন ও জীবনের সমুদায় কার্য্য ; বুদ্ধি, কি চিন্তা, কি অন্যান্য মানসিক বৃত্তি ত ইচ্ছারই ভরণপোষণ,পরিচর্য্যাকার্য্যে নিযুক্ত। সেই ইচ্ছার অর্থ কি ? না, বর্ত্তমান অভাব, বর্ত্তমান ক্লেশ, দূরীকরণের প্রবৃত্তি। অর্থাৎ জীবন মূলেই দুঃখময়, অভাবময়। অভাবময়তা না থাকিলে ইচ্ছা থাকিত না, জীবনের আবশ্যকতা থাকিত না। জীবনের সংজ্ঞাই যেখানে দুঃখময়তা হইল, দুঃখময়তার ক্রমিক প্রবাহই জীবনের স্রোত হইল, দুঃখময়তায় দূরীকরণে নিষ্ফল আয়াসই জীবনের সমাপ্তি,

সেখানে জীবন দুঃখময়, কি সুখময় তাহা প্রশ্ন করা বাতুলতা। যেখানে অভাবের শেষ, সেইখানে জীবনপ্রবাহ ত রুদ্ধ; অভাবের পরম্পরাতেই জীবলীলা। বাঁচিবার ইচ্ছা সুখের ইচ্ছা নহে, দুঃখ হইতে নিষ্কৃতির ইচ্ছা, তবে নিষ্কৃতি হয় না। জীবন দুঃখময়, যেহেতু জীবন জীবন।

তবে সুখ বলিয়া কি কিছু নাই? সুখ দুঃখের অভাবমাত্র। আর সুখের নিরপেক্ষ অস্তিত্বই যদি স্বীকার করা যায়, তাহা-তেই বা কি দেখা যায়? ধর সুখত আছে, দুঃখত আছে। কিন্তু সুখের তীব্রতা নাই; দুঃখের তীব্রতা আছে। "সুখ যত স্থায়ী হয় তত কমে, দুঃখ যত থাকে তত বাড়ে। এমন কি, অতিরিক্ত সুখই দুঃখ হইয়া দাঁড়ায়; দুঃখকে সুখ হইতে দেখা যায় না। সংসারে চাহিয়া দেখ, শোক, হিংসা, ঈর্ষ্যা, পরিতাপ সবই দুঃখময়;—যৌবন, স্বাধীনতা, দুঃখের তাৎকালিক অভাবমাত্র; ধন, মান, প্রণয়, সুখের আশা দেয়, কিন্তু আনে দুঃখ,—স্নেহ, দয়া, মমতা, ইহারা ত অধিকাংশ দুঃখেরই মূল;—জ্ঞান, ধর্ম্ম, তাহারা ত অন্তর্দৃষ্টির প্রসার বাড়াইয়া, অনুভূতির তীক্ষ্ণতা জন্মা-ইয়া দুঃখভোগেরই সুবিধা করিয়া দেয়।" * যে জ্ঞানী, যে ধার্ম্মিক, তাহার দুঃখভোগ-শক্তি অধিক। দুঃখও অধিক। মানু-ষেরইত দুঃখ, কাঠপাতরের আবার দুঃখ কি?

জাতীয় উন্নতির সঙ্গে দুঃখের মাত্রা কমিতেছে বলাও চলে না। উন্নত কে? না, যার দুঃখভোগের ক্ষমতা অধিক, যে ভুগিতে জানে, সুতরাং ভোগে। যাহার চেতনা নাই, তাহার দুঃখ নাই। নিকৃষ্ট জীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবের অনুভূতি

---

* Sidgwick's History of Ethics p. 273.

প্রখর, নিকৃষ্ট মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষের অনুভূতি তীক্ষ্ণ। সুতরাং দুঃখানুভব-শক্তির বিকাশের নামই উন্নতি বা অভিব্যক্তি। যেখানে উন্নতি অধিক, সেখানে দুঃখই অধিক। ফিজি-দ্বীপের লোকে বুড়া বাপকে রাঁধিয়া খায়; বিদেশী কারাবাসীর জন্য হাওয়ার্ডের প্রাণ কাঁদে, কার দুঃখ অধিক ?

মোটের উপর জীবনে সুখ থাকা অসম্ভব, এবং জীবনের উদ্দেশ্য সুখ নহে। মানুষ বাঁচিয়া আছে ও বাঁচিতে চায়, তাহাতে সুখের প্রমাণ হয় না; তাহাতে প্রাকৃত শক্তির নিকট মানুষের পূর্ণ অধীনতা প্রমাণ করে। মানুষ অন্ধশক্তির বশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে; ফাঁদ এড়াইতে যাইয়া ফাঁদে পা দিতেছে; দুঃখ এড়াইতে গিয়া দুঃখে পড়িতেছে; তথাপি তাহার জ্ঞান হয় না, তথাপি বাঁচিতে চায়। প্রকৃতির হাতের ক্রীড়াপুতুল মানুষ। ইহাই প্রধান রহস্য। বুদ্ধিমান যে আত্মঘাতী। সে প্রকৃতিকে ঠকায়।

বর্ত্তমান দুঃখবাদীদের মধ্যে শোপেন হাওয়ার ও হার্ট্‌ম্যান অগ্রণী। সুখের আশা নাই; সভ্যতাবৃদ্ধি ও জ্ঞানের উন্নতি দুঃখই বাড়াইবে; সুখের বাঞ্ছা ত্যাগ কর; ইচ্ছা নিরোধ কর; তোমার জীবন, তৎসঙ্গে জাতীয় জীবন, শূন্যত্বে সমাহিত হউক। স্ফূর্ত্তিমান্ ইংরাজ যে, মোটের উপর সুখবাদী হইবেন বুঝা যায়, কিন্তু বলদৃপ্ত জ্ঞানদৃপ্ত জর্ম্মনিতে কিরূপে দুঃখবাদের প্রাদুর্ভাব হইল ভাল বুঝা যায় না।

হিন্দুর লয়তত্ত্ব, বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ, এই চিরন্তন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষার ফল। বৈদিক আর্য্যগণের দুঃখবাদী হইবার বড় অবসর ছিল না। ইন্দ্রদেব, তুমি জল দাও, গরু দাও, ভাল শ্রী দাও, বলিয়া যাঁহারা হোমানলে সোমরস ঢালিতেন,

তাঁহাদের জীবনের প্রতি একটা বিশেষ আসক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার সহিত জীবনে অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণার আবির্ভাব দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম্মে তাহার পরিণতি। দুঃখপাশ হইতে মুক্তির চেষ্টাই বুদ্ধদেবের জীবন। তার পর হইতে হিন্দুশাস্ত্র নানা ভাবে সেই একই কথা বলিয়াছে; মুক্তিলাভের নানা উপায় আলোচনা করিয়াছে; যিনি যখন বুদ্ধদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মসংস্কারে হাত দিয়াছেন, তখনই তাঁহার মুখে সেই পুরাতন কথা; ইচ্ছা নিরোধ কর, কর্ম্ম ভস্মসাৎ কর, মোক্ষ লাভ করিবে। আধুনিক হিন্দুর অস্থিমজ্জায় এই ভাব মিশান রহিয়াছে।

কবিগণের মধ্যেও এ সম্বন্ধে মতের মিল দেখা যায় না। হইতে পারে কাব্যে যাহা দেখি, তাহা কবির নিজ জীবনের অনুভাবের প্রতিফলিত ভাবমাত্র। কালিদাস যে, কখন সুখ ও সৌন্দর্য্য ছাড়া আর কিছু ভোগ করিয়াছিলেন বোধ হয় না। ইন্দুমতীর মৃতদেহে শ্রমজলবিন্দু যাঁহার নজরে পড়ে, শোকমূর্চ্ছিতা রতিকে যিনি বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী দেখেন, তিনি যে মরণের ন্যায় প্রকাণ্ড ব্যাপারটাকে প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বলিয়া এক কথায় উড়াইয়া দিয়া কেবল সুন্দর-দর্শনেই ব্যাপৃত থাকিবেন বিচিত্র নহে। রামায়ণ মানবজীবনের মহান দুঃখসঙ্গীত। তবে বৈরাগ্য অবলম্বন ইহার উপদেশ নহে। সংসারে দুঃখ আছে; নিস্তারের উপায় নাই; কিন্তু জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, সমাজের সেবা কর; বৈরাগী হইও না। শেক্ষপীয়রের কল্পিত পরীরাজ্যের চঞ্চল স্ফূর্ত্তিমত্তা দেখিয়া ইংরাজের জাতীয় জীবনের নবোদ্গত প্রফুল্ল স্ফূর্ত্তিমত্তা মনে পড়ে, যাহা এলিজাবেথের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান টানে ফুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু যেথা-

নেই শেক্ষপীয়র জীবনের রহস্যভেদে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেথা-নেই প্রণয়ের নৈরাশ্য, ধর্ম্মের বিড়ম্বনা ও জীবনের নিষ্ফলতায় উষ্ণশ্বাস ফেলিয়াছেন। বন্ধুশোকার্ত্ত টেনিসন্ সৃষ্টিলীলায় প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির ঠাহর না পাইয়া হতাশ্বাস হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষীণপ্রাণা অসহায়া কুন্দনন্দিনীর মৃতদেহের সহিত সংসারের বিষবৃক্ষকেও দগ্ধ দেখিতে পারিলে শান্তির আশা জন্মিতে পারে।

বিজ্ঞানের নিকটও আশার বাণী শুনা যায় না। প্রকৃতি নিষ্ঠুরা ;—জাতীয় জীবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির জীবন অহরহঃ উৎসর্গ করিতেছে। তোমার সম্মুখে সুখের পট ধরিয়া তাহারই আশায় তোমাকে নাচাইতেছে ও খাটাইতেছে ; কিন্তু তোমার বৃদ্ধি প্রকৃতির উদ্দেশ্য নহে, জাতীয় বৃদ্ধিই তাহার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের জন্য যখন খেয়াল নিষ্ঠুরভাবে তোমায় বলিদান দিবে, তুমি যদি সুপুত্র হও, নিজের ভাবনা না ভাবিয়া প্রকৃতির কার্য্যে সহায়তা কর। আবার জাতীয় জীবনের বৃদ্ধিই যে প্রকৃতির উদ্দেশ্য, তাহাই বা কেমন করিয়া বলি। বিজ্ঞান জাতীয় জীবনেরও যে পরিণাম দেখাইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির খেয়াল ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য আছে বুঝা যায় না।

মোট কথা, পুরস্কারের আশা নাই ; ভাল ছেলে হও ত বিহিত বিধানে জীবনের কাজ কর, বৈরাগী হইও না ;—প্রকৃতির এই উপদেশ।

মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষ ভাবে দুই দিক দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা মার্জ্জনা করিবেন।

উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য।

লেখক মহাশয়ের লেখনী অজ্ঞাতসারে বামের দিকেই কিঞ্চিৎ অধিক হেলিয়াছে—তিনি মনেমনে দুঃখকেই যেন বেশী প্রাধান্য দিয়াছেন। কারণ, সংসারে যদি সুখের পরিমাণ অধিক থাকে তাহা হইলে মীমাংসার ত কোন গোল থাকে না। জমা অপেক্ষা খরচ অধিক হইলে তহবিল মেলে না—জগতের জমাখরচে যদি দুঃখটাই বেশী হইয়া পড়ে তবে জগৎটার হিসাব নিকাশ হয় না।

ধর্ম্মব্যবসায়ীরা অন্ধভাবে বলপূর্ব্বক দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহেন। কিন্তু সেরূপ করিয়া কেবল ছেলে ভুলানো হয় মাত্র। যাঁহারা সংসারের দুঃখতাপ অন্তরে বাহিরে চতুর্দ্দিকে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে জগতের দুঃখের অংশ কোন মতে গোঁজামিলন দিয়া সারিয়া লইবার চেষ্টা করা নিতান্ত মূঢ়ের কাজ। জগতে এমন শত সহস্র দুঃখ আছে যাহার মধ্যে মানববুদ্ধি কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে পারে না। এমন অনেক কষ্ট, অনেক দৈন্য আছে, যাহার কোন মহিমা নাই,যাহা জীবের আত্মাকে অভিভূত, সঙ্কীর্ণ, শ্রীহীন করিয়া দেয়—দুর্ব্বলের প্রতি সবলের, প্রাণের প্রতি জড়ের এমন অনেক অত্যাচার আছে, যাহা অসহায়দিগকে অবনতির অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে—আমরা তাহার কোন কারণ, কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাই না। মঙ্গল পরিণামের প্রতি যাঁহার অটল বিশ্বাস আছে তিনি এ সম্বন্ধে বিনীতভাবে অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং জগদীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া মিথ্যা ওকালতি করিতে বসা স্পর্দ্ধা বিবেচনা করেন। অতএব জগতে দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহি না।

কিন্তু অনেক সময়ে একটা জিনিষকে তাহার চতুর্দ্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে গেলে তাহাকে অপরিমিত গুরুতর করিয়া তোলা হয়। দুঃখকে বিশ্লিষ্ট করিয়া একত্র করিলে পর্ব্বতের ন্যায় দুর্ভর ও স্তূপাকার হইয়া উঠে, কিন্তু স্বস্থানে তাহার এত ভার নাই।

সমুদ্র হইতে এক কলস জল তুলিয়া লইলে তাহা বহন করা কত কষ্টসাধ্য, কিন্তু জলের মধ্যে যখন ডুব দেওয়া যায়, তখন মাথার উপর শত সহস্র কলস জল তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার ভার অতি সামান্য বোধ হয়। জগতে ভার যেমন অপরিমেয়, ভার সামঞ্জস্যও তেমনি অসীম। পরস্পর পরস্পরের ভার লাঘব করিতেছে। চিরজীবন নিত্যবহন করিবার পক্ষে আমাদের শরীর কিছু কম ভারী নহে। স্বতন্ত্র ওজন করিয়া দেখিলে তাহার ভারের পরিমাণ যথেষ্ট দুঃসহ মনে হইতে পারে। কিন্তু এমন একটি সামঞ্জস্য আছে যে, আমরা তাহা অক্লেশে বহন করি। সেইরূপ জগতে দুঃখ অপর্য্যাপ্ত আছে বটে, কিন্তু তাহা লাঘব করিবারও সহস্র উপায় বর্ত্তমান। আমরা আমাদের কল্পনা-শক্তির সাহায্যে দুঃখকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা নির্ম্মাণ করিতে পারি, কিন্তু অনন্ত সংসারের মধ্যে সে অনেকটা লঘুভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই কারণেই এই দুঃখপারাবারের মধ্যেও সমস্ত জগৎ এমন অনায়াসে সন্তরণ করিতেছে, অমঙ্গল মঙ্গলকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না, এবং আনন্দ ও সৌন্দর্য্য চতুর্দ্দিকে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

সুভা।

১।

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে? তাহার ছুটি বড় বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোট মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমত অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড় ছুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মত বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না, সে যে কিছু অনুভব করে, ইহা সকলের মনে হয় না, এই জন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে, বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ কথা শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত, মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু বেদনা কি কেহ কখন ভোলে? পিতামাতার মনে সে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল।

বিশেষতঃ তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপে দেখিতেন। কেন না, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশস্বরূপে দেখেন—কন্যার কোন অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ

কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁহার অন্য মেয়ের অপেক্ষা যেন একটু বেশী ভালবাসিতেন, কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড় বিরক্ত ছিলেন।

সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড় বড় ছুটি কালো চোখ ছিল—এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মত কাঁপিয়া উঠিত। কথায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করি, সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জ্জমা করার মত; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে কিছু তর্জ্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে; ভাব আপনি তাহার উপরে কখন প্রসারিত, কখন মুদিত হয়, কখন উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখন ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখন অস্তমান চন্দ্রের মত অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখন দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মত দিখিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বই আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই, তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর, অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মত, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মত একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জ্জন দ্বিপ্রহরের মত শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।

২।

গ্রামের নাম চণ্ডিপুর। নদীটি বাঙ্গলা দেশের একটি ছোট নদী, গৃহস্থ ঘরের মেয়েটির মত; বহুদূরপর্য্যন্ত তাহার প্রসর

নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়; দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চতট; নিম্নতল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুত পদক্ষেপে, প্রফুল্লহৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্য্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাখারির বেড়া, আটচালা, গোয়াল ঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান, নৌকাবাহীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য স্বচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্ম্মে যখনি অবসর পায় তখনি সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখীর ডাক, তরুর মর্ম্মর সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চির-নিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি ইহাও বোবার ভাষা—বড় বড় চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে ভাষা, তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সঙ্গীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখীরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্ম্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক

নির্জ্জন মূর্ত্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে, আর একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্ব্বশী ও পাঙ্গুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখন শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত—তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন্ তাহাদের আদর করিতেছে, কখন্ ভৎর্সনা করিতেছে, কখন্ মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভাল বুঝিতে পারিত। সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্ব্বশীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল; গৃহে যেদিন কোন কঠিন কথা শুনিত, সেদিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধু দুটির কাছে আসিত—তাহার সহিষ্ণুতাপরিপূর্ণ বিষাদশান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কি একটা অন্ধ অনুমানশক্তির দ্বারা বালিকার মর্ম্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত, এবং সুভার গা ঘেঁষিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্ব্বাক্ ব্যাকুলতার সহিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষ ভাবের মৈত্রী ছিল না, তথাপি

তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন্ তখন্ সুভার গরম কোলটি নিঃসঙ্কোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে, যে, তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

৩।

উন্নত-শ্রেণীর জীবের মধ্যে সুভার আরো একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল, কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোট ছেলেটি—তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। সে যে, কাজকর্ম্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে বহু চেষ্টার পর বাপ মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্ম্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপর বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয়—কারণ, কোন কার্য্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারী সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। সহরে যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারী বাগান থাকা আবশ্যক, তেমনি গ্রামে দুই চারিটা অকর্ম্মণ্য সরকারী লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজেকর্ম্মে, আমোদে অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে, সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান সখ, ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটান' যায়। অপরাহ্নে নদীতীরে

ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে কোন কাজেই নিযুক্ত থাক্, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভাল। মাছধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্য্যাদা বুঝিত। এইজন্য, সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে 'সু' বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেঁতুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে মাটিতে ছিপ্ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত প্রতাপের কোন একটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা কোন কাজে লাগিতে, কোন মতে জানাইয়া দিতে, যে, এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু কিছুই করিবার ছিল না। তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত—মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য্য হইয়া যাইত, বলিত, "তাইত! আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা ত জানিতাম না!" মনে কর, সুভা যদি জলকুমারী হইত; আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছধরা রাখিয়া সেই মাণিক লইয়া জলে ডুব মারিত; এবং পাতালে গিয়া দেখিত, রূপার অট্টালিকায় সোনার পালঙ্কে—কে বসিয়া?—আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু—আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর

একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না, তাহা কি এতই অসম্ভব! আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে, এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য্য করিতে পারিতেছে না।

৪।

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোন একটা পূর্ণিমা তিথিতে কোন একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্ব্বচনীয় চেতনা-শক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না। গভীর পূর্ণিমা রাত্রে সে এক একদিন ধীরে শয়ন-গৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে। পূর্ণিমা প্রকৃতিও সুভার মত একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া—যৌবনে রহস্যে, পুলকে বিষাদে, অসীম নির্জ্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্যান্ত, এমন কি, তাহা অতিক্রম করিয়াও থম্‌থম্‌ করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুল বালিকা দাঁড়াইয়া।

এদিকে কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি, একঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণীকণ্ঠের স্বচ্ছল অবস্থা, দুই বেলাই মাছ ভাত খায়, এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রীপুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মত বাণী

বিদেশে গেল। অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল "চল, কলিকাতায় চল।"

বিদেশযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশা-ঢাকা প্রভাতের মত সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কাবশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্ব্বাক্ জন্তুর মত তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত—ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কি একটা বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্ণে জলে ছিপ্ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, "কিরে, সু, তোর না কি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছিস্? দেখিস্, আমাদের ভুলিস্ নে।" বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল। মর্ম্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে "আমি তোমার কাছে কি দোষ করিয়াছিলাম," সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না; বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়ন-গৃহে তামাক খাইতেছিলেন, সুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। সুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্যসঙ্গীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল—দুই নেত্রপল্লব হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শুক্ল দ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়নগৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শস্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল—যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, "তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা, আমার মত দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখ!"

কলিকাতার এক বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া, খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলঙ্কারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। সুভার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছে, পাছে চোখ ফুলিয়া খারাপ দেখিতে হয় এজন্য তাহার মাতা তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু অশ্রুজল ভর্ৎসনা মানিল না।

বন্ধু সঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন—কন্যার মাবাপ চিন্তিত, শঙ্কিত, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথ্য হইতে বিস্তর তর্জ্জন গর্জ্জন শাসন করিয়া বালিকার অশ্রুস্রোত দ্বিগুণ বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন। পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "মন্দ নহে।" বিশেষতঃ বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া বুঝিলেন, ইহার হৃদয় আছে এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে হৃদয় আজ বাপমায়ের বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে। শুক্তির মুক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূল্য বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আর কোন কথা বলিল না।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খুব একটা শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপ মা দেশে চলিয়া গেল—তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে পশ্চিমে লইয়া গেল।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না, সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারিদিকে চায়—ভাষা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না—বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল—অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।

বৃত্তিত্রয়ের অভিব্যক্তি।

অহংবৃত্তি মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি এই তিন বৃত্তিকে এখানে আমরা বৃত্তিত্রয় বলিতেছি। শব্দ লইয়া মিথ্যা গোলোযোগ বাধানো আমাদের দেশের একটি চিরন্তন প্রথা—তাহার সাক্ষী রাশি রাশি টীকা, ভাষ্য এবং টিপ্পনীসকলের একের সঙ্গে অন্যের বিরোধ। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া—বৃত্তি বলিতে আমরা কি বুঝি, সেটা সর্ব্বাগ্রে ভাঙিয়া বলা শ্রেয় বিবেচনা করি।

লেখক কোনো এক প্রবন্ধের একস্থানে বৃত্তিভেদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করাতে তদুপলক্ষে কোনো বিজ্ঞ সমালোচক (ভাবে বোধ হইল যেন ঈষৎ হাস্য করিয়া) পরোক্ষে বলিয়াছিলেন, "এখনো ইনি বৃত্তিভেদ মানেন!" অর্থাৎ যেন বৃত্তি-ভেদ না মানা ঊনবিংশ-শতাব্দীয় বিদ্যা-শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ! ইঁহার জানা উচিত যে, বৃত্তি-ভেদ যদি বাস্তবিক না থাকিত, তবে কল্পনাতেও বৃত্তিভেদের কথা উঠিতে পারিত না। বাহ্যেন্দ্রিয় যেমন বহু, মনোবৃত্তিও তেমনি বহু; প্রভেদ কেবল এই যে,(১) বৃত্তিগণের সমাবেশ ধারাবাহী (one dimentional), অর্থাৎ তাহারা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এইভাবে অনুবদ্ধ; (২) বাহ্যেন্দ্রিয়গণের সমাবেশ ত্রৈধারিক (Tridimentional), অর্থাৎ তাহারা উপর নীচে, বাম দক্ষিণ, সম্মুখ পশ্চাৎ এইভাবে সম্বদ্ধ। ইহার সহজ উদাহরণ;—মুকুল এবং পুষ্প দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে ইহা তো স্বীকার কর? মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ। স্বপ্নাবস্থা এবং জাগ্রদবস্থা দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে, ইহা তো স্বীকার কর?—মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ। নিদ্রা এবং জাগরণের সন্ধিস্থল ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে,নিদ্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে বুদ্ধিবৃত্তি মনোবৃত্তিতে পর্য্যবসিত হয়; এবং নিদ্রা ভাঙিলে মনোবৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তিতে পরিণত হয়। অতএব বলা যাইতে পারে যে, মুকুল এবং পুষ্পের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ; আবার, একটি পুষ্পের দুইটি দলের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, বাম চক্ষু এবং দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ। মনে করিও না যে, পুষ্প ঝরিয়া পড়িল, ফল পাকিয়া উঠিল, পুষ্প গেল—আর সে দেখা দিবে না! অথবা, সূর্য্য অস্ত-

মিত হইল, রাত্রি সমাগত হইল, আর সূর্য্য উঠিবে না; বুদ্ধি নিস্তেজ হইল তো গেল—আর বুদ্ধি ফিরিয়া আসিবে না! আবার ফল হইতে বীজ বাহির হইবে, বীজ হইতে বৃক্ষ বাহির হইবে, বৃক্ষ হইতে পুষ্প এবং ফল যথাক্রমে উদ্বোধিত হইবে। খুব সম্ভব যে, মনোবৃত্তি-সকল পর্য্যায়-ক্রমে ঘুরিয়া বেড়ায় দেখিয়া পূর্ব্বকালের কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহাদের নাম দিয়াছিলেন বৃত্তি। এক শব্দের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করার নাম আবৃত্তি; যেমন, গোবিন্দ শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক কোনো বৈষ্ণব মালা জপ করিলে বলা যাইতে পারে—গোবিন্দ শব্দের আবৃত্তি হইতেছে। প্রথমে গো, তাহার পরে বি, তাহার পরে ন্দ; আবার গো, আবার বি, আবার ন্দ, এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে যেমন গোবিন্দ শব্দের আবৃত্তি হয়; প্রথমে দিন, পরে সন্ধ্যা, পরে রাত্রি; আবার দিন, আবার সন্ধ্যা, আবার রাত্রি এইরূপ পর্য্যায়-ক্রমে যেমন কাল-চক্রের আবৃত্তি হয়; তেমনি প্রথমে অহংবৃত্তি, পরে মনোবৃত্তি, পরে বুদ্ধিবৃত্তি; আবার অহংবৃত্তি, আবার মনোবৃত্তি, আবার বুদ্ধিবৃত্তি পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তিত হয়—এই জন্যই বোধ করি বা তাহাদের নাম হইয়াছে বৃত্তি। বৃত্তিত্রয় যে, ঐরূপে আবর্ত্তিত হয় তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই:—

পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, শিশু অহং লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়; ক্রমে সেই অহং হইতে মন অভিব্যক্ত হয়, এবং তাহার পরে মন হইতে বুদ্ধি অভিব্যক্ত হয়; এইরূপে অহংবৃত্তি, মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমান্বয়ে অভিব্যক্ত হয়। বৃক্ষে এখনো ফুল ফুটে নাই কিন্তু মুকুল ধরিয়াছে—এখনো জ্ঞান জন্মে নাই কিন্তু জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ জ্ঞানের জন্য আঁকুবাঁকু, দেখা দিয়াছে—এই ভাবটি জ্ঞানের প্রথমাবস্থা; ইহাকেই আমরা বলিতেছি মনো-

বৃত্তি। তাহার পরে যখন জানা হয় যে "এটা এই", "ইহার উহার মধ্যে প্রভেদ এই" ইত্যাদি—জ্ঞানের এই যে অপেক্ষাকৃত পরিণত অবস্থা ইহাকেই আমরা বলিতেছি বুদ্ধিবৃত্তি। এ যেন হইল—কিন্তু এ তো পরম্পরাক্রম; পর্য্যায়ক্রমের প্রমাণ কি? বুঝিলাম যে, ১, ২, ৩, এইরূপ ক্রমে অহং, মন এবং বুদ্ধি অভিব্যক্ত হয়;—কিন্তু তাহারা যে ১, ২, ৩; ১, ২, ৩; ১, ২, ৩; এইরূপ করিয়া সঙ্গীতের তালের ন্যায় পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হয়, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই;—মনুষ্য প্রথমে প্রকৃতির হস্তে গঠিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়—তাহার পরে মনুষ্যের হস্তে গঠিত হয়; এই দ্বিতীয় বারে, যিনি গঠিত হইতেছেন তিনিও মনুষ্য; কাজেই "মনুষ্য কর্ত্তৃক মনুষ্য গঠিত হয়" এরূপ বলিলে তাহার সঙ্গে ইহাও বুঝাইয়া যায় যে, মনুষ্য কতকপরিমাণে আপনা কর্ত্তৃক আপনি পরিগঠিত হয়। সভ্যজাতীয় মনুষ্য ছয় জন কারিকরের হস্তে ক্রমান্বয়ে পরিগঠিত হয়—(১) প্রকৃতির হস্তে,(২) মাতার হস্তে, (৩) পিতার হস্তে, (৪) শিক্ষকের হস্তে, (৫) সঙ্গীগণের হস্তে, (৬) আপনার হস্তে। মাতা, পিতা গুরু প্রভৃতির হস্তে গঠিত হইয়া মনুষ্য যখন রীতিমত মানুষ হইয়া উঠে; তখন হইতে সে আপনার কর্ম্ম দ্বারা আপনি পরিগঠিত হইতে থাকে। প্রথমে মাতা এবং সহকারী মাতা (অর্থাৎ ধাত্রী), মনুষ্যকে মানুষ করে; তাহার পরে শিক্ষক এবং সঙ্গীগণ তাহাকে মানুষ করে; তাহার পরে এই জন্মেই যখন সে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করে—তখন হইতে আপনার কর্ম্ম দ্বারা আপনি আপনাকে মানুষ করে; (শুধু তা' নয়—রাক্ষসও করে;—যেমন, রাবণ, রিচার্ড দি থার্ড; দেবতাও করে, যেমন, রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট ইত্যাদি।)

কচি বালক প্রথমাবস্থায় আপনার অহংটুকু মাত্র জানে—

ক্ষুধা হইলেই চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে; আর কেহ খাইল কি না খাইল তাহা বিন্দুমাত্রও ভাবে না—কিন্তু তাহার আপনার খাওয়াটি চাইই চাই। কচি বালকের এরূপ আচরণ দেখিয়া কেহই তাহাকে দোষ দেয় না, যেহেতু তাহাতেই তাহার সৌন্দর্য্য। এ অবস্থায় বালক মাতার হস্তে লালিতপালিত হয়; ক্রমে তাহার মনোবৃত্তি যতই বিকসিত হইতে থাকে ততই 'এটা কি,' 'ওটা কি' জানিবার জন্য তাহার একটা আঁকুবাঁকু জন্মে; এবং তাহারই উত্তেজনায় ক্রমে সে মাতৃভাষায় স্বভাব-সুলভ ব্যুৎপত্তি লাভ করে—অর্থাৎ না পড়িয়া যতদূর ভাষাবিৎ হইতে পারা যায়, তাহাই হয়। এইরূপে তাহার মনোবিকাশ কতক দূর অগ্রসর হইলে তাহাকে যখন বিদ্যালয়ে দেওয়া হয়, তখন হইতে তাহার বুদ্ধি-বিকাশ আরম্ভ হয়; তাহার পরে তাহার বুদ্ধি ক্রমে যখন পরিপক্ক হইয়া উঠে, তখন মাতৃগর্ভ হইতে শিশু যেমন অন্তঃপুরে জন্মগ্রহণ করে, সে সেইরূপ বিদ্যালয় হইতে সংসার-ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করে। এই কারণবশতঃ পূর্ব্ব-কালে ব্রাহ্মণেরা গুরুগৃহ হইতে রীতিমত পরিগঠিত হইয়া বাহির হইলে দ্বিজ নামে সংজ্ঞিত হইতেন। এইরূপ অবস্থায় মনুষ্য যখন প্রথম জন্ম হইতে দ্বিতীয় জন্মে পদনিক্ষেপ করে, তখন প্রথম জন্মে যেমন তাহার অহংবৃত্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি পরে পরে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, দ্বিতীয় জন্মে পুনর্ব্বার সেই তাহার অহংবৃত্তি, মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি আরএক ভাবে পরে পরে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। কি ভাবে?

প্রথম জন্মের অহং, মন, বুদ্ধি, এবং দ্বিতীয় জন্মের অহং, মন, বুদ্ধি, উভয়কে পরস্পরের সহিত তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—কি ভাবে।

প্রথম জন্মের অহংবৃত্তি আপনাকে কেবল জানে, আর কিছুই জানে না; কিন্তু দ্বিতীয় জন্মের অহংবৃত্তি বুদ্ধিবিকাশের পরে বিকসিত হইতে আরম্ভ হয়; সুতরাং এবারে এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, অহংবৃত্তি কেবল আপনাকেই জানে, আর কিছুই জানে না।

দুই বারের দুই অহংবৃত্তিকে পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথম জন্মের অংহবৃত্তি যখন আপনাকে ছাড়া অন্য কিছুই জানে না, তখন কাজেই বলিতে হয় যে, অন্যের সঙ্গে আপনার তুলনা করিয়া আপনার আপনাত্ব সংস্থাপন করা তাহার কার্য্য নহে; কিন্তু দ্বিতীয় জন্মের অহংবৃত্তি বুদ্ধিবিকাশের পরবর্ত্তী—সুতরাং এবারকার অহংবৃত্তি আপনাকে যেমন জানে, তেমনি অন্যকেও জানে; তা' ছাড়া অন্যের সঙ্গে আপনার তুলনা করিয়া উভয়ের ভেদাভেদ কিরূপ তাহাও জানে; তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া অন্যের তুলনায় আপনার বড়ত্ব সমর্থন করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। এইজন্য, দ্বিতীয় জন্মের অহংবৃত্তি অহংকার শব্দের বাচ্য। দ্বিতীয় জন্মের মনোবৃত্তিও বুদ্ধিবিকাশের পরবর্ত্তী; প্রথম জন্মের মনোবৃত্তি "এটা কি ওটা কি" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিত এবং তাহার উত্তরে তাহাকে যে যাহা বলিত তাহাতেই সে সন্তুষ্ট থাকিত; কিন্তু এবারকার মনোবৃত্তির জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তি সেরূপ সহজে হইতে পারে না; এ অবস্থার লোকে জিজ্ঞাস্য বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়া-শুনিয়া—হাতেকলমে পরীক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আপন আপন জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তি করে। পূর্ব্বে যেখানে জিজ্ঞাসা-মাত্র ছিল—এখন সেখানে 'মীমাংসা,' কিনা প্রমাণের ইচ্ছা, আসিয়া দেখা দেয়। বুদ্ধিও এবারে সামান্য জ্ঞানে (পুঁথিগত বিদ্যায়) সন্তোষ মানে

না। এবারে বুদ্ধি নানা কাজকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া চারিদিক দেখিয়া-শুনিয়া বিজ্ঞতা এবং বহুদর্শিতা উপার্জ্জন করে; সেই শৃঙ্খলা-বদ্ধ (systematic) জ্ঞান উপার্জ্জন করে—যাহার নাম বিজ্ঞান। এখানে পুস্তকের বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা হইতেছে না;—এমন অনেক মুহুরি আছেন যিনি অঙ্কশাস্ত্র পড়েন নাই—অথচ হিসাব-রাখা-কার্য্যে অদ্বিতীয় নিপুণ। বিশেষ বিশেষ মনুষ্য বিশেষ বিশেষ কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিজ্ঞতা লাভ করে। বিজ্ঞতামাত্রই শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান; উড়ো উড়ো সামান্য জ্ঞান কখনই বিজ্ঞতা শব্দের বাচ্য হইতে পারে না—বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

এইরূপ করিয়া জীবন-চক্র দুইপাক ঘুরিলে তবেই সাংখ্য-দর্শনের এই কথা সপ্রমাণ হয় যে, বুদ্ধি হইতে অ হংকার, অহংকার হইতে মন ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন, যথা—
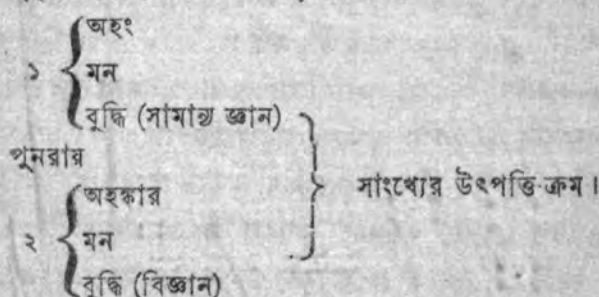
এইরূপ প্রথম জন্মের অপরিস্ফুট অহং এবং মন ছাড়িয়া দিয়া তৎকাল-সুলভ বুদ্ধি (সামান্য জ্ঞান) হইতে গণনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহংকার হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে—ইহাই সাংখ্যের উৎপত্তিক্রম। অভিব্যক্তির ভিত্তিমূল বিষয়ে আর একবার পর্য্যালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল, সেই সঙ্গে সাংখ্য-দর্শনের মহত্তত্ত্ব যে,

প্রকৃত প্রস্তাবে বস্তুটা কি তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

কবি ভবভূতি।

ভারতবর্ষের কাব্যজগতে কালিদাস ও ভবভূতি কবিশ্রেষ্ঠ। মহাভারত ও রামায়ণ এই দুইখানি অসামান্য, অতুল্য ও অনন্ত কাব্যরত্নখনি ছাড়িয়া দিলে, সংস্কৃত আর কোনও গ্রন্থই শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের সমতুল নহে। কল্পনাপটু ও কারুণ্যরসপ্রধান হিন্দু কবিদিগের কল্পনা হইতে শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের ন্যায় সুন্দর কাব্য কখন নিঃসৃত হয় নাই। হিন্দুজগতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের নিকটেই শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের যেরূপ আদর, অন্য কোনও কাব্যের সেরূপ আদর নাই।

অনেক প্রগল্‌ভ বালক জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, কালিদাস বড়, না ভবভূতি বড়? প্রশ্নটী শুনিলে, বিবাহের সময় যে জিজ্ঞাসা করে, বর বড়, না কনে বড়,—সেই কথাটা মনে পড়ে! দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বর বড় হইতে পারেন, মাধুর্য্য ও কমনীয়তায় কনে বড়। বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তিতে কখন কখন বর বড়,—অনেক সময়ে কনে বড়! লেখাপড়ায় এতদিন বর বড় ছিল, এখন বলা যায় না, অনেক কনে "বি এ"-উপাধি সম্প্রাপ্তা! কাব্য ও উপন্যাস লেখায় আজকাল কনে বড়,—আমরা হার মানিয়াছি।

কালিদাস বড়, না ভবভূতি বড়, এ কথা সহজে মীমাংসা করিবার যোগ্য নহে। প্রগল্‌ভ বালকে যাহাই বলুক, যাঁহারা কবিত্বের মর্ম্ম হৃদয়ের সহিত বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই এই প্রশ্নের

উত্তর দিতে সঙ্কুচিত হইবেন। অনেক গুণে কালিদাস বড়, আবার অনেক গুণে ভবভূতি বড়। কালিদাসের রচনা মধুর ও সুললিত, ভবভূতির রচনা সেরূপ মধুর নহে, স্থানে স্থানে কর্কশ। কালিদাসের উপমাগুলি যেন উপবনে রাশি রাশি বন্যফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ স্বাভাবিক, সেইরূপ বিচিত্র, সেইরূপ সুগন্ধ ও সুন্দর—হৃদয়মুগ্ধকারী। ভবভূতির সেরূপ উপমাচাতুর্য্য নাই। তদ্ভিন্ন কালিদাসের কল্পনায় যেন আবিষ্কারক্ষমতা অধিক আছে, কল্পনা হইতে যে জগৎটী যখন সৃষ্টি করেন, কি কণ্বমুনির আশ্রম, কি উমার জন্মস্থান, কি যক্ষের প্রবাসভূমি, সে জগৎটী যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, পাঠক সেই জগতে বিচরণ করিতে করিতে যেন বহির্জ্জগৎ ভুলিয়া যান, তাহার প্রাণমন কবির জগতে স্নিগ্ধ ও আনন্দিত হয়। ভবভূতির কল্পনায় এরূপ আবিষ্কারক্ষমতা নাই। আরও বোধ হয়, মানবহৃদয়ের সরলতা, কমনীয়তা, মধুরতা বর্ণনা করিতেও কালিদাস ভবভূতি হইতে সুপটু, এবং বহির্জ্জগৎ বর্ণনায় কালিদাস অতুল্য। উদাহরণস্থলে আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার হৃদয়ের সরলতা ও কমনীয়তা দেখ, এবং যক্ষবর্ণিত ভারতবর্ষের শৈল ও নদী, পুরী ও প্রান্তরের বর্ণনা দেখ।

এইসমস্ত গুণে কালিদাস বড়, কিন্তু ভবভূতিও নির্গুণ নহেন। মানবহৃদয়ের তীব্র তেজ, তীব্র দর্প, তীব্র দুঃখ বর্ণনায় ভবভূতি কালিদাসকে পরাস্ত করেন। মালতীমাধবে যেরূপ ভয়াবহ বর্ণনাসমূহ আছে, কালিদাসের কোনও কাব্যে সেরূপ নাই। সীতার বনবাসে যেরূপ দুঃখের পর অধিকতর দুঃখের উচ্ছ্বাসে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কালিদাসের কোনও কাব্যে সেরূপ নাই। সীতা ও রামের প্রগাঢ় প্রণয়, তাহাদের বিচ্ছেদে ভীষণ

বেদনা, তাহার পর পূর্ব্বকথাস্মরণে রামচন্দ্রের হৃদয়ে শতবৃশ্চিক-দংশনাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা, এসমস্ত যেরূপ ভবভূতির তীব্র লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, কালিদাসের লেখনীর সেরূপ ক্ষমতা কোথায়ও দেখা যায় না। শকুন্তলার শোকবর্ণনা সীতার শোক বর্ণনার সমতুল নহে; দুষ্মন্তের মনস্তাপ রামচন্দ্রের মনস্তাপের নিকট যৎসামান্য বোধ হয়।

ফলতঃ মনুষ্যহৃদয়ের তীব্র ও গভীর ভাবগুলি বর্ণনা করিতে ভবভূতি ভারতবর্ষে অতুল্য। যে গুণে ইংরাজী কবিদিগের মধ্যে শেক্ষপীয়র প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, সে গুণ ভারতকবিদিগের মধ্যে ভবভূতির অধিক পরিমাণে আছে। "ওথেলো" পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয় যেরূপ অতিশয় উদ্বিগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত হয়, উত্তর-রামচরিত পাঠ করিলে পাঠকের হৃদয় সেইরূপ ব্যাকুল ও অধীর হইয়া উঠে।

আমরা কবিদ্বয়ের দোষগুণ বর্ণনা করিলাম, এক্ষণে কে বড় তাহা চাঁদনাতলার সুন্দরীগণ নির্ণয় করিয়া লইবেন।

এখন কালিদাস ও ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা, হিন্দুদিগের অবস্থা জানিতে ইচ্ছা করে। কবিগণ আকাশ হইতে পড়েন নাই, এই আমাদের হিন্দুসমাজেই বাস করিতেন, হিন্দু রাজাদিগের সভা ভূষিত করিতেন, হিন্দু শ্রোতাদিগকে তুষ্ট করিতেন। কোন্ সময়ের কি প্রকার সমাজে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কোন্ রাজার সভা বিভূষিত করিয়াছিলেন, এ সকল কথা আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়।

কালিদাসের কথা আমরা পূর্ব্বে অন্যত্র লিখিয়াছি। খৃষ্টের অনুমান ৫৫০ বৎসর পর যখন বিক্রমাদিত্য রাজা, বিদেশীয় আক্রমণকারীগণকে পরাস্ত ও বিদূরিত করিয়া সিন্ধুতীর হইতে মগধ-

প্রদেশ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন, যখন উজ্জয়িনী-রাজধানীতে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে জড় করিলেন, তখন সেই পণ্ডিতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস সেই সভায় বিরাজ করিতেন। বিদ্যার আলোক, জ্ঞানের আলোক, কাব্যের আলোক সেইকালে যেরূপ ভারতক্ষেত্রে চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল, সেরূপ তাহার পর আর কখনও হয় নাই।

সেই সময়েই, কালিদাসের কিছু পূর্ব্বে, মগধদেশে পাটলীপুত্র নগরে জগদ্বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত আর্য্যভট্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, এবং পৃথিবী যে প্রত্যহ ঘুরিতেছে এ কথাও তাঁহার প্রাচীন গ্রন্থে প্রতীয়মান হয়। আর্য্যভট্ট লিখিয়া গিয়াছেন, "নৌকারোহী ব্যক্তি যেরূপ নদীর তীরের দিকে চাহিয়া মনে করে, তীরস্থ স্থির বস্তুগুলি পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে, সেইরূপ পরিবর্ত্তমান জগতের লোকে মনে করে যে, আকাশের স্থির তারাগুলি প্রত্যহ সরিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ উদয় হইয়া অস্ত যাইতেছে।"

আর্য্যভট্টের পর বরাহমিহির নামক জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত কালিদাসের সময়ের লোক, এবং বিক্রমাদিত্যের সভার এক পণ্ডিত ছিলেন। পাঁচটী প্রাচীন সিদ্ধান্ত একত্রিত করিয়া তিনি "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা" * নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং "বৃহৎ-

* এ পুস্তকখানি সম্প্রতি কাশীধামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সুহৃদ্বর শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের নিকট আমি এ গ্রন্থ প্রথমে দেখি।

সংহিতা” নামক আর একটী গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা “এসিয়াটিক্ সোসাইটী” দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৃহৎসংহিতায় নানা কথা আছে, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের কথাও আছে। ষষ্ঠ শতাব্দীর লেখক নানা হিন্দু দেব, অর্থাৎ রাম, বলি, বিষ্ণু, বলদেব, সুভদ্রা, সাম্ব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব ও পার্ব্বতী, বুদ্ধদেব, সূর্য্য, লিঙ্গ, যম, বরুণ, কুবের এবং গণেশের কথা, এবং তাঁহাদিগের প্রতিমাগঠনের নিয়মাদি লিখিয়া গিয়াছেন।

বরাহমিহিরের পর ব্রহ্মগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন, এবং “ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত” নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই ত গেল জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা। অন্যান্য বিষয়েও সেইরূপ আলোচনা হইতেছিল। বৈয়াকরণ বররুচি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিলেন, কেন না, নাটকাদিতে তখন প্রাকৃত ভাষার চলন হইতেছিল। অমরসিংহ তাঁহার চিরস্মরণীয় অভিধান লিখিলেন। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, এবং বুদ্ধগয়াতে রচিত সুন্দর মন্দির তাঁহারই নির্ম্মিত এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ আছে। ধন্বন্তরী বৈদ্যশ্রেষ্ঠ ছিলেন,এবং অন্যান্য অনেক পণ্ডিত উজ্জয়িনীর সভা আলোকিত করিয়াছিলেন। পরাক্রান্ত বিক্রমাদিত্যের সেই পণ্ডিতমণ্ডলীবেষ্টিত সভায় যখন কালিদাসের শকুন্তলা অভিনীত হইত, অথবা জগতে অতুল্য বর্ণনাকাব্য মেঘদূত যখন মেঘগম্ভীর শব্দে পঠিত হইত, তখন ভারতবর্ষের গৌরবের দিন, ভারতবাসীদিগের কি সুখের দিন ছিল!

ভারবীও সেই সময়ে, কি তাহার কিছু পরে “কিরাতার্জ্জুনীয়” রচনা করেন—কিন্তু তাঁহার দেশকাল ঠিক করা যায় না।

খৃষ্টের ৬১০ খৃষ্টাব্দ পরে হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য নামক আর

একজন প্রসিদ্ধনামা সম্রাট্ ভারতসাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁহা-রও সাম্রাজ্য সিন্ধু হইতে মগধপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং কান্যকুব্জ তাঁহার রাজধানী ছিল।

হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে তখন বিশেষ দ্বেষভাব ছিল না। এখন যেমন অনেক হিন্দু বৈষ্ণব হয়, তখন সেইরূপ অনেক হিন্দু বৌদ্ধ হইত। বৈষ্ণবগণ যেমন সংসারত্যাগী হইয়া বৈরাগী হইতে পারে, অথবা সংসারে বাস করিতে পারে, বৌদ্ধগণ সেইরূপ সংসারী হইয়া থাকিত, অথবা সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুকী হইয়া মঠে বাস করিত। ভারতবর্ষে তখন অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং মগধদেশে নালন্দার যে প্রসিদ্ধ মঠ ও বিনয় বিদ্যালয় ছিল জগতে সে সময়ে সেরূপ বিদ্যামন্দির ছিল না। একজন চীন ভ্রমণকারী সেই কালে নালন্দার মঠে আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন "এখানে সমস্ত দিনে শাস্ত্রীয় প্রশ্নোত্তর শেষ হয় না, প্রাতঃসন্ধ্যা এখানে শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্ক চলিতেছে, বৃদ্ধ ও যুবা পরস্পরকে শাস্ত্রীয় জ্ঞানলাভে সাহায্য করিতেছে"। এই চীন ভ্রমণকারী বহুবৎসর পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া প্রধান প্রধান নগর দর্শন করিয়াছিলেন। সকল স্থানেই তিনি হিন্দুদিগের দেবমন্দির এবং বৌদ্ধদিগের মঠ ও বিহার দর্শন করিয়াছিলেন। স্বয়ং সম্রাট শিলাদিত্য বৌদ্ধ ছিলেন, এবং তিনি কান্যকুব্জে যে একটী বৌদ্ধ মহাপূজা সম্পন্ন করেন, তাহাতে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে বিংশ জন রাজা আহূত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজগণ অনেকেই হিন্দু ছিলেন, কাম-রূপ বা আসামদেশের রাজা খুব গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, তথাপি বৌদ্ধ পূজায় উপস্থিত হইতে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না, কেন না, সেকালে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের একটী অঙ্গমাত্র ছিল।

এই পরাক্রান্ত সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কাব্যপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার রচিত রত্নাবলী নাটক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমাত্রেই পাঠ করিয়াছেন। সম্রাটের নামে এ পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে,কিন্তু প্রসিদ্ধি এইরূপ যে,"ধাবক"নামক তাঁহার একজন সভাস্থ কবি নাটকখানি রচনা করিয়া দিয়াছিল। সে যাহা হউক নাটকখানি মধুর ও সুললিত তাহার সন্দেহ নাই। তবে কালিদাসের অতুলনীয় কবিত্বশক্তি এ নাটকে দৃষ্ট হয় না।

ভর্তৃহরির শতকগ্রন্থগুলিও এই সময়ে রচিত হয়। এবং আমরা যাহাকে ভট্টিকাব্য বলিয়া জানি, সে কাব্যখানিও কবি ভর্তৃহরির রচিত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "ভট্টি" শব্দটী "ভর্তৃ" শব্দের রূপান্তরমাত্র।

শিলাদিত্যের সময়ে পদ্যরচনারও অভাব ছিল না। প্রাচীন পঞ্চতন্ত্রের সরল ও সুললিত গদ্য ছাড়িয়া এ সময়ের লেখকগণ একটু জাঁকাল রকম গদ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন। "দশকুমার-চরিত"-লেখক দণ্ডী বোধ হয় শিলাদিত্যের রাজ্যকালেও জীবিত ছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। "কাদম্বরী"-রচয়িতা বাণভট্ট শিলাদিত্যের একজন সভাসদ ছিলেন, এবং তিনি "হর্ষচরিত" নামক শিলাদিত্যের একটী জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কিছু পরে সুবন্ধু "বাসবদত্তা" রচনা করেন।

পাঠক একবার শিলাদিত্যের সময়ের গৌরব অনুভব করিয়া দেখুন। যে সময়ে ভারতক্ষেত্রের সমগ্র সম্রাট আহূত হইয়া কান্যকুব্জের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, যে সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধে সৌহৃদ্য ছিল, এবং নগরে নগরে হিন্দু দেবালয় ও বৌদ্ধ মঠ ও বিহার বিরাজ করিত, যে সময়ে উজ্জয়িনী, কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থানে হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা হইত এবং নালন্দা প্রভৃতি

স্থানে বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা হইত, যে সময়ে সম্রাটের রচিত রত্নাবলী রাজসভায় অভিনীত হইত, ভট্টিকাব্য পাঠ করিয়া বালকগণ সুখে ব্যাকরণ শিক্ষা করিত, এবং দণ্ডী ও বাণ-ভট্টের বিশাল ও সগর্ব্ব সংস্কৃত ভাষা সভাপণ্ডিতদিগের মন পুল-কিত করিত,—ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন স্মরণ করুন।

তাহার পর ৭০০ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জে যশোবর্ম্মা নামে একজন সম্রাট ছিলেন। তাঁহার সভায় একজন মাত্র প্রসিদ্ধ কবি ছিল, কিন্তু সেই এক কবি জগদ্বিখ্যাত ভবভূতি। বিদর্ভদেশে ভবভূতির জন্ম, এবং বিদর্ভদেশের মন্ত্রীপুত্র মাধবই তাঁহার রচিত "মালতী-মাধব" নামক গ্রন্থের নায়ক। কিন্তু কান্যকুব্জ তখন ভারতবর্ষের রাজধানীস্বরূপ, সুতরাং ভারতবর্ষের কবিশ্রেষ্ঠ কান্যকুব্জে শীঘ্রই আকৃষ্ট হইলেন। কিন্তু তথায়ও ভবভূতি চিরকাল থাকিতে পারিলেন না। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য এবং কান্য-কুব্জরাজ যশোবর্ম্মার মধ্যে যুদ্ধ বাধিল, কান্যকুব্জরাজ পরাস্ত হইলেন এবং বিজেতা ললিতাদিত্য কান্যকুব্জের প্রধান রত্ন ভব-ভূতি-কবিকে কাশ্মীর-দেশে লইয়া গিয়া মহাদরে তাঁহাকে রাজ-সভায় স্থান দান করিলেন। এইরূপে সরস্বতীর প্রভাবে কবি ভবভূতি বিদর্ভ হইতে কান্যকুব্জে, এবং কান্যকুব্জ হইতে কাশ্মীর-দেশে নীত হইয়াছিলেন।

আমরা এক্ষণে কালিদাস ও ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা কতকটা জানিতে পারিলাম। ৫৫০খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৫০খৃষ্টাব্দ এই দুই শত বৎসরে ভারতবর্ষে যে সকল প্রধান কবি ও পণ্ডিত বিরাজ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা জানিলাম। বিক্রমাদিত্য, হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য ও যশোবর্ম্মার সাম্রাজ্যের বিষয় জানিলাম। বৌদ্ধ ও হিন্দুদিগের পরস্পর সম্বন্ধ ও শাস্ত্রালোচনার কথা জানি-

লাম। উজ্জয়িনী ও কান্যকুব্জ, নালন্দা ও কাশ্মীরের গৌরবের কথা শুনিলাম। আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত, কালিদাস, অমরসিংহ, বররুচি ও ভারবি, শ্রীহর্ষ, ভর্তৃহরি, দণ্ডী ও বাণভট্ট, এবং বিদর্ভদেশবাসী অতুল্য কবি ভবভূতির কথা জানিলাম।

ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাস যদি এইরূপে শিখিতে পারি তবে আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ মনে করিব। হিন্দুসাহিত্য ও সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস যদি এইরূপে পড়িতে পারি তবেই আমাদের মঙ্গল। নতুবা কেবল সোমনাথের মন্দিরের ধ্বংস, বা পলাশীর যুদ্ধের কথাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে না।

মুসলমান সমাজ।

ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের মধ্যে বর্ত্তমান শিক্ষার একটা শুভ ফল দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অল্পে অল্পে ধর্ম্মকে প্রাচীন আরবীয় কুসংস্কার ও কুপ্রথাসকল হইতে মুক্ত করিয়া মহম্মদের সদুপদেশ ও সাধু সংকল্পের অনুবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কোরাণে নানা কথা আছে; কেবলি যে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ তাহা নহে, তৎকালীন আরব সমাজের উপযোগী রীতিনীতি, আচারব্যবহার, ক্রিয়াকর্ম্ম, আইনকানুন সম্বন্ধে বিস্তর প্রসঙ্গ—আবশ্যক অনুসারে মহম্মদ যখন যাহা বলিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা-গান এবং স্বদেশীয়দের মধ্যে ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠাই মহম্মদের প্রধান লক্ষ্য ছিল; এবং কোরাণের প্রত্যেক সুরার প্রথমেই তিনি দয়াময় ঈশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করিয়াছেন। মহম্মদের

সময়ে আরবেরা প্রস্তরখণ্ডকে দেবতার সিংহাসনে বসাইয়া তাহারই আশ্রয়ে সহস্র দুর্নীতির অনুষ্ঠান করিত, যে বিশ্বাতীত বিশ্বব্যাপী মহান্ আত্মা মানবের সকল সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া তাহাকে নিয়ত কল্যাণপথে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহার নাম তাহারা শুনে নাই; মহম্মদ আসিয়া বলিলেন, সেই এক দেবাধিদেব ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপাস্য নাই এবং তিনি মহান্ "আল্লা আকবর"। দুরাচার আরবেরা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মহম্মদ বলিলেন, পৌত্তলিক অনুষ্ঠানসকল পরিত্যাগ কর, দুর্নীতি দুরাচার হইতে বিরত হও এবং পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর—তিনি কৃপা করিবেন, নহিলে নিষ্কৃতি নাই। ক্রমে আরবেরা একে একে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। এবং মহম্মদ তাহাদিগকে গৃহধর্ম্ম এবং অন্যান্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যথাবশ্যক উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত উক্তি একত্র গ্রথিত হইয়া কোরাণ রচিত হইল। অধ্যায়ের পর অধ্যায়—কোনটির সহিত কোনটির তেমন ঘনিষ্ঠ যোগ নাই এবং অনেকস্থলে প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতাও রক্ষিত হয় নাই; কোথাও গল্প, কোথাও উপদেশ, কোথাও স্বর্গবর্ণনা, কোথাও দায়ভাগ, কোথাও বিবাহের কথা, কোথাও বিচ্ছেদবিধি; কিন্তু এই সমস্তের মধ্য হইতে এক লক্ষ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ।

সুতরাং ইহাকেই মহম্মদীয় ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। পৌত্তলিকতার উপর মহম্মদের দারুণ বিদ্বেষ ছিল এবং ইহাকেই তিনি সকল দোষের আকর বলিয়া মনে করিতেন। মহম্মদ দেখিলেন, আরব-সমাজে যে সকল কদাচার এবং দুর্নীতি বহু বর্ষ ধরিয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে,

এই এক পাষাণ দেবতাকে স্থানচ্যুত করা ভিন্ন তাহার প্রতিকারের আর অন্য উপায় নাই। পাষাণখণ্ডের সহিত সে সকল দুর্নীতি নিয়ত জড়িত হইয়া ধর্ম্মেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কদাচার দেবতার অনুমোদিত, সুতরাং সম্যক্ প্রতিপালনই বিধি। তাই প্রথমেই মহম্মদ আল্লা আকবরের নামে লোকসকলকে জড়-দেবতার রোষানলভয় হইতে মুক্ত করিলেন—এবং তাহার পর অল্পে অল্পে দেশকালপাত্র বিবেচনা-পূর্ব্বক নিজের আদর্শ অনুসারে সমাজ গঠন করিতে লাগিলেন। অনেকাংশে সফলও হইলেন। কিন্তু আরব-সমাজের সমস্ত কুপ্রথা উন্মূলিত হইল না; হইতে পারে যে, মহম্মদের আদর্শ তাদৃশ উন্নত ছিল না, অথবা আরব-সমাজের অবস্থা নূতন উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠার অনুকূল ছিল না। নব্য শিক্ষিত মুসলমানেরা শেষোক্ত কথার উপরেই বিশেষ ঝোঁক দেন—এবং তৎকালীন আরব-সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহা অসঙ্গত বোধ হয় না। আর মহম্মদও যখন এই সমাজের মধ্য হইতেই অভ্যুদিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট বর্ত্তমান কালোচিত উন্নত আদর্শ আশা করাও সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে।

মহম্মদ সম্বন্ধে খৃষ্টান লেখকদিগের অনেকের গ্রন্থে এই এক প্রধান দোষ দেখা যায়। তাঁহারা মহম্মদকে তাঁহার দেশকাল হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন এবং বর্ত্তমান সভ্যতার উন্নত আদর্শ অনুসারে বিচার করিয়া তাঁহাকে শয়তানের এক ধাপ উচ্চে আসন দিয়া থাকেন। মহম্মদ স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দেন নাই, বহুবিবাহ এবং দাসপ্রথা রহিত করিতে সক্ষম হয়েন নাই, তিনি স্বর্গেও ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ইহজীবনে বহুদারপরিগ্রহ ও আবশ্যকমত যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা

আপন পার্থিব স্বভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন, অতএব তাঁহার গৌরব কিসের!

কিন্তু মহম্মদ মানুষই ছিলেন। এবং আপনাকে মানুষ বলিয়াই তিনি প্রচার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে খৃষ্টের যে স্থান, মুসলমান ধর্ম্মে মহম্মদের সেরূপ স্থান নহে। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লা, মাতার নাম আমিনা। অতি শৈশবেই মহম্মদ পিতৃমাতৃহীন হয়েন এবং পিতৃব্যের স্নেহে লালিতপালিত হইয়াই তিনি মানুষ হইয়া উঠেন। পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে খদিজা নাম্নী এক ধনী বিধবার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এইসময় হইতেই মহম্মদের কপাল ফিরিল। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার মনে যখন যে কথা উঠে, তিনি খদিজাকে শুনান, এবং খদিজাও তাঁহার কথার সম্যক্ মর্ম্মগ্রহণ করেন। এইরূপে পত্নীর সহধর্ম্মিতায় তাঁহার ঈশ্বরনিষ্ঠা ক্রমেই দৃঢ় হইতে লাগিল। বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া জায়া সমভিব্যাহারে এক নিভৃত পর্ব্বতগুহায় অবস্থিতি করিয়া তিনি ধ্যানধারণায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দেবতা প্রসন্ন হইলেন; মহম্মদের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; সৃষ্টির সকল পদার্থেই তিনি ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করিলেন; এবং নিভৃত পর্ব্বতগুহা ছাড়িয়া সজন লোকালয়ে প্রচার করিতে বাহির হইলেন—"আল্লা আকবর" ঈশ্বর মহান্ এবং "ইস্লাম" আমরা তাঁহারই আজ্ঞাবহ।

ইহাই মহম্মদের গৌরব। যাহারা ঈশ্বরের নাম শুনে নাই, তিনি তাহাদিগকে সেই অভয়-নাম শুনাইলেন, যাহারা অবিশ্বাসী ছিল তাহাদিগকে বিশ্বাস দিলেন, যাহারা দীন দুঃখী আতুর, তাহাদিগকে বলিলেন—ঈশ্বর ন্যায়বান্ এবং দয়ালু, তোমরা নিরাশ হইও না। সেই নিখিলনির্ভরের নামে মন্দিরে মন্দিরে

পাষাণ-দেবতাসকল বিচলিত হইল এবং পাষাণখণ্ডের চতুর্দ্দিকে যে অরাজক উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করিতেছিল তাহার মধ্যে একটা প্রবল বিপ্লব সূচিত হইল।

তাই বলিয়া যাহারা ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না এবং পিতৃপুরুষের বিধবাকে বলপূর্ব্বক ভোগ্যারূপে নিযুক্ত করিয়া পৌরুষ অনুভব করিত, তাহারা সহসা স্ত্রীজাতির প্রতি পশ্বাচরণ ছাড়িয়া দেবতার ন্যায় ব্যবহার সুরু করিল না, এবং অভ্যস্ত দাসপ্রথা ত্যাগ করিয়া দুরাচারেরা ক্রীতদাসদিগকে স্বাধীন মানবের অধিকারও ফিরাইয়া দিল না। কিন্তু মহম্মদের যত্নে বিবাহবিধি অনেক সংস্কৃত হইল, অবগুণ্ঠনবতী কুলরমণীর প্রতি পথে-ঘাটে সামান্যা দাসীর ন্যায় ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল, এবং ক্রীতদাসদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার ঈশ্বরের রাজ্যে কখনও নিষ্ফল নহে—এই সাধু উপদেশ প্রচারিত হইল। ইহার অধিক কিছু করা মহম্মদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না, এবং বোধ করি, এতদধিক তিনি চেষ্টাও করেন নাই।

সেজন্য মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দোষারোপ করা যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে খৃষ্টান জগতের সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির অবস্থা যে বড় ভাল ছিল এমন নহে, এবং যে দাসপ্রথার ধুয়া ধরিয়া ইংরাজ লেখকেরা মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি আত্যন্তিক অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, খৃষ্টান জগতে খৃষ্টান পাদ্রিগণের বিশেষ সহায়তায় সেই নিষ্ঠুর দাসব্যবসায় ধর্ম্মানুগত বলিয়া গণ্য হইতেও ত্রুটি হয় নাই। এ সকল বিষয়ে সভ্যতার উন্নতির সহিত মানব-সমাজের আদর্শ ক্রমে উন্নত হইতেছে। সংস্কারকেরা যুগে যুগে তখনকার উপযোগী বিধানসকল প্রচার করেন মাত্র। তাহা কালাতীত নহে এবং অপরিবর্ত্তনীয়ও নহে। কিন্তু এই সকল

কালোপযোগী সমাজসংস্কার তাঁহাদের প্রচারিত কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় মূল সত্যের সহিত জড়াইয়া ক্রমে যখন সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন ধর্ম্মেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখিয়া লোকে তাহার চতুষ্পার্শ্বের সভ্যতা হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়, এবং কাল যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ধর্ম্ম সহস্র প্রাচীন কুসংস্কার ও দুষ্ট প্রথার আবরণে অত্যন্ত হীন এবং হেয় বলিয়া উপেক্ষিত হয়।

ধর্ম্মের এরূপ অধঃপতন নিবারণের একমাত্র উপায় জ্ঞানের অনুশীলন। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর যে অংশে মহম্মদের আবির্ভাব, সেখানে বহুকাল ধরিয়া অজ্ঞানের অপ্রতিহত একাধিপত্য চলিয়া আসিয়াছে। সাধারণের মধ্যে শিক্ষার সেরূপ বিস্তার হয় নাই; সামান্য-শিক্ষিত মৌলবীগণ ধর্ম্ম এবং স্বার্থ একত্র জুড়িয়া দম্ভসহকারে হিংস্র গোঁড়ামি প্রচার করে মাত্র; এবং ভাবটুকু ছাড়িয়া কোরাণের অক্ষর-মাহাত্ম্য লইয়া মানবে মানবে নিত্য দলাদলি ও মনোমালিন্য জন্মিতে থাকে।

বর্ত্তমান শিক্ষা ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগকে ইহাই দেখাইয়া দিতেছে। দেখাইতেছে যে, অধিকাংশ খ্যাতনামা কোরণ-ব্যাখ্যাতা কোরাণকে যে হিসাবে দেখিয়াছেন, কোরাণ সে হিসাবে দ্রষ্টব্য নয়। কোরাণে প্রায় ছয় সহস্র শ্লোকের মধ্যে দুই শতের অধিক আইন-কথা নাই, এবং তাহাও বারো-আনা ভাগ দু'একটি খণ্ড খণ্ড কথা, দুই তিন কি চারি কথার সমষ্টি, বা গুটিকতক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ পদ—নানান্ জনে তাহার নানারূপ মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। মহম্মদের ত আইন-প্রণয়ন উদ্দেশ্য ছিল না, তবে বিশেষ দমনযোগ্য কতকগুলি সামাজিক কদাচার সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি নিষেধ-বিধি জারী করিয়াছেন মাত্র।

আর কতকগুলি পালনবিধিও আছে—তাহা কতক সে সমাজে যেরূপ বিধি প্রচলিত ছিল, কতক বা প্রচলিত বিধিরই অল্প-বিস্তর সংস্কার। বর্ত্তমান শিক্ষা আরও দেখাইতেছে যে, কোরাণের মূলভিত্তি কোথায় এবং বর্ত্তমান সভ্যতার অনুগত আচার ব্যবহার কোরাণবিরুদ্ধ না হইতেও পারে। মুসলমান ধর্ম্ম যদি মহম্মদের বহু পরকালবর্ত্তী খলিফগণের সংগৃহীত স্তূপাকার সত্য মিথ্যা লোককথা এবং জনশ্রুতির সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া কেবলমাত্র কোরাণগঠিত হইত তাহা হইলেই বর্ত্তমান কালের সহিত তাহার বিরোধ মিটিয়া আসিত। কথার দাসত্বই সকল সর্ব্বনাশের মূল।

মহম্মদের এক প্রধান গুণ ছিল, তিনি মানবকে তাহার স্বাধীন বুদ্ধি পরিচালনাপূর্ব্বক কাজ করিতে পরামর্শ দিতেন, কেতাবের গুটিকতক অধ্যায়ের মধ্যে হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে জড় করিয়া রাখিতে চাহিতেন না। গল্প আছে, মাআজকে য়েমেন প্রদেশে নিজ প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইবার সময় মহম্মদ প্রথমেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, লোকসকলকে তিনি কিরূপে বিচার করিবেন? মাআজ উত্তর করেন, "ঈশ্বরের গ্রন্থ অনুসারে আমি তাহাদিগের বিচার করিব।" মহম্মদ বলিলেন, "গ্রন্থে যদি সকল কথা না পাওয়া যায়?" উত্তর—"আমি প্রেরিত পুরুষের নজীর ধরিয়া কাজ করিব।" "যদি নজীর না থাকে?" "তাহা হইলে নিজের বিবেচনা খাটাইবার চেষ্টা করিব।" মহম্মদ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

নিজেকে অভ্রান্ত প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা মহম্মদের আদৌ ছিল না—আরবের হিতার্থে এবং পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য জানিয়া তিনি যাহা কিছু ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। ইমাম মস্‌লিম মহ-

ম্মদ সম্বন্ধে একটি গল্প বলেন যে, একদা মদিনার পথে কতকগুলি লোককে খর্জ্জুরবৃক্ষে পরাগসেক করিতে দেখিয়া মহম্মদ তাহা-দিগকে উক্ত কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে বলেন। সে বৎসর ফল ভাল হইল না। লোকেরা মহম্মদকে গিয়া বলিল যে, তাঁহার কথা শুনিয়াই তাহাদের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। মহম্মদ বলিলেন, "আমি সামান্য মনুষ্যমাত্র—নির্ভুল নহি। ধর্ম্ম-বিষয়ে তোমাদিগকে যাহা বলিব তোমরা তাহাই শুনিও; অন্যান্য বিষয়ে আমার কথার মূল্য তোমাদিগের অপেক্ষা অধিক নহে।"

কিন্তু মুসলমানেরা এক্ষণে মহম্মদকে সকল বিষয়ে অভ্রান্ত বলিয়াই মনে করেন। এবং খৃষ্টের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যানু-শিষ্যেরা যেমন তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা রচনা করিয়াছেন, মুসলমান মৌলবীরাও সেইরূপ মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার নামে অনেক অলৌকিক ক্রিয়া রটনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। অনেক সময় খলিফদিগের দুর্দ্দান্ত যথেচ্ছাচারিতা সমর্থন করিবার জন্যও মহম্মদের নাম দিয়া অনেক অসম্ভব অস-ঙ্গত মিথ্যা প্রচারিত হইয়াছে। অশিক্ষিত লোকেরা ত আর তাহা বুঝে না। এবং য়ুরোপীয় লেখকেরা সহৃদয়তাভাবে যত্ন-পূর্ব্বক এবিষয়ে অনুসন্ধানও করেন না।

উদাহরণ যথেষ্ট আছে। খৃষ্টান গ্রন্থকারেরা সাধারণতঃ যে সকল দুষ্টাচার মহম্মদের বিশেষ অনুমোদিত বলিয়া মনে করেন, কোরাণে দেখা যায়, মহম্মদ তাহার বিরুদ্ধে বিধি দিয়াছেন। যেমন, বহুদারপরিগ্রহ। সুরা নেসা নামক অধ্যায়ে বিধি আছে, পুরুষ ইচ্ছা করিলে দুই তিন অথবা চারিজন নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পারে বটে, কিন্তু যদি এমন আশঙ্কা থাকে যে, চারিজনের

প্রতি ঠিক সমান ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে একাধিক পত্নীগ্রহণ না করাই শ্রেয়। কোরাণের ঐ সুরাতেই অন্যত্র কথিত হইয়াছে যে, ইচ্ছা থাকিলেও স্ত্রীগণের সম্বন্ধে সম্যক্ ন্যায়াচরণ মানবের সাধ্যাতীত। অতএব কোন্ বিধি অনুসারে বহুদার-পরিগ্রহ কোরাণসম্মত বলিয়া গণ্য হয়?

কিন্তু বিধি না থাকিলেও নজীর মহম্মদ স্বয়ং। ইংরাজী-শিক্ষিত মুসলমানের অনেকে ইহার যে কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন, "মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ"-শীর্ষক প্রবন্ধে মৌলবী চিরাঘ আলির মত সমালোচনাকালে আমরা তাহার আভাসও দিয়াছি। এখানে আর একটু বিস্তারিত করিয়া বলা যাইতে পারে।

তিপ্পান্ন বৎসর বয়স অবধি মহম্মদ বরাবর একপত্নীক ছিলেন, এবং শেষ বয়সে অনেকগুলি বিবাহ করিলেও মৃত্যু পর্য্যন্ত খদিজাই তাঁহার হৃদয়েশ্বরী। তিনি যাহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিন জন তাঁহার আবিসীনিয়াপ্রবাসী অনুচর-দিগের বিধবা এবং দুইজন মদিনার যুদ্ধে হত দুইটি শিষ্যের স্ত্রী। বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করা ব্যতীত ইহাদিগকে অন্য কোনও উপায়ে আশ্রয়দান অসম্ভব ছিল।

আরবদিগের মধ্যে এখনও এই প্রথা কতকটা প্রচলিত আছে। বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করা আরবেরা একটা পারিবারিক কর্ত্তব্যের হিসাবে দেখে। হয়ত জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুইটি শিশুসন্তান এবং একটি নিরাশ্রয়া বিধবাকে রাখিয়া অকালে লোকান্তর গমন করিলেন। বিধবাকে পরহস্তে সমর্পণ করিলে শিশুদিগকে মাতৃহীন করা হয়, কিম্বা বিধবার সঙ্গে শিশুদিগকে পিতৃকুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হয়—এস্থলে পরিবারভঙ্গ

নিবারণার্থে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূকে বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া সকল দিক রক্ষা করে। সমাজের অসভ্যাবস্থায় ইহাপেক্ষা সুচারু ব্যবস্থা দুর্লভ।

এখন, মহম্মদকে অনুচরদিগের বিশ্বাজন রক্ষার্থে বিবাহ করিতে হইয়াছিল কেন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সে সময়ে আরবের যে অবস্থা, তাহাতে বিবাহ ব্যতীত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা নিন্দনীয় হইত, এবং শিথিল আরবপ্রকৃতি এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখিলে আপন উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশের একটা অবসর পাইত।

কিন্তু ভোগ্যা-দাসীরক্ষণ প্রথা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে বহুবিবাহ নিষেধ করিলেও আরব-সমাজের দুরাচার সংশোধিত হইল এমন বলা যায় না। মহম্মদ সেইজন্য নানা উপায়ে সে পথেও কণ্টক আরোপ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কোরাণে ব্যবস্থা দিলেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা স্বাধীনা বিশ্বাসিনী কন্যার পাণিগ্রহণে অক্ষম, তাহারা বিশ্বাসিনী দাসীকে বিবাহ করিবে। এবং অব্যভিচারিণী হইলে তাহাদিগকে যৌতুক প্রদান করিবে। কিন্তু বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও যদি তাহারা ব্যভিচারপরায়ণা হয়, তবে তাহাদের প্রতি স্বাধীনা স্ত্রীর অর্দ্ধেক শাস্তি বিধি। তোমাদের মধ্যে যাহারা কুকার্য্যের ভয় করে তাহাদেরই জন্য এই বিবাহ। ধৈর্য্যধারণ করিলে তোমাদেরই মঙ্গল। ঈশ্বর জিতেন্দ্রিয়ের প্রধান সহায়। কিন্তু যাহারা দুষ্প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাহারা বিপথে চালিত হয়।—এইরূপে দাসীবিবাহের বিধি দিয়া এবং বিবাহ ব্যতীত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ গর্হিত বলিয়া মহম্মদ ভোগ্যারক্ষণ নিষেধ করিলেন। এবং দাসীর পাণিগ্রহণ অপেক্ষা ধৈর্য্যধারণই শ্রেয় এই কথায় তাঁহার মত আরও ভালরূপ ব্যক্ত হইল। শাসনও রহিল যে, কামনার অনুসরণ করিতে চাও কর, কিন্তু ও পথে কল্যাণ নাই।

কোরাণে যে, ভোগ্যারক্ষণের অনুকূলে কোনও কথা নাই তাহা নহে। সুরা মারেজ নামক অধ্যায়ে মহম্মদ স্ত্রী এবং ক্রীতদাসী ভিন্ন অপরার প্রতি আসক্তি নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং